তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
মো. তাহমিদ উল ইসলাম রাফি
তামিম শাহরিয়ার সুবীন
ফরহাদ মনজুর
মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী
লুৎফুর রহমান

প্রথম প্রকাশ (পরীক্ষামূলক সংস্করণ) : সেপ্টেম্বর ২০২০
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য : ১৪৭.০০ (একশত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হচ্ছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা বর্তমান শিক্ষাক্রমের অন্যতম লক্ষ্য।

এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিবোধ এবং সকলের প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে বিষয়ের মূল্যায়নকে করা হয়েছে অর্থবহ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মূলত তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তির এই উৎকর্ষকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষিসহ নানা ক্ষেত্র। প্রযুক্তিগত এই বিপ্লবের সাথে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ্যপুস্তকটি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং আলিম স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে তথ্য প্রযুক্তির ধারণা প্রদান ও ব্যবহারের নানারকম কৌশল বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করে বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে পারে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ -এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংস্করণে বিষয়বস্তুতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও সংকলনের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির এবং সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনায় বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। এটি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা থাকবে। পাঠ্যপুস্তকটি আরও উন্নত করার জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Information and Communication Technology: World and Bangladesh Perspective

অতীতের শিল্পবিপ্লবের অনুরূপ এই মুহূর্তে আমরা একটি শিল্পবিপ্লবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, যে বিপ্লবটিকে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এই বিপ্লবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনধারাকে স্পর্শ করেছে। পুরো পৃথিবীর সকল মানুষ প্রথমবার পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি অভিন্ন মানবগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিশ্বগ্রামের ধারণা-সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে;
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- নৈতিকতা বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।

১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' আমাদের স্বপ্নের গ্রাম। এখানে সবাই সবাইকে চেনেন, প্রতিদিন সবার সাথে সবার দেখা হয়, রাত পোহালে একজন অন্যজনের খবরাখবর নেন, কুশলাদি বিনিময় করেন, সুখ ও দুঃখের ভাগীদার হন। গ্রামের মানুষের যে জীবনাচার, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের যে মমত্ববোধ বা আন্তরিকতা, শহরে জীবনে তা হয়তো সম্ভব নয়। সারা বিশ্বের মানুষ ভৌগোলিক দূরত্বে থেকেও যদি গ্রামীণ পরিবেশের মতো একে অপরের পাশাপাশি থাকত, তাহলে অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে গিয়ে সৌহার্দ আর ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে সর্বত্র নিবিড় ও সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব হতো। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজের ধারণার সূত্রপাত মূলত এসব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং তথ্যের নিবিড় আদান-প্রদানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বগ্রাম সৃজনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। আমরা নিজেরাই অনুভব করতে পারি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের কারণেই আমরা বিশ্ববাসী এখন কেউ কারো থেকে দূরে কিংবা বিচ্ছিন্ন নই।

চিত্র 1.1 : কানাডিয়ান দার্শনিক হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান

বিশিষ্ট কানাডিয়ান দার্শনিক হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান (Herbert Marshal McLuhan) ষাটের দশকে সর্বপ্রথম কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্রুত বিচরণ, স্থান এবং সময়ের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রাম বা ভিলেজে রূপান্তর করা যেতে পারে, সেই ধারণাটি সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। গ্লোবাল ভিলেজ হলো এমন একটি পরিবেশ ও সমাজ, যেখানে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করাসহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে তথ্য প্রবাহের অবাধ ও সহজলভ্য উৎস তৈরি হয়েছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় তথ্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করার কারণে ক্ষতিকারক এবং অসত্য তথ্য অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে, এর ফলে সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ, সাইবার আক্রমণ এবং প্রযুক্তি বিভেদ-বৈষম্যেরও বিস্তার ঘটেছে।

বিশ্বগ্রামের ফলে সার্বিক জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দূরশিখন, চিকিৎসাসেবা বৃদ্ধিসহ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নের জন্য মানুষের এ ব্যাপারে সচেতনতা, সক্ষমতা, আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা এবং উপযোগিতা থাকা প্রয়োজন। এর সাথে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ততা এবং বিশ্বাসযোগ্য ডেটা বা তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

বিশ্বগ্রামের ধারণা-সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো (Principal components regarding concept of Global Village) হলো :

২০২৫-২০২৬

১.১.১ যোগাযোগ (Communication)

যোগাযোগ বলতে আমরা সবসময়েই এক জায়গার সাথে অন্য জায়গার যোগাযোগ বুঝিয়ে এসেছি এবং বিশ্বগ্রামের ধারণার মাঝে এই যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কারণ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে একজন মানুষ বিমানে, দ্রুতগামী ট্রেনে অথবা আধুনিক সড়ক ব্যবস্থা ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ের মাঝে এক শহর থেকে অন্য শহরে কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারে। তবে বিশ্বগ্রামের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এখন একই সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান কিংবা ভাব বিনিময় করাকেও বোঝায়। কথন, লিখন কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদানই এই যোগাযোগ এবং এই যোগাযোগই এখন বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রধান উপাদান।

নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। শত বছরের পুরনো তারযুক্ত টেলিফোন যন্ত্রের পরিবর্তে তারবিহীন মোবাইল ফোনের আবির্ভাব হয়েছে। তারবিহীন এ প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা ইন্টারনেটের পরিষেবাগুলো যেমন- ওয়েব ব্রাউজিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স, মেসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, গুগল মিট, জুম ইত্যাদির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে টেলিযোগাযোগ (Telecommunication) এবং তথ্য যোগাযোগ (Information communication) এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক সময় তার-নির্ভর টেলিফোনই ছিল টেলিযোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। পরবর্তীকালে বেতার টেলিযোগাযোগ আবিষ্কৃত হওয়ার পর আধুনিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রের মধ্যে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়াকিটকি ইত্যাদির ব্যবহার সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অন্য দিকে নিয়ম ও নিরাপত্তার বিষয়টি বজায় রেখে তথ্য স্থানান্তর বা শেয়ার করা হচ্ছে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণ হিসেবে ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট-নির্ভর সার্ভিস যেমন- ই-মেইল, সামাজিক নেটওয়ার্কিং, ওয়েবসাইট, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদির কথা বলা যায়। ই-মেইল (E-mail) হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যভাবে বার্তা আদান-প্রদান পদ্ধতি। আজকাল একজন মানুষের প্রকৃত ঠিকানা থেকে তার ই-মেইল ঠিকানা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নেটওয়ার্কিং দিয়ে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ, তথ্য, ছবি এবং ভিডিও বিনিময় কিংবা সংবাদ প্রচারের কাজ করা হয়। সামাজিক নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে পৃথিবীতে অনেক বড় সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীরা অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে সভা করতে পারেন। ইন্টারনেটে এখন পৃথিবীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি সকলের সামনে তুলে ধরে। ইন্টারনেটভিত্তিক এই পদ্ধতিগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ সময় এবং অর্থের সাশ্রয়।

তবে ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক নেটওয়ার্কিংয়ের উপর বেশি নির্ভরতা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই আসক্তির পর্যায়ে চলে যাবার কারণে পুরো পৃথিবীতেই এর ব্যবহার এখন আলাদাভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে।

১.১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি বিরাট অংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই দেশে এবং দেশের বাইরে চাকরির বাজারে আবেদন করে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে পারছে। আমাদের দেশেও বিগত প্রায় দু দশক

ধরে বিভিন্ন দেশের চাকুরি ও নিয়োগ সংক্রান্ত খবরাখবর নিয়ে কয়েকটি জব-পোর্টাল চালু আছে। এগুলোর মাধ্যেমে এছাড়া ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের কর্মসংস্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক দেশের নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিকের বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দূর থেকে কাজ করে থাকেন। এই কার্যক্রমকেই আউটসোর্সিং (বহিঃউৎসরণ) বলে। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। এর ফলে অনেকের কাজের সুযোগ হয়েছে, অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আলাদাভাবে 'উবার' কিংবা 'পাঠাও' এর মতো সেবার কথা উল্লেখ করতে হয়, যেগুলো যান পরিবহনের ক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান করে দিয়েছে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ খণ্ডকালীন বা চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি যে কেউ স্বাধীনভাবে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। কাজের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি কাজের স্থান ও সময়ের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায় এ পেশার জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কাজকে ফ্রিল্যান্সিং (স্ব-উদ্যোগের কাজ) বলা হয়। বিশ্বব্যাপী কয়েকটি জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস বা জব শেয়ারিং ওয়েবসাইট যেমন— Upwork, Freelancer, Belancer, Fiverr ইত্যাদিতে ডেটা অ্যানালাইসিস, কপি রাইটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, এফিলিয়েট মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), গুগল অ্যাডসেন্স, ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভে, আর্টিক্যাল-ব্লগ রাইটিং ইত্যাদি নানাধরনের বৈচিত্র্যময় কাজ করা যায়।

অবশ্য ফ্রিল্যান্সিং কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জন আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলেও ভিন্নধর্মী জীবনযাপন অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-বিচ্ছিন্নতা এ কাজের বড় ধরনের নেতিবাচক দিক। রাত জেগে কাজ করা, দক্ষতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, কাজের জোগান দিতে বাধ্য-হওয়া-জনিত মানসিক চাপ, সরবরাহকৃত কাজের যথাযথভাবে মূল্যায়ন না হওয়া বা পারিশ্রমিক পরিশোধের ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা এবং সর্বোপরি পেশা হিসেবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হওয়ায় অনেকেই এ ধরনের কাজে নিরুৎসাহিত বোধ করে থাকেন।

১.১.৩ শিক্ষা (Education)

বিশ্বগ্রামের ধারণায় শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, কারণ সত্যিকার শিক্ষাই একজন মানুষকে সমাজ এবং পরিবেশ সচেতন, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, উদার বিশ্বনাগরিক হতে সাহায্য করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে চলমান শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে এসেছে নতুন মাত্রার গতিশীলতা এবং যান্ত্রিকায়ন। শিক্ষার্থীদের মেধা-মননের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে এগিয়ে যাচ্ছে শিখন পদ্ধতি।

শিক্ষা বিস্তারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী উপকরণ যা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতেই অত্যন্ত কার্যকর। এতে করে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকের পাশাপাশি বিশ্বমানের প্রায় যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকগণের সাহচর্যে তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ব্যবহার এখন খুবই সহজ। একসময় মূল্যবান পাঠ্যবই অনেক দেশে খুবই দুর্লভ একটি বিষয় ছিল, এখন ই-বুকের কারণে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সবাই পাঠ্যবই পেতে পারে। আমাদের দেশেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত সকল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ই-বুক আকারে ডাউনলোড করা যায়। বিশ্বগ্রাম ধারণায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হবে না, তারা নিজের ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ২০২০ সালে সারা পৃথিবীব্যাপী Covid-19 সংক্রমণের সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ না রেখে

অনলাইন শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেছে। শিক্ষকেরা নিজ ঘরে থেকেই অনলাইনের বিভিন্ন অ্যাপ (যেমন Google Meet, WebEx, Facebook messenger, imo, Skype, Whatsapp, Zoom ইত্যাদি) ব্যবহার করে লাইভ-ক্লাসে সরাসরি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেছেন। অনেক সময় বিষয়ভিত্তিক ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরির পর অনলাইনে শেয়ার, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্লগিং করে, বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন। শুধু তাই নয় একজন শিক্ষার্থী ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার-ভিডিও দেখে, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষা কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ না থাকার কারণে বিশ্বগ্রাম ধারণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারে একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গ হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে যাচ্ছে।

গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের পরিবর্তে অনলাইনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিশেষত কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ওয়েব ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার পদ্ধতিকে ই-লার্নিং বলে। ই-লার্নিং এমন একটি প্রযুক্তিগত শিখন পদ্ধতি, যেখানে অনলাইনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যে কোনো অবস্থানে থেকে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় (interactive) পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এটি সাধারণত অনলাইনে সুনির্দিষ্ট কোর্স, ডিগ্রি কিংবা প্রোগ্রাম শিক্ষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারে একসাথে অনেক শিক্ষার্থীকে পাঠদান সম্ভব হলেও, মানবীয় উপাদানের অনুপস্থিতির (Lack of human element) কারণে অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা হচ্ছে না। তবে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর-বিভাগ, কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে এই শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার যথেষ্ট কার্যকর।

১.১.৪ চিকিৎসা (Medical Facilities)

পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল, চিকিৎসা সুবিধা, এমনকি ভালোভাবে যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাটও থাকে না। আবার পৃথিবীতে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে চিকিৎসা সেবা পাওয়া তো দূরের কথা রোগীদেরকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতেও দু-তিন দিন লেগে যায়। শুধু তাই নয় পৃথিবীর সবচাইতে সম্পদশালী অনেক দেশেও সর্বজনীন চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নেই, জনস্বাস্থ্য অবহেলিত বলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের মানুষের কাছে চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য টেলিমেডিসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেলিমেডিসিন বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেওয়াকে বোঝায়। এর মূল কথা হলো তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য খাতে গত কয়েক বছর ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোয় টেলিকনফারেন্স, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা শুরু হয়েছে এবং জনসাধারণ এর সুফল ভোগ করা শুরু করেছেন। তাছাড়া ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেও রোগ নির্ণয় সহজতর হচ্ছে। অনেক সময় অনেক জটিল ধরনের অপারেশন করার ক্ষেত্রে এজন চিকিৎসক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অন্য আরেকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। Teladoc, Maven Clinic, iCliniq, MDlive, Amwell, Doctor on Demand, treatmentonline নামীয় অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। ২০২০ সালে বৈশ্বিক অতিমারি Covid-19-এর প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যবস্থাপত্রসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিটি দেশে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ফোন নম্বর

সার্বক্ষণিক চালু রাখা হয়েছিল, যার মাধ্যমে চিকিৎসকগণ নানাভাবে দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করেছেন।

সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে রোগীর যথাযথ চিকিৎসার পূর্বশর্ত। বর্তমান বিশ্বে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR: Electronic Health Record) ব্যবস্থাপনায় ডেটাবেজে রোগীর সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে এবং রোগী তার EHR ব্যবহার করে যে কোনো স্থান হতে তার রোগ সম্পর্কিত তথ্য, রিপোর্ট, চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি যে কোনো স্থানে বসে পেতে পারেন। এ ধরনের কাজ করতে যে সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে Therapy Notes, Epic care, Next Gen Ambulatory EHR, Care 360 ইত্যাদি অন্যতম।

১.১.৫ গবেষণা (Research)

যে প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিশীল মেধা-মনন প্রয়োগ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধ করা হয় সেটিই হচ্ছে গবেষণা। উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো গবেষণা। নিয়মিত জ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। উন্নতকামী দেশ মাত্রই গবেষণার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাই বিশ্বগ্রাম ধারণায় গবেষণা একটি প্রধান অনুষঙ্গ এবং সেজন্য এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান পৃথিবীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা গবেষণার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। তথ্য ও উপাত্তের সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়া, জটিল হিসাব, সিমুলেশন কিংবা যন্ত্রপাতি পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ, সেগুলো থেকে ডেটা সংগ্রহ এর প্রতিটি ধাপেই তথ্য প্রযুক্তি বড় ভূমিকা রেখে থাকে। বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা তাঁদের চিন্তাধারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন কিংবা নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। শারীরিকভাবে উপস্থিত না থেকেও একজন গবেষক সেমিনার বা কনফারেন্সে নিজের গবেষণা প্রকাশ করতে পারেন কিংবা অন্যের গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারেন।

চিত্র 1.2 : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত তরুণ বিজ্ঞানী

একসময় জার্নাল বা গবেষণাপত্র, পেটেন্ট ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ বিষয় ছিল, এবং সেটি ছিল গবেষণার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রায় সব জার্নাল আজকাল ই-জার্নাল হিসেবে প্রকাশ হয় এবং পেটেন্টের বিশাল ডেটাবেজের অনেকটুকুই উন্মুক্ত, কাজেই যে কোনো গবেষক সেই বিশাল তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণে আমরা দেখতে পাই সীমিত সম্পদ নিয়েও আমাদের দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের গবেষণা করতে পারে।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা ব্লগে প্রকাশ হলে গবেষণার কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত হয়। বিজ্ঞানী বা গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল, তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই এবং সমগ্র

বিশ্বের সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের নিকট দ্রুততার সাথে প্রচার এবং সেগুলোর উপর পর্যবেক্ষণ, মতামত প্রদান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় বিশ্বগ্রাম ধারণার মাধ্যমে বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছে।

১.১.৬ অফিস (Office)

অফিস বা কর্মস্থল এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন। অফিসের বর্তমান ব্যবস্থায় বিশ্বগ্রাম ধারণাটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। আমরা কোনো তথ্যের জন্য কোনো কোম্পানির অফিসে ফোন করলে বা অন্য কোনোভাবে যোগাযোগ করলে কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না, পৃথিবীর কোন প্রান্ত বা কোন দেশ থেকে সেই ফোনের বা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক অফিস ইকুইপমেন্টস, আইসিটি ও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অফিসের সার্বিক কার্যক্রম অত্যন্ত সহজে, স্বচ্ছতা এবং দৃশ্যমান গতিশীলতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি অফিসসহ বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, গবেষণাগার, শিল্পকারখানা ইত্যাদি কর্পোরেট অফিসগুলো আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে সার্বিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automated) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আর দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে অফিসগুলো কাগজবিহীন ডিজিটালাইজড অফিসে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বদলে যাচ্ছে অফিসের ফাইলিং সিস্টেম এবং প্রাত্যহিক কার্যপ্রক্রিয়া।

আজকের বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে গতানুগতিক অফিস-ব্যবস্থা একটি বড় পরিবর্তনের পথে রয়েছে। অনেকেই নিজ দেশে কিংবা অন্য দেশে থেকে বাসায় বসে কাজ করেন, অনেককেই নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা বজায় রাখতে হয় না। উত্তর আমেরিকার সাথে আমাদের প্রায় বারো ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে দুই মহাদেশে দুইটি অফিস রেখে, কয়েক শিফটে সেটি দিন-রাত্রি মিলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে। 'গুগল' সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত আছি, ড্রপবক্স গুগল ড্রাইভ, Office 365, Google docs ইত্যাদি সার্ভিসে আমরা আমাদের যাবতীয় ফাইল তৈরিসহ নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করতে পারি এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সেখানে কাজ করতে পারি। অফিসের সবধরনের মিটিংয়ের ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যেমে করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারি।

তবে অফিস যান্ত্রিকায়নের ফলে অনভিজ্ঞ মানুষের কর্মসংস্থান কমে যায়। তেমনি গ্রাহকের সাথে ব্যবস্থাপনার মিথস্ক্রিয়া (interaction) এবং একই সাথে সহকর্মীদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ হ্রাস পায়। জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে তথ্য সরক্ষণের জন্য বড় বড় তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির ডেটা সেন্টারগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা হলে সবসময় একধরনের ঝুঁকি থেকে যায়।

১.১.৭ বাসস্থান (Residence)

বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। বিশ্বগ্রাম ব্যবস্থায় আজকাল অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ বাসভবন নির্মাণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ ঘরে অবস্থান করে দূরবর্তী দেশের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সামনাসামনি কথোপকথন থেকে আরম্ভ করে রিমোট কন্ট্রোলিং পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কক্ষের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করা, লাইটিং সিস্টেম, ঘরে বসেই বাজার করা, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সবকিছুতেই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন-যাপন অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে।

এ ধরনের সুবিধাসমৃদ্ধ বাসস্থানকে স্মার্ট হোম (Smart Home) এবং এর পদ্ধতিকে হোম অটোমেশন সিস্টেম (Home automation system) বলা হয়। এসব বাসস্থানে দৈনন্দিন সব ধরনের কাজে নানা ধরনের ডিভাইস যেমন— টেলিভিশন, সাউন্ড ব্যবস্থা, মিউজিক সিস্টেম, লাইট, ফ্যান, এয়ারকন্ডিশনার,

২০২৪-২০২৫

ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ফায়ার সিস্টেম, শাওয়ার সিস্টেম, পর্দা উঠানো-নামানো, গ্যারেজ সিস্টেম, ভূমিকম্প সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, তাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্মার্ট হোম হলো একধরনের ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পয়েন্টের মতো, যেখানে বসবাসের জন্য সব উপযোজন পাওয়া যায় এবং গ্রাহককে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করে এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা যায়।

স্মার্ট হোম ক্যামেরা এবং মোশন সেন্সর (Motion Sensor) দিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুম কিংবা প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির সাথে যুক্ত থাকে বলে বাসস্থানটি সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকে এবং বাসস্থানের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। বাসস্থানে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকলে স্মার্ট হোম তার জন্য সত্যিকারের সহায়তা হতে পারে, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে (ভয়েস কমান্ড) দরজা খোলা বা বন্ধ করা, লাইট, কম্পিউটার ও টেলিফোন চালু কিংবা বন্ধ করা ইত্যাদি কাজ তখন সহজেই করা সম্ভব হয়ে যায়।

হোম অটোমেশনে ব্যাপক আর্থিক বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, কণ্ঠস্বর বা ভয়েস নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস ব্যবহারে বিড়ম্বনা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.১.৮ ব্যবসা-বাণিজ্য (Business)

পৃথিবীর কোনো দেশ এখন আর পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকটি দেশকেই কোনো না কোনো দ্রব্যের জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। যে দেশ যেটি উৎপাদন করে সেই দেশ সেটি রপ্তানি করে, এবং যে দেশে যেটি প্রয়োজন সেটি অন্য দেশ থেকে আমদানি করে। সে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বগ্রামের ধারণাটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেখি। শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বগ্রাম ব্যবস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যেও অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না। উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগতমান অনলাইনের মাধ্যমে স্থানীয় এবং বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ক্রেতা বা ভোক্তাগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য আজকাল আর ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নেই। বিশ্বব্যাপী ই-কমার্স, ই-বিজনেস, অনলাইন শপিংয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্সই এ যাত্রার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিক ডেটা প্রসেসিং এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিশেষত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য বা সেবা বিপণন, বিক্রয়, সরবরাহ, ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন ইত্যাদি কাজকে সম্মিলিতভাবে ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স বলে। ই-কমার্স ওয়েব সাইটে পণ্যের গুণগত মান, বর্ণনা, ছবি ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ থাকে। ই-কমার্সের পরিচিত কতকগুলো ওয়েব সাইট হলো, www.bikroy.com, www.daraz.com, www.alibaba.com, www.amazon.com ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে ই-কমার্সের কার্যক্রম চালু হয়েছে। ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের স্থানীয় শেয়ার বাজারের তথ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রচার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর হোম ডেলিভারির বিজ্ঞাপন করে থাকেন। এতে করে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা যায় এবং বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুফল আমরা পেতে পারি। প্রযুক্তি শেয়ার ও স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নত হবে শিল্প কারখানাগুলো। বিশ্বমানের ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য হবে আন্তর্জাতিক মানের। ফলে সম্প্রসারিত হবে বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের। এক্ষেত্রে লেনদেনে ব্যবহৃত হয় ইএফটি (EFT : Electronic fund transfer), যেটি এক ধরনের

ইলেকট্রনিক লেনদেন, যা সংঘটিত হয় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের সাহায্যে। একই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অ্যাকাউন্টের মধ্যে অথবা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে, কিংবা বৈদেশিক ব্যাংকের মধ্যেও এ ধরনের লেনদেন করা যায়। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। অনলাইন ব্যাংকিং নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটিকে বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম পরিষেবা হিসেবে গণ্য করা যায়। এ ধরনের পদ্ধতিতে লেনদেনকে ইন্টারনেট ব্যাংকিংও বলা হয়। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকগণকে লেনদেন সম্পন্নের জন্য সশরীরে কোনো ব্যাংক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না; বাড়িতে বা কর্মস্থলে কিংবা ভ্রমণরত অবস্থাতেও এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। এজন্য শুধু কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড প্রয়োজন হয়।

১.১.৯ সংবাদ (News)

সংবাদ বিশ্বগ্রাম ধারণার একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সংবাদ ও গণমাধ্যমের কার্যক্রমে গতিশীলতা বেড়ে গেছে বহুগুণে, যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা। ব্যাপক হারে বিস্তৃতি পেয়েছে এর কর্মপরিধি। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা মুহূর্তের মাঝে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ জেনে যেতে পারে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিউজ চ্যানেল, যেমন এপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন বা আল জাজিরা ইত্যাদি তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংবাদগুলো আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ কিংবা দুর্ভিক্ষের সংবাদ সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সহমর্মিতার জন্ম দেয়। ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটি দেখতে দেখতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

চিত্র 1.3 : বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু দৈনিক সংবাদপত্র

এর ধারাবাহিকতায় আমাদের গণমাধ্যমেও সম্প্রসারণ, ক্রমবিস্তৃতি লাভ করছে। অনলাইন সাংবাদিকতার সুযোগগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারছি। খবরের যথার্থতা নির্ণয়ে আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদ যাচাই করতে পারি। আমাদের দেশেও অনলাইন নিউজ সাইটগুলো সমসাময়িক বিশ্বের সকল খবরাখবর প্রচার করে চলেছে। এছাড়াও বর্তমানে প্রায় সব খবরের কাগজ তাদের অনলাইন সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আপডেট নিউজ প্রচার করছে। সংবাদগুলো বৈশ্বিক হওয়ায় সারা বিশ্ব পরিণত হচ্ছে এক পরিবারে। তথ্যের সমৃদ্ধতা যে কোনো দেশকে উন্নত করতে পারে। বর্তমানে তথ্যই শক্তি, যার অন্যতম প্রধান উৎস এই সংবাদপত্র যার উপর ভিত্তি করে চলবে নিরন্তর গবেষণা, নিশ্চিত হবে টেকসই উন্নয়নের অসীম সম্ভাবনা।

তবে ইন্টারনেটভিত্তিক ওই সব পোর্টাল তৈরি করা, কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা খুবই সহজ হয়ে যাওয়ার কারণে এর যথেষ্ট অপব্যবহার হতে দেখা যায়। মিথ্যা সংবাদ কিংবা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা এখন সারা পৃথিবীর জন্য বড় সমস্যা। এর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) নিজস্ব নিউজ সার্ভার, শক্তিশালী ডেটাবেজ, নেটওয়ার্ক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১.১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social Communication)

বিনোদন ছাড়া মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ অপূর্ণ থেকে যায়। সভ্যতার উন্মেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিনোদনের অনুষঙ্গের মধ্যে গল্প বলা, বাদ্য বাজানো, নৃত্য, গান, নাটক ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। বর্তমানে বিনোদনের অধিকাংশই হয়ে পড়ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রনির্ভর; যেমন টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি। স্যাটেলাইট বা ইন্টারনেটের কল্যাণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে এখন ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোনো অনুষ্ঠান উপভোগ করা সম্ভব। হলিউডের সিনেমা একসময় চলচ্চিত্র জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন স্ট্রিমিং করে ইন্টারনেটে চলচ্চিত্র দেখার প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স হলিউডকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে চলে গেছে। এ ছাড়াও ইন্টারনেট গেমিং, আইপি টিভি (ইন্টারনেট প্রটোকল টিভি), ইউটিউবসহ আরো অসংখ্য অনলাইন বিনোদন মাধ্যম রয়েছে যেগুলো যে কোনো ব্যক্তি তার পছন্দসই গেম, ভিডিও, গান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও ডাউনলোড করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন সকল বিনোদনের অনুষ্ঠান তৈরি হতো জাতীয় কৃষ্টি-কালচার ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে। তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে এবং বিশ্বায়নের এ যুগে সেখানেও বৈচিত্র্য এসেছে। বিশ্বগ্রামের চেতনার সাথে তাল মিলিয়ে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের ধ্যানধারণা, চিন্তা, সংস্কৃতির ছোঁয়ার সাথে পরিচিত হচ্ছে।

অনলাইন নিউজ, টিভি প্রোগ্রাম, গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্থানে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে দেখতে ও উপভোগ করতে পারছেন। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রাম, মেসেঞ্জার, স্কাইপি ইত্যাদি ব্যবহার করে সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগসহ বিনোদন জগতের আপডেট তথ্য, ভিডিও, ছবি খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ এবং 'লাইক'-এর মাধ্যমে জনমত যাচাই করতে পারছেন। ডিজিটাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি তার ভালো লাগা বা মন্দ লাগা বিষয়ে নিজের মতামত দেওয়া, মতবিনিময় কিংবা অন্যকে শেয়ার করতে পারায় বৈশ্বিক যোগাযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের সকলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভিন্ন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় স্বদেশীয় জাতিসত্তা যেন হারিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা ছাড়াও আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মাদকাসক্তির অপব্যবহারের ন্যায় আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ভাটা পড়ছে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। কর্মস্থল এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে, সেইসাথে ব্যক্তিগত তথ্যে অযাচিত হস্তক্ষেপ, একজনের ছবি বা তথ্য অন্য নামে চালিয়ে দেয়া কিংবা অপপ্রচার ও গুজব সমাজে ছড়িয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ঘটনাও নিয়মিতভাবে ঘটছে।

১.১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Exchange of Cultural Activities)

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতিহাস পর্যালোচনায় এটি নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিও উল্লেখ করার মতো। আমাদের বাংলা ভাষা হাজার বছর আগে এখনকার মতো ছিল না। কালের বিবর্তনে এ ভাষা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থার প্রভাব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একসময় আমাদের দেশে "ভালোবাসা দিবস" বলে কোনো দিবস পালিত হতো না, এখন এদেশের তরুণদের কাছে এটি জনপ্রিয় একটি দিবস। আজকের বাংলাদেশি একজন কিশোর এবং একজন মার্কিন কিশোর একই সময়ে, একই ধরনের প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে একইভাবে যে কোনো বিষয় অবলোকন, চিন্তাভাবনা, মতবিনিময় করতে সক্ষম হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্মের মানুষ একটি একক সমাজে বসবাসের ফলে মানুষের

যোগাযোগের ব্যাপকতা এবং বিশ্বের সকল সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে, যেটি বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

চিত্র 1.4 : সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কারণে এখন পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের পক্ষে আমাদের দেশের নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য দেখা সম্ভব

অবশ্য এর বিরূপ প্রভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে পড়ছে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি। বিলুপ্ত হতে বসেছে অনেক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও রিমিক্স, ফিউশন কিংবা পপ-কালচারের ক্ষতিকারক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ঐতিহ্যগত দিক ব্লগ, ওয়েবসাইট, চ্যানেল ইত্যাদিতে তুলে ধরতে হবে। ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, সুস্থ ও আকর্ষণীয় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার এবং এ বিষয়ে সচেতনতামূলক ও আগ্রহ সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নে আমাদের সংস্কৃতি স্বমহিমায় জায়গা করে নিতে পারবে।

১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম বাস্তবতা, অর্থগতভাবে শব্দ দুটি যদিও স্ববিরোধী কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি এমন এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করে যেটি বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের মতো চেতনা সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কে একটি বাস্তব অনুভূতি জাগায়। আমরা জানি, স্পর্শ, শোনা কিংবা দেখা থেকে মানুষের মস্তিষ্কে একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয় যেটাকে আমরা বাস্তবতা বলে থাকি। কতকগুলো যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমরা এই অনুভূতিগুলো সৃষ্টি করতে পারি তাহলে অবস্থাটি মানুষের কাছে পুরোপুরি বাস্তব মনে হতে পারে। এটি নানাভাবে করা সম্ভব। অনেক সময় বিশেষ ধরনের চশমা বা হেলমেট পরা হয়, যেখানে দুই চোখে দুটি ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। অনেক সময় একটি স্ক্রিনে ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করার জন্য মূলত কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কোনো একটি পরিবেশ বা ঘটনার বাস্তবভিত্তিক ত্রি-মাত্রিক চিত্রায়ণ করা হয়। তাই বলা যায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরিকৃত এমন এক ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ, যা উপস্থাপন করা হলে ব্যবহারকারীদের কাছে এটিকে বাস্তব পরিবেশ মনে হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশ তৈরির জন্য শক্তিশালী কম্পিউটারে সংবেদনশীল গ্রাফিক্স ব্যবহার করতে হয়। সাধারণ গ্রাফিক্স আর ভার্চুয়াল জগতের গ্রাফিক্সের মধ্যে তফাত হলো এখানে শব্দ এবং স্পর্শকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ব্যবহারকারীরা যা দেখে এবং স্পর্শ করে তা বাস্তবের কাছাকাছি বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি চশমা বা হেলমেট

চিত্র 1.5 : বাংলাদেশের উদ্যোক্তার তৈরি সাশ্রয়ী মূল্যের ভিআর গগলস

(HMD: Head Mountaed Display) ছাড়াও অনেক সময় হ্যান্ড গ্লাভস, বুট, স্যুট ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে দূর থেকে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। একে টেলিপ্রেজেন্স বলা হয়। এছাড়াও এ পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক শব্দও সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে হয়, শব্দগুলো বিশেষ কোনো স্থান হতে উৎসারিত হচ্ছে।

১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব (Impact of Virtual Reality in Everyday Life)

বিনোদন ক্ষেত্রে : নানা ধরনের বিনোদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নির্ভর কল্পকাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, কার্টুন, ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র ইত্যাদি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আজকালকার প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার দেখা যায়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে নানা ধরনের কম্পিউটার গেম সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক যেসব জায়গায় ভ্রমণ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সেইসব জায়গায় ভ্রমণ করার অনুভূতি পাওয়া সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Augmented Reality) নামে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির একটি নতুন রূপ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে, যেখানে বাস্তব জগতের সাথে ভার্চুয়াল জগতের এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়।

চিত্র 1.6 : বৈমানিকদের বিমান চালানোর প্রশিক্ষণের জন্য ফ্লাইট সিমুলেটর

যানবাহন চালানো ও প্রশিক্ষণে : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সবচেয়ে বাস্তবমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে ফ্লাইট সিমুলেটরে, যেখানে বৈমানিকরা বাস্তবে আসল বিমান উড্ডয়নের পূর্বেই বিমান পরিচালনার বাস্তব জগৎকে অনুধাবন করে থাকেন। এ ছাড়াও মোটরগাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি চালানোর প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট সিমুলেটর ও মডেলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বাস্তবের ন্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও গবেষণায় : বাস্তবে কোনো কাজ করার আগে কম্পিউটারে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করে দেখাকে সিমুলেশান বলা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জটিল বিষয়গুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সিমুলেশন ও মডেলিং করে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করা যায়। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, জটিল অণুর আণবিক গঠন, ডিএনএ গঠন যা কোনো অবস্থাতেই বাস্তবে অবলোকন সম্ভব নয়, সেগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে : চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুবৃহৎ পরিসরে এর ব্যবহার ব্যাপক। জটিল অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, ডিএনএ পর্যালোচনা ইত্যাদিসহ নবীন শল্য চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও রোগ নির্ণয়ে ব্যাপক হারে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়।

সামরিক প্রশিক্ষণে : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদেরকে উন্নত ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। সত্যিকারের যুদ্ধকালীন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সৈনিকেরা তাদের সঠিক করণীয় সম্পর্কে আগেই পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

২০২৪-২০২৫

ব্যবসা বাণিজ্যে : উৎপাদিত কিংবা প্রস্তাবিত পণ্যের গুণগত মান, গঠন, বিপণন, সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল্যায়ন, বিপণন কর্মী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সব ধরনের কার্যক্রমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সিমুলেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কোনো বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্য বাজারজাত করার আগে কোনো কর্মচারীর জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে সেগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক বাস্তব ব্যবহার থাকার পরেও কমবয়সি বা শিশুদের বেলায় এর যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে প্রতিক্রিয়া করে সে তুলনায় একজন কমবয়সির প্রতিক্রিয়া অনেক তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। শুধু তাই নয় এর যথেচ্ছ ব্যবহার তাদের শিখন ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporary trends of ICT)

বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার দিয়ে প্রথম শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়েছিল, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে নতুন একটি (মতান্তরে একাধিক) শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে। যে সমস্ত দেশ আগের শিল্পবিপ্লবে অংশ নিয়েছিল তারা পরবর্তীকালে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি যারা এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিল্পবিপ্লবে অংশ নেবে তারা ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বিকাশ পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে। এই প্রযুক্তিটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, কাজেই প্রথমবারের মতো এটি পৃথিবীর ধনী-দরিদ্র, সম্পদশালী কিংবা সম্পদহীন, অগ্রসর অথবা অনগ্রসর সকল জাতির জন্য সমান সুযোগের সৃষ্টি করেছে। যে জাতি যতটুকু আগ্রাসী হয়ে এই প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে সেই জাতি তত লাভবান হবে। আশার কথা হচ্ছে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকেও আমাদের দেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা যেসব ক্ষেত্রকে খুব বেশি প্রভাবিত করছে সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১.৩.১ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence)

চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি কিংবা বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানুষের সহজাত, একটি যন্ত্রকে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, সেটিকে চিন্তা করানো কিংবা বিশ্লেষণ করানোর ক্ষমতা দেওয়ার ধারণাটিকে সাধারণভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। কিছুদিন আগেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছিল দূর ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক বিষয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই দূরবর্তী ভবিষ্যতের বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হতে শুরু করেছে। তার প্রধান কারণ, পৃথিবীর মানুষ ডিজিটাল বিশ্বে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, হঠাৎ করে অচিন্তনীয় পরিমাণ ডেটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ডেটাকে প্রক্রিয়া করার মতো ক্ষমতাশালী কম্পিউটার আমাদের হাতে চলে এসেছে।

এই ডেটা বা তথ্যকে প্রক্রিয়া করার জন্য অনেক সময় সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়, এমন অ্যালগরিদম বা পদ্ধতি প্রয়োজন যার মাধ্যমে কম্পিউটার চিন্তা করে কোনো সমাধান বের করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ঠিক যেমনটা মানুষ বা অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণী করে থাকে। এ ধরনের পদ্ধতি এবং অ্যালগরিদম নিয়েই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে থাকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আওতায় বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স,
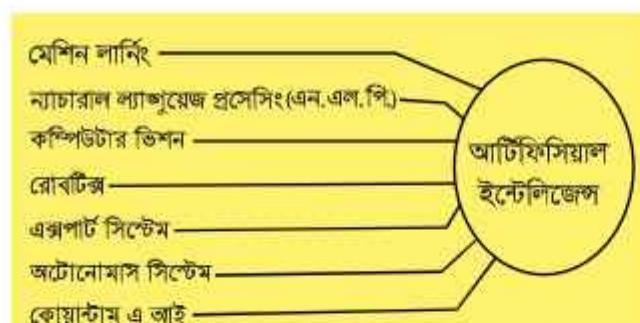
চিত্র 1.7 : আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং তার উদাহরণ

কম্পিউটার ভিশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP), স্পিচ প্রসেসিং ইত্যাদি। মেশিন লার্নিং-এর কাজ হচ্ছে এমনভাবে কম্পিউটারকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেন সে কোনো সিস্টেম সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম নিজেই শিখতে পারে এবং নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে তা কাজে লাগাতে পারে। রোবোটিক্স হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগিয়ে একটি রোবট বা যন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করানোর বিদ্যা। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং দ্বারা মানুষ সচরাচর যেসব ভাষা ব্যবহার করে (যেমনঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবি) সেসব ভাষায় কম্পিউটারের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। কম্পিউটার ভিশন হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে একটা মেশিন যা দেখতে পায় তা থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়া করার উপায় ঠিক যেমনটা মানুষ চোখ দিয়ে করে থাকে। আর স্পিচ প্রসেসিং হচ্ছে মূলত কম্পিউটারকে দিয়ে কথা বলানো ও শোনানোর কৌশল।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা নানা ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক, যা কিছুটা মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মানবমস্তিষ্কে আছে অসংখ্য নিউরন, যারা পরস্পরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে বলেই মানুষ চিন্তা করতে পারে এবং বিভিন্ন অনুভূতি বোধ করতে পারে। কম্পিউটারের জন্য গাণিতিকভাবে এমন কিছু কৃত্রিম নিউরন তৈরি করা হয়, যাকে পারসেপট্রন (perceptron) বলা হয়ে থাকে। এই কৃত্রিম নিউরনগুলোকে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়ে এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তাকেই নিউরাল নেটওয়ার্ক বলে। নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজ হচ্ছে কিছু ইনপুট থেকে একটা নির্দিষ্ট আউটপুট কীভাবে পাওয়া যেতে পারে তেমন একটা ফাংশন শেখা। সাধারণত একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে তিনটি স্তর থাকে – ইনপুট স্তর, লুক্কায়িত স্তর (hidden layer) ও আউটপুট স্তর। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে ইনপুট আর আউটপুট স্তরের কাজ হচ্ছে কম্পিউটারকে যে ফাংশনটা শেখানো হবে যথাক্রমে তার ইনপুট গ্রহণ করা ও আউটপুট প্রদান করা। এবার যেকোনো ইনপুটের জন্য সঠিক আউটপুটটা পেতে হলে লুক্কায়িত স্তরের মানগুলো কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে, সেটা ঠিক করার জন্য একটা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। নিউরাল নেটওয়ার্কটিকে অনেক ধরনের ইনপুট দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে থাকলে সে ধীরে ধীরে লুক্কায়িত স্তরের সঠিক মানগুলো শিখে যায়, যা ব্যবহার করে পরবর্তীতে তাকে নতুন কোনো ইনপুট দিলেও সে তার জন্য সঠিক আউটপুটটি দিতে পারবে। যত বেশি ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, নিউরাল নেটওয়ার্কটি তত ভালো কাজ করবে। লুক্কায়িত স্তরের সংখ্যা একটা না রেখে অনেকগুলো স্তর ব্যবহার করলে বেশ জটিল ফাংশন শেখা সম্ভব- এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিপ লার্নিং (Deep Learning)। ডিপ লার্নিং-এর সাহায্যে ইদানীং কম্পিউটার দ্বারা বেশ কঠিন সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে, যা আজ থেকে ১০-১২ বছর আগেও ভাবা যেত না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত C/C++, Java, MATLAB, Python, SHRDLU, PROLOG, LISP, CLISP, R ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয়। কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ডেভেলপারগণ তাঁদের পছন্দসই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে থাকেন।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র হিসেবে মেশিন লার্নিং-এর কথা বলা যায়। মেশিন লার্নিং-কে মোটা দাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সুপারভাইজড (Supervised) লার্নিং, আনসুপারভাইজড (unsupervised) লার্নিং এবং রিইনফোর্সমেন্ট (reinforcement) লার্নিং। Supervised Learning-এ মেশিনকে কোনো কিছু শেখানোর জন্য অনেকগুলো উদাহরণ দেয়া হয়, যা থেকে তথ্য আহরণ করে সে শিখে যায় তাকে কী করতে হবে। যেমন ধরো, আমরা কম্পিউটারকে শেখাতে চাই কেমন করে কুকুর আর বিড়াল চিনতে হয়। সেক্ষেত্রে তাকে অনেকগুলো কুকুরের আর বিড়ালের ছবি দেখিয়ে বলে দেয়া হবে কোনগুলো কুকুর আর কোনগুলো বিড়াল। কম্পিউটার তখন কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার করে শিখে ফেলবে কোন কোন বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে এ দু'টো প্রাণীকে আলাদা করা যায়, আর এরপর নতুন কোনো ছবি দেখলে নিজেই শনাক্ত করতে পারবে সেটা কুকুর নাকি বিড়াল। অন্যদিকে Unsupervised Learning-এ কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলে দেয়া হয় না, অনেকগুলো ডেটা বিশ্লেষণ করে সে বুঝতে পারবে ডেটাগুলোর পরস্পরের সাথে মিল বা অমিল কতটুকু। যেমন ধরো, কম্পিউটারকে অনেকগুলো প্রাণীর ছবি দিয়ে আমরা যদি কোনোটারই নাম না বলে দেই, তাও সে বুঝতে পারবে যে কুকুর আর নেকড়ে অনেকটা একই রকম, আবার এরা বানর ও শিম্পাঞ্জির থেকে ভিন্ন। Reinforcement learning-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে আলাদাভাবে কিছু শেখানো হয় না, নিজের মতোই কাজ করতে দেয়া হয়। কাজ শেষে তাকে শুধু বলা হয় কাজটা কতটুকু ঠিক হয়েছে বা ভুল হয়েছে, যাতে কম্পিউটার এর পরের বার তার আচরণ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে। এভাবে প্রথম প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হবে, কিন্তু অনেকবার কাজটা করতে করতে সে ঠিকই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে। একটু খেয়াল করে দেখো, এই তিন ধরনের মেশিন লার্নিং-ই কিন্তু মানুষ যেভাবে তার পরিবেশ থেকে শেখে, অনেকটা সেভাবেই কাজ করে।

চিত্র 1.8 : নিউরাল নেটওয়ার্কের গঠন

আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কিছু সফল প্রয়োগ দেখতে পাব, তার একটি হচ্ছে ড্রাইভারবিহীন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি। আবহাওয়ার সফল ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইতোমধ্যে দেখতে শুরু করেছি। এ ছাড়াও বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, অটোমোবাইল, ফাইন্যান্স, সার্ভেইল্যান্স, সোশাল মিডিয়া, এন্টারটেইনমেন্ট, শিক্ষা, স্পেস এক্সপ্লোরেশন, গেমিং, রোবটিক্স, কৃষি, ই-কমার্সসহ স্টক মার্কেটের শেয়ার লেনদেন, আইনি সমস্যার সম্ভাব্য সঠিক সমাধান, বিমান চালনা, যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আরেকটি শাখা হচ্ছে ডিপ লার্নিং (Deep Learning)। এটিও এক ধরনের মেশিন লার্নিং। কিন্তু ডিপ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে মেশিনকে শেখানোর জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। নিউরাল নেটওয়ার্কের অনেকগুলো স্থর থাকে সেখানে। মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের নেটওয়ার্ক যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেভাবেই ডিপ লার্নিং কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার এবং Graphics Processing Unit (GPU)- এর দরকার হয়।

মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে বর্তমানে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP) সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। যেমন : ChatGPT, Microsoft Copilot এবং Goggle Bard। এই সফটওয়্যাওর বা টুলগুলো যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে প্রায় মানুষের মতো করেই। ইন্টারনেট এবং তাদের নিজস্ব ডাটা সেটের লক্ষ লক্ষ রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে নিমিষেই উত্তর দিতে পারে যেকোনো প্রশ্নের। কবিতা লেখা থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোডসহ মাধ্যমে ছোটখাটো যেকোনো সফটওয়্যারের কোডও লিখে দিতে পারো।

১.৩.২ রোবটিক্স (Robotics)

রোবট শব্দটির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত, এই শব্দটি দিয়ে আমরা এমন একধরনের যন্ত্রকে বোঝাই যেটি মানুষের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ কর্মকাণ্ড করতে পারে। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে বিষয়টি রোবটের ধারণা, নকশা, উৎপাদন, কার্যক্রম কিংবা ব্যবহার বাস্তবায়ন করতে পারে তাকে রোবটিক্স বলা হয়ে থাকে।

রোবট কথাটি বলা হলে যদিও সাধারণভাবে আমরা মানুষের আকৃতির একটি যন্ত্র কল্পনা করি, কিন্তু প্রকৃত রোবট তার কাজের উপর নির্ভর করে যে কোনো আকারের বা আকৃতির হতে পারে। একটি রোবটের অনেকগুলো উপাদান থাকতে পারে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উপাদান হলো: প্রসেসিং ইউনিট, অ্যাকচুয়েটর, সেন্সর, পাওয়ার ইউনিট ইত্যাদি। আজ থেকে এক যুগ আগেও রোবটের মূল ব্যবহার গাড়ির ওয়েল্ডিং কিংবা স্ক্রু লাগানোর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে রোবটের কার্যপরিধিও বেড়ে যেতে শুরু করেছে এবং এমন কোনো কাজ নেই যেখানে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে না।

রোবটের গঠনে তিনটি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. একটি রোবট যে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তৈরি হয়, তার উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ যান্ত্রিক গঠন হয়ে থাকে।

চিত্র 1.9 : বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি হাঁটতে সক্ষম একটি রোবট

২. রোবটের যান্ত্রিক কাজ করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হয়।

৩. রোবটকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রোবট শিল্প এখনো তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এটি সাগরের গভীর থেকে শুরু করে মহাকাশ পর্যন্ত সব জায়গায়, যেখানে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যবহার (Application)

১. **বিপজ্জনক কাজে :** মানুষের পক্ষে যে সব কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন সমুদ্রের তলদেশে, যে কোনো অনুসন্ধানী কাজে, মাইন ইত্যাদি বিস্ফোরক দ্রব্য নিষ্ক্রিয়করণে, নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে, খনির অভ্যন্তরের কোনো কাজে, নদী-সমুদ্রের নিচে টানেল নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে রোবট ব্যবহৃত হয়।

২. **শিল্প-কারখানায় :** শিল্পোৎপাদন কাজে, শিল্প-কারখানার ভারী বস্তু নড়াচড়া করানো, প্যাকিং, সংযোজন, পরিবহন ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ ছাড়াও কম্পিউটার এইডেড কাজে রোবটিক্স-এর ব্যবহার রয়েছে।

৩. **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে :** মাইক্রোসার্কিটের উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষণ কাজ এবং ইলেকট্রনিক আইসি, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ইত্যাদির তৈরির জন্য রোবট ব্যবহৃত হয়।

৪. চিকিৎসা ক্ষেত্রে : সার্জারি, জীবাণুমুক্তকরণ, ওষুধ বিতরণ ইত্যাদি কাজে রোবট ব্যবহৃত হয়।

৫. সামরিক ক্ষেত্রে : বিস্ফোরক দ্রব্য শনাক্তকরণ, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অন্যান্য মিলিটারি অপারেশনে রোবট ব্যবহৃত হয়।

৬. শিক্ষা ও বিনোদনে : শারীরিকভাবে অসুস্থ, পঙ্গু বা অটিস্টিক শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় রোবটের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিশুদের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে খেলনা রোবট এবং মিডিয়া আর্টের ক্ষেত্রেও রোবট ব্যবহৃত হয়।

৭. নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণে : বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য, অন্ধকারে কোনো আগন্তুককে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, দুষ্কৃতকারী কিংবা বিপজ্জনক আসামিকে ধরা এবং পর্যবেক্ষণে পুলিশকে রোবট সহায়তা দিয়ে থাকে।

৮. মহাকাশ গবেষণায় : মহাকাশে কিংবা অন্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যানুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বা মহাকাশ যান প্রেরণ করার সময় ব্যাপকহারে রোবটের ব্যবহার আছে।

৯. ঘরোয়া কাজে : দৈনন্দিন ঘরোয়া কাজে, গৃহকর্মী হিসেবে নিত্যনৈমিত্তিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রোবট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে রোবটের সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরো ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে রোবটকে অনেক নতুন নতুন কাজে ব্যবহার করা হবে।

১.৩.৩ ইন্টারনেট অব থিংস্ (Internet of Things-IoT)

ইন্টারনেট অব থিংস্ (Internet of Things) কে সংক্ষেপে আইওটি (IoT) বলা হয়, যার অর্থ বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা ডিভাইসকে অটোমেটিক করার জন্য এসবের মধ্যে ছোট কম্পিউটার সিস্টেম সংযুক্ত থাকে, যার সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ দিলে তাকে ইন্টারনেট সংযোজিত জিনিসপত্র বা আইওটি বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমাদের ঘরের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন টিভি, ফ্রিজ, লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ইন্টারনেটের এর সাথে সংযুক্ত থাকলে যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ইত্যাদিসহ যে কোনো ধরনের কাজ করা যায়। এর ফলে সময় বাঁচে, দক্ষ ও কার্যকরভাবে কাজ সম্পন্ন করা যায়, ব্যয় সাশ্রয় হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে 'ইন্টারনেট অব থিংস' বা 'আইওটি' নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা চলছে। 5G নেটওয়ার্ক প্রচলিত হওয়ার কারণে দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ চালু হচ্ছে, রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিং সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে এবং IoT-এর জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বারে উন্মোচিত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ ৩২.১ বিলিয়ন ডিভাইসে ইন্টারনেট অব থিংস্ সংযুক্ত হবে যা ২০২৩ সালে ১৫.৯ বিলিয়ন ছিল।

IoT এমন একটি নেটওয়ার্ক যা বিভিন্ন ডিভাইসকে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য সংযুক্ত করে মানুষকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে পারে। এটা হলো মূলত নেটওয়ার্ক, প্রোগ্রাম, সেন্সর আর মেশিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিস্টেম, যেটা দিয়ে ডিভাইসগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং ডেটা

বিনিময় করতে পারে। প্রচলিত ইন্টারনেট মানুষকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছে যাকে মনুষ্যকেন্দ্রিক ইন্টারনেটও বলা হয়। আর বর্তমানে ইন্টারনেট শুধুমাত্র মানুষ নয়, বস্তুজগৎকেও সংযুক্ত করছে।

উদাহরণ হিসেবে স্মার্ট ফ্রিজের কথা বলা যেতে পারে। আইওটি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা গেলে স্মার্ট ফ্রিজ হবে এমন একটি যন্ত্র, যা নিজ থেকেই ভেতরে প্রয়োজনীয় খাদ্য আছে কিনা তা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে ফ্রিজের ভেতরে ক্যামেরা স্থাপন করা হবে, যা ফ্রিজের ভেতরের অবস্থা পরিদর্শন করে ব্যবহারকারীকে টেক্সটে বা এসএমএসের মাধ্যমে সামগ্রিক অবস্থা জানাবে। প্রয়োজনে ব্যবহারকারীর পক্ষে সুপার মার্কেটে অর্ডার প্লেস করতে পারবে।

পরিবেশ সুরক্ষা থেকে শুরু করে কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত সবকিছুতে ইন্টারনেট অব থিংস প্রভাব বিস্তার করছে। কৃষি ক্ষেত্রে কখন কোন সময়ে, কোন ধরনের ভূমিতে কোন ফসল চাষ করা উচিত, কোন ধরনের সার ব্যবহার করা উচিত, সার ব্যবহারের নিয়মাবলি, পোকামাকড় দমনে কীটনাশক ব্যবহারসহ পোকামাকড়ের ট্র্যাপ বা ফাঁদ সৃষ্টি করে তা নিয়ন্ত্রণ করা, ব্রিজের টোল আদায় থেকে শুরু করে ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা, চিকিৎসা সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে রোগীদের জন্য কখন কোন ওষুধ দরকার তাও বলে দিতে পারে ইন্টারনেট অব থিংস ডিভাইস।

১.৩.৪ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)

মহাকাশচারীসহ কিংবা মহাকাশচারী ছাড়াই কোনো মহাকাশযান যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাঁধন কাটিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কমপক্ষে একশত কিলোমিটার উপরে বায়ুমন্ডলের বাইরে যায় আমরা সেটাকে

মহাকাশ অভিযান বলে থাকি। মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি মাইল ফলকের মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো, ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবরে মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক উৎক্ষেপণ, ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল প্রথম মানুষ, য়ুরি গ্যাগারিনের মহাকাশ অভিযান, ২০ জুলাই ১৯৬৯ প্রথম মানুষের চাঁদে অবতরণ, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রথম মঙ্গল গ্রহে মার্স-৩-এর অবতরণ এবং ১২ এপ্রিল ১৯৮১ প্রথম স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ। এর ভেতর চাঁদে অবতরণ এবং স্পেস শাটলের উৎক্ষেপণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, অন্যগুলো ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের। মহাকাশ অভিযান করার জন্য একটি মহাকাশযানকে ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ হাজার মাইল গতিবেগ অর্জন করতে হয় যেটি শব্দের গতিবেগ থেকে প্রায় আটগুণ বেশি। এর জন্য একাধিক রকেটকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

মহাকাশচারীসহ একটি মহাকাশযানকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হলে এই প্রচণ্ড গতিবেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় বাতাসের ঘর্ষণে সৃষ্ট তাপকে বিকিরণ করে তার গতিবেগ আবার সহনশীল পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল গবেষণা করতে হয়েছে। মহাকাশযানের গতিপথ নির্ণয়, যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বক্ষণ পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।

চিত্র 1.10 : পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান মহাকাশ স্টেশন

মহাকাশ প্রযুক্তির বিকাশ হওয়ার পর অসংখ্য স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য এক ধরনের স্যাটেলাইটকে বলে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে মিল রেখে হুবহু একই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাই জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটকে পৃথিবী থেকে আকাশে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে বলে মনে হয়। টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহার করার জন্য এটি প্রথম আবশ্যকীয় শর্ত। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু-১ নামে যে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে স্থাপন করে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করেছে, সেটি একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট।

ব্যবহার (Application)

বর্তমান বিশ্বে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রযুক্তি। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করি। আমাদের স্মার্টফোনে যে জিপিএস (GPS: Global Positioning System) আছে, সেগুলো অসংখ্য স্যাটেলাইটের সিগনাল ব্যবহার করে কাজ করে। যখন আমরা টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠান দেখি সেগুলো অনেক সময় স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রচার করা হয়। আমরা যখন দূর দেশে কথা বলি অনেক সময়েই সেই কথাগুলো স্যাটেলাইটের ভেতর দিয়ে সেখানে যায়। যখন সমুদ্রে নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়, আবহাওয়া স্যাটেলাইট তার নিখুঁত ছবি তুলে আমাদের সতর্ক করে দেয়। মহাকাশ গবেষণায় স্যাটেলাইট অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে, হাবল টেলিস্কোপে তোলা গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি বিজ্ঞানের জগতে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে।

তবে মহাকাশ অভিযানে প্রযুক্তিগত সমস্যা ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যাও আছে, যেমন মহাকাশে বিভিন্ন উচ্চতায় অসংখ্য পরিত্যক্ত এবং অকেজো মহাকাশযান কিংবা তাদের ভগ্নাংশ অচিন্তনীয় গতিবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। সেগুলোর সঙ্গে অন্য মহাকাশযানের সংঘর্ষের আশঙ্কা এখন একটি বাস্তব সমস্যা। মহাকাশ অভিযান যে এখন শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয় সেটিও সত্যি নয়। অনেক দেশই নানা ধরনের গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবাজ দেশগুলো মহাকাশভিত্তিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে, যেটি সমস্ত পৃথিবীকে একটি বড় বিপদের ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে।

২০১৮ সালের ১২ মে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ উৎক্ষেপণ করা হয়, ফলে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম যুক্ত হয়। এই স্যাটেলাইট স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে টেলিযোগাযোগ স্থাপন, নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার সেবা নিশ্চিত করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেন ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা করা। ইতোমধ্যে আমরা এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া যেসব জায়গায় ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা সাবমেরিন ক্যাবল পৌঁছায়নি, সেসব জায়গায় এ স্যাটেলাইটের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর ও রাঙামাটি বেতবুনিয়ার ভূ-কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জয়দেবপুরের ভূকেন্দ্রটি মূল স্টেশন আর বেতবুনিয়া স্টেশনটি বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও টিভি চ্যানেল এবং বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশের টিভি চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ থেকে ট্রান্সপন্ডার ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন সাশ্রয় হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২ উৎক্ষেপণের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২ উৎক্ষেপণ করা হলে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

১.৩.৫ আইসিটিপেস উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production)

ব্যবহারকারী বা ভোক্তাদের ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও পরিষেবা তৈরি বা সরবরাহের পদ্ধতিকে বলে উৎপাদন। এই প্রক্রিয়া সৃজনশীলতা, গবেষণা, জ্ঞান, মেধা ও মনন ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবহার বা কর্মের দ্বারা দৃশ্যমান হয়। একদিকে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দের বৈচিত্র্য, অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে নতুন নতুন পণ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করার কারণে মানুষের নানা রকম চাহিদার সৃষ্টি হয়। সেই চাহিদা মিটাতে প্রতিনিয়ত পণ্যের নতুন নতুন মডেল বাজারে আসছে। চাহিদা মোতাবেক পণ্যের বৈচিত্র্য ও গুণগতমান নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা, পরিবহন, বিপণন, নকশা, উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। আজকাল হাতের স্পর্শ ছাড়াই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন চলছে। যার দরুন সময়ের অপচয় রোধসহ কাঁচামাল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে গেছে। তাছাড়া, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে

চিত্র 1.11 : বাংলাদেশে ওয়ালটনের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎপাদন

কোনো ধরনের যন্ত্র, পণ্যদ্রব্য ডিজাইনিং, ড্রাফটিং, সিম্যুলেশন করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার, যেমন— Computer Aided Design (CAD) ইত্যাদির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে নকশা প্রণয়ন করা হয়। জটিল ডাইস (Dice) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাটা যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা কিংবা ওষুধ শিল্পে কম্পিউটারের সাহায্যে কাঁচামালের পরিমাণ, কিংবা চাপ ও তাপ নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মীবাহিনীর যাবতীয় তথ্যাদি যেমন— দক্ষতা, শ্রমঘণ্টা, পারিশ্রমিকসহ ব্যক্তিগত তথ্যাদি এবং পণ্য সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য নির্ধারিত সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। একটি কারখানাকে পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় করে সেটিকে চব্বিশ ঘণ্টা কর্মক্ষম রাখা সম্ভব।

কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন-পর্যবেক্ষণ-রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক ও প্রান্তিক চাষিগণকে খুব সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অবহিতকরণ ও তথ্য সরবরাহের দ্বারা কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ, বীজের ধরন, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষণ, সার প্রয়োগের পরিমাপ, রোগ-বালাই প্রতিরোধ, কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সবধরনের তথ্য এর মাধ্যমে জানতে পারবেন। তাছাড়া কৃষি গবেষণাগারে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী নতুন নতুন খাদ্যশস্য ব্যাপক হারে উৎপাদনের বিষয়ের তাত্ত্বিক কার্যক্রম কিন্তু আইসিটির ব্যবহারেই সম্ভব হচ্ছে। আমাদের দেশে কৃষি তথ্য সার্ভিস সংক্রান্ত সরকারি এবং বেসরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসেবা পাওয়া যাবে।

১.৩.৬ প্রতিরক্ষা (Defence)

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। সন্ত্রাস, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষার সাথেই প্রতিরক্ষা শিল্প খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি একদিকে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে এবং অন্যদিকে অর্থনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই শিল্পের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করতে না পারলেও তাদের মানব সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সফটওয়্যার প্রস্তুত এবং বিপণন করে দেশের অর্থনীতিতেও বড় ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিরক্ষা এবং আইসিটি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। যেমন— একসময় বোমার কোনো নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ছিল না, তাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হতো সেটি সেখানে আঘাত করত। এখন আইসিটির সহায়তায় স্মার্ট বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেটি নির্দেশ শুনে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আঘাত করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মনুষ্যবিহীন এয়ারক্র্যাফট (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) বা ড্রোন (Drone) ব্যবহার করে যুদ্ধের পরিস্থিতিই পাল্টে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আকাশ থেকে মহাকাশকেন্দ্রিক এবং হার্ডওয়্যার থেকে সফটওয়্যার বেজড যুদ্ধ এখনকার যুদ্ধের নিত্যদিনের চিত্র। আধুনিক যুদ্ধে স্যাটেলাইট এবং

২০২৪-২০২৫

ইন্টারনেটের প্রভাব অপরিসীম। প্রতিরক্ষা শিল্পে এসবের লক্ষণীয় প্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

১. সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে সিমুলেশান এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশ তৈরি করে ব্যাপকভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এটি নিরাপদ, অর্থ সাশ্রয়ী এবং ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা সম্ভব।

২. মানুষকেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে আধুনিক যুদ্ধে নেটওয়ার্কভিত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে কমান্ডার তার অফিসে অবস্থান করে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যুদ্ধ পরিচালনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

চিত্র 1.12 : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের মিশনে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনরত

৩. স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা দূর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সরাসরি সম্প্রচার, পর্যবেক্ষণ ও কমান্ডিং করা সম্ভব হয়।

৪. শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য তাদের কমান্ড সেন্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইলেক্ট্রনিক জ্যামিং করে অচল করে দিতে পারে।

৫. মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকর ও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

৬. অত্যন্ত গোপনে শত্রুপক্ষের শিবিরে আঘাত হানার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা যায়।

৭. মিসাইল, রকেট বা ড্রোন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী একত্রে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নামে পরিচিত। এই বাহিনীর উপর আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়ন করে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিরক্ষা বাহিনীর নানা ধরনের গবেষণার কারণে অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষ লাভবান হয়েছে। ইন্টারনেট এবং জিপিএস সেরকম দুইটি উদাহরণ। অন্যদিকে এটাও সত্যি যে পৃথিবীতে যুদ্ধাস্ত্রের একটি বিশাল বাণিজ্য থাকার কারণে পৃথিবীর বিশাল সম্পদ অপচয় করে প্রতিনিয়ত নতুন যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হয়। সেই অস্ত্র প্রকৃত যুদ্ধাবস্থায় পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরে পরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ লাগিয়ে রাখার দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণও রয়েছে।

১.৩.৭ বায়োমেট্রিক (Biometric)

মানুষের দৈহিক গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে বায়োমেট্রিক বলে। একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের আচরণ বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্য কখনোই একরকম হবে না। বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায় বায়োমেট্রিকের প্রকারভেদ দুইরকম :

২০১৪-২০১৫

চিত্র 1.13 : আঙুলের রেখা শনাক্তকরণ যন্ত্রের ব্যবহার

(ক) শরীরবৃত্তীয় (Physiological) বায়োমেট্রিক পদ্ধতি

আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print) : এ পৃথিবীতে প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ ভিন্ন অর্থাৎ একজনের সাথে অন্য আরেকজনের আঙুলের ছাপের মিল নেই। একজনের টিপসই কখনোই অন্যজনের সাথে খাপ খাবে না। ফিংগার প্রিন্ট রিডারে কারো আঙুলের ছাপ দেয়ার পর ছাপটির ছবি কম্পিউটার ডেটাবেজে সংরক্ষিত হয়ে যায়। ফিংগার প্রিন্ট মেশিনটি আঙুলের রেখার বিন্যাস, ত্বকের টিস্যু এবং ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপচিত্র তৈরি করে।

হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand geometry) : এ পদ্ধতিতে হাতের আকার, পুরুত্ব, হাতের রেখার বিন্যাস ও আঙুলের দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। তবে কায়িক পরিশ্রম করে এমন মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়। তাছাড়া হাতে কিছু লেগে থাকলেও এ পদ্ধতির কার্যকারিতা সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

আইরিশ শনাক্তকরণ (Irish scanning) : এ পদ্ধতিতে চোখের মণির চারপাশে বেষ্টিত রঙিন বলয় বা আইরিশ বিশ্লেষণ করে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। শনাক্তকরণের জন্য সময়ও তুলনামূলকভাবে কম লাগে এবং সূক্ষ্মতাও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হয়ে থাকে। তবে কন্টাক্ট লেন্স পরা থাকলে এ পদ্ধতি সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে।

মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition) : এই পদ্ধতিতে পুরো মুখমণ্ডলের ছবি তুলে শনাক্ত করা হয়। আগে থেকে রক্ষিত স্যাম্পল মানের সাথে যার মুখমণ্ডলের আকৃতি তুলনা করা হবে তার ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে সেটি তুলনা করা হয়।

ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA test) : ডিএনএ (DNA: Deoxyribo Nucleic Acid) টেস্টের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রশ্নাতীতভাবে শনাক্ত করা যায়। মানব শরীরের যে কোনো উপাদান যেমন— রক্ত, চুল, আঙুলের নখ, মুখের লালা হতে ডিএনএ'র নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর এগুলোর গঠন-প্রকৃতি শনাক্তের দ্বারা ম্যাপ বা ব্লু-প্রিন্ট বায়োলজিক্যাল ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে নমুনা নিয়ে পূর্ববর্তী ডেটার সাথে মিলিয়ে কোনো ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়।

(খ) আচরণগত (Behavioral) বায়োমেট্রিক পদ্ধতি

কিবোর্ডে টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing keystroke verification) : কিবোর্ড কিংবা এ জাতীয় কোনো ইনপুট ডিভাইসে তার গোপনীয় কোড কত দ্রুত টাইপ করে দিতে পারে তার সময় পূর্বের সময়ের সাথে মিলিয়ে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature verification) : এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ও দীর্ঘদিনের প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের আকার, ধরন, লেখার গতি, সময়, লেখার মাধ্যমের (যেমন— কলম, পেনসিল ইত্যাদি) চাপকে যাচাই করে শনাক্তকরণ করা হয়।

২০১৪-২০১৫

কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice recognition) : এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বরকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ধারণপূর্বক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় এবং পূর্বের ধারণকৃত কণ্ঠস্বরের সাথে তুলনা করে শনাক্তের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির সর্দি, কাশি হলে শনাক্তকরণে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

মৃতদেহ শনাক্তকরণ, অপরাধী শনাক্তকরণ, পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শনাক্তকরণ, জাতীয় পরিচয়পত্র, বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার নিবন্ধন, এটিএম ও অনলাইন ব্যাংকিং, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিতি নির্ণয়, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন লগইন, ই-কমার্স ও স্মার্ট কার্ড ইত্যাদিতে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে।

১.৩.৮ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)

বায়োইনফরমেটিক্স জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশান ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত এবং পরিসংখ্যানের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিষয়। মূলত এই বিষয়টির জন্ম হয়েছে জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য।

বায়োইনফরমেটিক্সের প্রথম বড় সাফল্য এসেছিল যখন ১৩ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মানব জিনোম প্রথমবার সিকোয়েন্স করা হয়েছিল এবং সেই তথ্য অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল যেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেটি পেতে পারে। এখন প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে কয়েক ঘণ্টার ভেতর পুরো মানব জিনোম সিকোয়েন্স করা সম্ভব। বায়োইনফরমেটিক্সের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে ক্যান্সারের উপর গবেষণা। ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আলাদা আলাদাভাবে তার নিজস্ব ওষুধ ব্যবহৃত হবে, সেটিও সম্ভব হবে বায়োইনফরমেটিক্সের গবেষণার ফলে। প্রোটিনের গঠন বহুদিন থেকে বিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বায়োইনফরমেটিক্স এই ব্যাপারেও মূল গবেষণায় বড় ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিবর্তন। এই বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনে বায়োইনফরমেটিক্স অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করছে।

সাধারণত নিচের চারটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপাদান ও কৌশলের সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি কাজ করে থাকে :

১. আণবিক জীববিদ্যা ও মেডিসিন : ডেটা উৎস বিশ্লেষণের কাজ করে।
২. ডেটাবেজ : নিরাপদ ডেটা সংরক্ষণ ও ডেটা রিট্রিভ (Retrive) করা।
৩. প্রোগ্রাম : উপাত্ত বিশ্লেষণ অ্যালগরিদম যার মাধ্যমে বায়োইনফরমেটিক্স কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়।
৪. গণিত ও পরিসংখ্যান : এর সাহায্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহার

মূলত জৈবিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে সম্যক এবং সঠিক ধারণা অর্জন করার ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়। আর এই জৈবিক তথ্য হিসাব-নিকাশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারও অপরিহার্য। তবে জিনোম সিকোয়েন্স, প্রোটিন সিকোয়েন্স ইত্যাদি গঠন উপাদানের ইলেকট্রনিক ডেটাবেজ গঠনে কম্পিউটার প্রযুক্তি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও মলিকুলার মেডিসিন, জিনথেরাপি, ওষুধ তৈরিতে, বর্জ্য পরিষ্কারকরণে, জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায়, বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানে, জীবাণু অস্ত্র তৈরিতে, ডিএনএ ম্যাপিং ও অ্যানালাইসিস, জিন ফাইন্ডিং, প্রোটিনের মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়।

২০২৪-২০২৫

১.৩.৯ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

আমরা জানি, প্রতিটি জীবদেহ অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষ দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কোষের মাঝে থাকে ক্রোমোজোম (Chromosome), যেগুলো তৈরি হয় ডিএনএ (DNA: Deoxyribo Nucleic Acid) ডাবল হেলিক্স দিয়ে। এই ডিএনএ'র ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সেই প্রাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্যকে বহন করে এবং সেগুলো জিন (Gene) হিসেবে পরিচিত। একটি ক্রোমোজোমে অসংখ্য জিন থাকতে পারে, মানবদেহে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার জিন রয়েছে। এ ধরনের এক সেট জিনকে জিনোম বলা হয়।
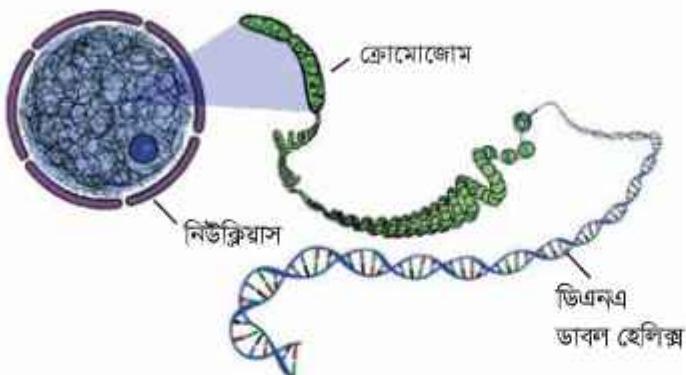
চিত্র 1.14 : নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্রোমোজোম এবং ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের অবস্থান

জিনোম হলো জীবের বৈশিষ্ট্যের নকশা বা বিন্যাস। জিনোম সিকোয়েন্স দিয়ে বোঝায় কোষের সম্পূর্ণ ডিএনএ বিন্যাসের ক্রম; জিনোম যত দীর্ঘ হবে, তার ধারণ করা তথ্যও তত বেশি হবে। জিনোমের উপর নির্ভর করে ঐ প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কীরূপ হবে।

যেহেতু একটি জিন হচ্ছে একটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের বাহক, তাই কোনো প্রাণীর জিনোমের কোনো একটি জিনকে পরিবর্তন করে সেই প্রাণীর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা সম্ভব। যেহেতু জিনগুলো আসলে ডিএনএ'র একটি অংশ, তাই একটা জিনকে পরিবর্তন করতে হলে ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ'র সেই অংশটুকু কেটে আলাদা করে অন্য কোনো প্রাণী বা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটি জিন কেটে এনে সেখানে লাগিয়ে দিতে হয়।

গবেষণার মাধ্যমে যখন একটি জিন পরিবর্তন করে সেখানে অন্য জিন লাগানো হয় তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা RDNA। এসব RDNA সমৃদ্ধ জীবকোষকে বলা হয় Genetically Modified Organism (GMO)। জিন জোড়া লাগানো বা রিকম্বিনেট ডিএনএ বা আরডিএনএ সত্যিকার অর্থে কী কাজে যথার্থভাবে ব্যবহার করা যায় সেটি বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। বস্তুত জিনপ্রযুক্তির এই অত্যাধুনিক শাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো জীবের নতুন ও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে ঐ জীবের জিন পৃথক করে অন্য জীবের জিনের সাথে সংযুক্ত করে নতুন জিন বা ডিএনএ তৈরি করা। তাই জেনেটিক

চিত্র 1.15 : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বেগুনি রঙের ধান

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি, জীবদেহে জিনোমকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে কিংবা একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টির কৌশলই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। উচ্চফলনশীল জাতের ধান ও অন্যান্য ফসল এবং প্রাণীর জিনের সাথে সাধারণ জিন জোড়া লাগিয়ে নতুন ধরনের আরো উচ্চফলনশীল বা হাইব্রিড জাতের শস্য, প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে। এটিই সহজ ভাষায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের অনেক দেশেরই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য ঘাটতি একটি সাধারণ সমস্যা, যার জন্য খাদ্য আমদানি করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে বহুগুণে খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এই বিষয়টি হাইব্রিড নামে বহুল পরিচিত। প্রাণীর আকার এবং মাংসবৃদ্ধি, দুধে আমিষের পরিমাণ বাড়ানো এইধরনের কাজ করেও খাদ্য সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৌশলগতভাবে পরিবর্তিত E. Coli ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হতে মানবদেহের ইনসুলিন তৈরি, হরমোন বৃদ্ধি, এবং বামনত্ব, ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদির চিকিৎসায় জিন প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অল্প সময়ে সুচারুরূপে স্থানান্তর করা সম্ভব হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক বা উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রচলিত প্রজননের তুলনায় এ প্রযুক্তিটি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

আমাদের দেশেও এ প্রযুক্তির উপর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বেশ কিছু সংস্থা কাজ করে অনেক উচ্চফলনশীল জাতের শস্যবীজ উৎপাদন করেছে। এসব বীজ ব্যবহার করে শস্যও কয়েকগুণ বেশি হারে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই আমাদের দেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের বহু ভ্যারাইটির ধানের বীজ উদ্ভাবন করেছে। এই ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবিত পার্পল কালার (বেগুনি রঙের)-এর উফশি ধান দেশ-বিদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জনাব মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষক পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার আমাদের দেশের সোনালি আঁশকে বিশ্ব দরবারে হারানো ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। এ ছাড়াও ভুট্টা, ধান, তুলা, টমেটো, পেঁপেসহ অসংখ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো, আগাছা সহিষ্ণু করা, পোকামাকড় প্রতিরোধী করা এবং বিভিন্ন জাতের মৎস্য সম্পদ (বিশেষত মাগুর, কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি) বৃদ্ধির জন্য জিন প্রকৌশলকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের পাশাপাশি এর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে জীবজগতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি, অনৈতিক বা অযাচিতভাবে জিনের স্থানান্তর, মানবদেহে প্রয়োগযোগ্য এন্টিবায়োটিক ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস ও অ্যালার্জির উদ্ভব কিংবা ভয়াবহ ও জীববিধ্বংসী প্রজাতি বা ভাইরাস উদ্ভবের আশঙ্কা ইত্যাদি।

১.৩.১০ ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology)

10^{-9} মিটারকে ন্যানোমিটার বলে এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা এবং ব্যবহার করাকে ন্যানোটেকনোলজি বলে। এই আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা হলে তাকে সাধারণভাবে ন্যানো-পার্টিকেল বলে। ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য ন্যানো পার্টিকেলের পৃষ্ঠদেশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি; সেজন্য রাসায়নিকভাবে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একটি দ্রব্যের বড় আকৃতিতে যে ধর্ম বা গুণাগুণ থাকে, ন্যানো পার্টিকেল হলে তার

ভেতর কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে বলে সেই ধর্ম বা গুণাগুণ পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় অনেক ধাতুর কাঠিন্য ন্যানো আকৃতিতে সাধারণ অবস্থা থেকে সাতগুণ বেশি হতে পারে। এই কারণে এই ন্যানো-পার্টিকেল নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে কৌতূহলী।

চিত্র 1.16 : 60 টি কার্বন পরমানু দিয়ে তৈরি ন্যানো পার্টিকেল C_{60}

রসায়নবিদেরা অনেকদিন থেকে ন্যানো ব্যাসার্ধের পলিমার তৈরি করে আসছেন এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের চিপস তৈরি করার সময় প্রযুক্তিবিদেরা সেখানে ন্যানো আকৃতির ডিজাইন করে আসছেন, কিন্তু শুধু সাম্প্রতিক সময়ে ন্যানো পার্টিকেল তৈরি এবং ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় টুল তৈরি হয়েছে এবং ন্যানো পার্টিকেলের জগৎ সত্যিকার অর্থে উন্মুক্ত হয়েছে।

এ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ স্কেলে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য আকারে সূক্ষ্ম ও ছোট হলেও অত্যন্ত মজবুত, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, টেকসই ও হালকা হয়। 'আগামী বিশ্ব হবে ন্যানোটেকনোলজির বিশ্ব',—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্মার্ট ওষুধের মাধ্যমে প্রাণঘাতী ক্যান্সার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যানো রোবট, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কার্যকরী ও সস্তায় শক্তি উৎপাদনসহ পানি ও বায়ুদূষণ কমানো সম্ভব হবে মর্মে গবেষকগণ আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। ন্যানো প্রযুক্তি দুটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় :

(ক) ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ (Bottom Up) : এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণবিক উপাদান থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা হয়।

(খ) বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র (Top Down) : এই পদ্ধতিতে একটু বড় আকৃতির কিছু থেকে শুরু করে তাকে ভেঙে ছোট করতে করতে কোনো বস্তুকে ক্ষুদ্রাকৃতির আকৃতিতে পরিণত করা হয়।

ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার

১. **কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারে ব্যবহার :** প্রসেসরের উচ্চ গতি, দীর্ঘস্থায়িত্ব, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে ব্যবহার্য। একই সঙ্গে ডিসপ্লে ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়তা করে।

২. **চিকিৎসা ক্ষেত্রে :** ন্যানো-রোবট ব্যবহার করে অপারেশন করা, যেমন— এনজিওপ্লাস্টি সরাসরি রোগাক্রান্ত সেলে চিকিৎসা প্রদান করা, যেমন— ন্যানো ক্রায়োসার্জারি, ডায়াগনোসিস করা, যেমন— এন্ডোসকপি, এনজিওগ্রাম, কলোনোস্কোপি ইত্যাদি।

৩. **খাদ্যশিল্পে :** খাদ্যজাত দ্রব্য প্যাকেটিং, খাদ্যে স্বাদ তৈরিতে, খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. **জ্বালানি ক্ষেত্রে :** জ্বালানি উৎসের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফুয়েল তৈরির কাজে, যেমন— হাইড্রোজেন আয়ন থেকে ফুয়েল, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌরকোষ তৈরির কাজে।

৫. **যোগাযোগ ক্ষেত্রে :** হালকা ওজনের ও কম জ্বালানি চাহিদাসম্পন্ন গাড়ি প্রস্তুতকরণে।

৬. **খেলাধুলার সামগ্রী তৈরিতে :** বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সামগ্রী যেমন— ক্রিকেট, টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য, ফুটবল বা গলফ বলের বাতাসের ভারসাম্য রক্ষার্থে।

২০২৪-২০২৫
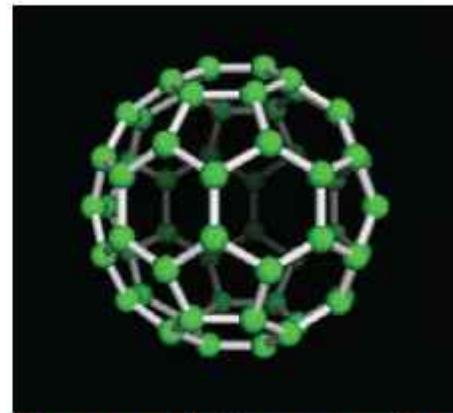
৭. বায়ু ও পানি দূষণ রোধে : শিল্প কারখানার ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্যকে ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহার করে অক্ষতিকর বস্তুতে রূপান্তর করে পানিতে নিষ্কাশিত করা; যেমন— ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যকে এই প্রযুক্তির সাহায্যে দূষণমুক্ত করে নদীর পানির দূষণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তেমনিভাবে গাড়ি ও শিল্পকারখানার নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া ন্যানো পার্টিকেলের সহায়তায় দূষণমুক্ত গ্যাসে পরিণত করে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়।

৮. প্রসাধন শিল্পে : প্রসাধনীতে জিংক অক্সাইড-এর ন্যানো পার্টিকেল যুক্ত হওয়ায় ত্বকের ক্যান্সাররোধ সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার তৈরির কাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ তৈরির ক্ষেত্রে এবং এন্টি-এজিং ক্রিম তৈরিতেও ন্যানো-টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

তবে উল্লেখ্য যে, ন্যানো পার্টিকেলের ব্যবহারে নানাবিধ সুবিধা থাকলেও অন্যদিকে ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি, প্রচলিত জ্বালানি গ্যাস-তৈল ইত্যাদির বিকল্প হিসেবে এর অপব্যবহার, অভিজাত শ্রেণির উদ্ভবের দরুন ধনী ও গরিবের পার্থক্য চরম মাত্রায় বৃদ্ধি, কালোবাজারি এবং সর্বোপরি মানব শরীরের কোষের গঠনশৈলী পরিবর্তনসহ কোষ মেরে ফেলার মতো ক্ষতিকারক প্রযুক্তি হিসেবে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থান হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি।

১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Ethics of ICT usages)

নৈতিকতা হচ্ছে এক ধরনের মানদণ্ড যা আচরণ, কাজ এবং পছন্দের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এটি ঔচিত্য ও অনুচিত্যের মাপকাঠিও বটে, কেননা মানবধর্ম এবং নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনৈতিক ও বেআইনি এক বিষয় নয়। অনেক অনৈতিক কাজ আইন বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু সকল আইন বিরুদ্ধ কাজ অবশ্যই অনৈতিক। তবে সাম্প্রতিককালে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরনের অনৈতিক এবং অন্যায় কাজের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে পৃথিবীর অনেক দেশেই সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। কাজেই একসময় যে কাজটি শুধু অনৈতিক ছিল সেটি অনেকক্ষেত্রে এখন বেআইনি হয়ে গেছে, অর্থাৎ সামনাসামনি কাউকে গালাগাল করে একজন পার পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু ফেসবুকে কাউকে গালাগাল করে একজন জেলে চলে যেতে পারে।

যেহেতু পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ কোনো না কোনোভাবে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত তাই এর ব্যবহারের নৈতিকতার বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া উচিত। গুরুত্ব না দেয়া হলে একজন অনৈতিক কাজ দিয়ে শুরু করে খুব সহজেই অন্যায় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে অবহিত এবং যথাযথভাবে রপ্ত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

কম্পিউটার ইথিক্স ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ে দশটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. তুমি কম্পিউটার ব্যবহার করে অন্যের ক্ষতি করবে না।
২. তুমি অন্যের কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. তুমি অন্য কারও ফাইলে অনধিকার প্রবেশ করবে না।
৪. তুমি চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করবে না।
৫. তুমি মিথ্যা তথ্যের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করবে না।

৬. তুমি লাইসেন্সবিহীন সফটওয়্যার ব্যবহার ও কপি করবে না।
৭. তুমি বিনা অনুমতিতে কম্পিউটার সংক্রান্ত অন্যের রিসোর্স ব্যবহার করবে না।
৮. তুমি অন্যের কাজকে নিজের কাজ বলে চালিয়ে দেবে না।
৯. তুমি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের আগে সমাজের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করবে।
১০. তুমি কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় অন্যের ভালোমন্দ বিবেচনা করবে এবং শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করবে।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট কিংবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সময় উপরে বর্ণিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত নৈতিক নির্দেশনাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরি।

আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ধরনের অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে বহুল প্রচলিতগুলো হচ্ছে :

হ্যাকিং (Hacking) : কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা ডেটায় অননুমোদিতভাবে অধিকার প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ (Access) লাভ করার উপায়কে হ্যাকিং বলে। এতে ব্যক্তির তথ্যের বা সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি না করে শুধু নিরাপত্তা ত্রুটি সম্পর্কে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে জানান দেওয়া হয়। যে সব ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের কর্মে/অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে তাদের হ্যাকার বলে।

ফিশিং (Phishing) : ফিশিং করার অর্থ ই-মেইল বা মেসেজের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীকে নকল বা ফেইক ওয়েবসাইটে নিয়ে কৌশলে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করা এবং তারপর ব্যবহারকারীর অ্যাকসেস কোড, পিন নম্বর, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, পাসওয়ার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে তাদের নানা ধরনের বিপদে ফেলা।

স্প্যামিং (Spaming) : অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ই-মেইল কিংবা মেসেজ পাঠানোকে স্প্যামিং বলে। এই কাজ যারা করে তাদেরকে স্প্যামার বলা হয়। যখন কোনো ব্যবহারকারী কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করেন বা কোনো গ্রুপের মেসেজ বোর্ডে প্রবেশ করেন তখন স্প্যামাররা সেখান থেকে ই-মেইল অ্যাড্রেস সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীর ই-মেইলে বিভিন্ন প্রতারণামূলক মেসেজ পাঠায়।

সফটওয়্যার পাইরেসি (Software piracy) : সফটওয়্যার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রযুক্তিপণ্য, যা প্রোগ্রামারগণ পেশাগত দক্ষতা, মেধা আর মননের সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে তৈরি করে থাকেন এবং এগুলোর তাঁরাই স্বত্বাধিকারী হন। লাইসেন্সবিহীনভাবে বা স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন ব্যতিরেকে এ ধরনের সফটওয়্যার কপি করা, নিজের নামে কিংবা কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া পাইরেসির আওতায় পড়ে। Business Software Alliance (BSA)-এর সূত্রমতে ব্যবহৃত সকল সফটওয়্যারের প্রায় ৩৬ ভাগই পাইরেটেড সফটওয়্যার। কপিরাইট আইন দ্বারা উন্নত দেশগুলোয় এই ধরনের অপরাধ প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো লেখা সাহিত্য, গবেষণা বা সম্পাদনাকর্ম হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাকে প্লেজিয়ারিজম বলে। অর্থাৎ অন্যের লেখা বা তথ্য স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াই হলো প্লেজিয়ারিজম। প্লেজিয়ারিজম এর বাংলা পরিভাষা হলো কুম্ভীলকবৃত্তি। অনেক সময় কোনো লেখার গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছ নকল করলে তাও প্লেজিয়ারিজমের আওতায় পড়ে। প্লেজিয়ারিজম একটি বেআইনি কাজ,

সম্মিলিতভাবে প্লেজিয়ারিজম প্রতিরোধ করা উচিৎ।

ইদানীং শিক্ষাক্ষেত্রে প্লেজিয়ারিজম অনেক বেশি পরিলক্ষিত হ হচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর চিন্তনদক্ষতা অর্জন করা। অর্থাৎ কোন বিষয় তা যতই জটিল হোক না কেন তা বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, সংক্ষেপণ বা নতুন ধারণা প্রবর্তন করার দক্ষতা অর্জন করা হলো শিক্ষা। প্লেজিয়ারিজম বা কুম্ভীলকবৃত্তির কারণে শিক্ষার্থীদের এই দক্ষতা অর্জনের কাজটি বাধাগ্রস্থ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্লেজিয়ারিজমকে নীতিগতভাবে একটি জটিল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্লেজিয়ারিজম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এখানে কয়েক প্রকারের প্লেজিয়ারিজমের উল্লেখ করা হলো :

১) ক্লোন (Clone) প্লেজিয়ারিজম : এতে একজন ব্যক্তি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কোনো বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট হুবহু কপি (নকল) করে এবং এটিকে তার নিজের বলে দাবি করে।

২) রিমিক্স (Remix) প্লেজিয়ারিজম : এই পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সবগুলিকে একত্রিত করে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে, তারপর এটিকে নিজের তৈরি করা বলে দাবি করে।

৩) হাইব্রিড (Hybrid) প্লেজিয়ারিজম: এই ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে উদ্ধৃত কোনো উৎস ডকুমেন্টকে উদ্ধৃতি ছাড়াই একটি নতুন ডকুমেন্ট হিসাবে অনুলিপি করে নতুনভাবে সাজানো হয়।

৪) রিসাইকেল (Recycle) প্লেজিয়ারিজম: এটি সঠিক উদ্ধৃতি ছাড়াই নিজের পূর্ববর্তী কোন কনটেন্ট বা ডকুমেন্ট থেকে ধার নেওয়া বা পুর্নব্যবহার করার কাজকে বোঝায়। Recycle প্লেজিয়ারিজমকে স্ব-চৌর্যবৃত্তি (self-plagiarism)ও বলা হয়।

৫) 404 Error প্লেজিয়ারিজম: এতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উৎস থেকে কনটেন্ট অনুলিপি করে একটি নথি তৈরি করে এবং উদ্ধৃতিসহ একক নথি হিসেবে প্রস্তুত করে। কিন্তু যদি উদ্ধৃতিসমূহ ভুল বা ভুয়া হয় এবং এগুলো অস্তিত্বহীনতার পরিচয় দেয় তাহলে এটিকে 404 Error প্লেজিয়ারিজম বলা হয়।

৬) Aggregator প্লেজিয়ারিজম: এই ক্ষেত্রে লিখিত কনটেন্ট বা ডকুমেন্টে যথাযথ সকল উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে কিন্তু এতে কোনো মূল কাজ থাকে না।

৭) রি-টুইট (Re-tweet) প্লেজিয়ারিজম: সঠিকভাবে উৎসসমূহ উদ্ধৃত করে লিখিত কনটেন্ট বা ডকুমেন্টটি নিখুঁত বলে প্রতীয়মান হওয়ার পরও যদি এটি অন্য কোন মূল-কনটেন্ট এর কাঠামো বা শব্দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে এটিকে বলা হয় রি-টুইট প্লেজিয়ারিজম।

প্লেজিয়ারিজম কারণসমূহ :

- বর্তমান যুগে কপি (Copy) এবং পেস্ট (Paste) ফাংশনের সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে অতি সহজে ইন্টারনেট হতে যেকোনো ব্যক্তি কোনো আর্টিকেল, লেখা বা তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুলিপি করে বা তা নিজের নামে প্রকাশ করা সহজ।
- প্লেজিয়ারিজম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, অর্থাৎ উৎস উল্লেখ না করে কারও লেখা ব্যবহার করলে সেটা যে সেই

প্রতারণা সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকা।

- ইন্টারনেটের বিপুল তথ্যভান্ডার থেকে কপি করে নিজের বলে প্রকাশ করলে কেউ বুঝতে বা জানতে পারবে না এরূপ আত্মবিশ্বাস থাকা।
- নিজে সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় না করে সহজে অন্যের তৈরি করা বিষয় ব্যবহারের প্রবণতা।

প্লেজিয়ারিজম শনাক্তকরণের উপায় :

আমাদের কনটেন্ট তৈরি ও গবেষণার কাজের মৌলিকত্ব নিশ্চিত করতে, একাডেমিক সততা বজায় রাখতে এবং চৌর্যবৃত্তির সাথে জড়িত থাকার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এড়াতে প্লেজিয়ারিজম চেক করা জরুরি (checker)। প্লেজিয়ারিজম চেক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- Grammarly, Plagium, Plagiarisma, Plagiarismchecker, Zerogpt, Quillbot, Quetext, Turnitin ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব সফটওয়্যার আমাদের কনটেন্টকে ইন্টারনেটে বিদ্যমান কনটেন্টের সাথে তুলনা করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনো মিল থাকলে তা শনাক্ত করতে সহায়তা করে এবং চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার আগে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার সুযোগ দেয়।

প্লেজিয়ারিজম এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলি:

- অন্যের কনটেন্ট অনুলিপি করায় লেখকের নিজস্ব চিন্তন দক্ষতা হ্রাস পায়।
- প্রকৃত লেখক তাঁর ন্যায্য স্বীকৃতি হতে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন।
- ব্যাপক প্লেজিয়ারিজমের ফলে নতুন চিন্তা-ধারণা সৃষ্টি ব্যাহত হয়।
- ইচ্ছাকৃতভাবে প্লেজিয়ারিজমের ফলে নৈতিক অবক্ষয় হয়।
- সময়, শ্রম ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

প্লেজিয়ারিজম প্রতিরোধের উপায়:

প্লেজিয়ারিজম একটি বেআইনী কাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে প্লেজিয়ারিজম প্রতিরোধে কঠোর নীতিমালা রয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে কপিরাইট আইনসহ প্লেজিয়ারিজম আইনও রয়েছে। বাংলাদেশে প্লেজারিজম আইন না থাকলেও কপিরাইট আইন আছে। এর আওতায় জনগণ আইনি সহায়তা পেতে পারেন। এছাড়া দেশের স্বাভাবিক আইনি ব্যবস্থায় একজন লেখক অথবা কোনও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চাইলেই সিভিল কোর্টে অভিযোগ দিয়ে মামলা দায়ের করতে পারেন। সেটা ছাড়াও ১৯০৮ সালের যে দেওয়ানি কার্যবিধি আছে সেই কার্যবিধি মৌলিক আইন হিসেবে কাজ করে। ফলে এই আইনের বিভিন্ন স্তরে যে বিধিবিধান আছে সেই বিধিতে প্লেজিয়ারিজমের ভিত্তিতে যে কেউ চাইলেই অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এছাড়া প্লেজিয়ারিজম সামগ্রিকভাবেও প্রতিরোধ করা উচিত। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্লেজিয়ারিজম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক ধারণা দিতে হবে। অন্যের লেখা সরাসরি অনুলিপি করা, উদ্ধৃতি ছাড়া প্যারাফ্রেজ করা এবং অন্যদের গবেষণার ফলাফল নিজের নামে ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি, এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

সাইবার আইন

সাইবার অপরাধ দমনে বিভিন্ন দেশেই আইন চালু আছে। আমাদের দেশে প্রণীত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬'-এর ৫৭(১) ধারা মতে, 'যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে যা মিথ্যা ও অশ্লীল, যার দ্বারা কারও মানহানি ঘটে বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়, আর এ ধরনের তথ্যগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে'। এছাড়া, পর্নগ্রাফি আইন-২০১২-তে বর্ণিত আছে, 'কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

২০১৮ সালে আমাদের দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়, যার আংশিক উল্লেখ করা হলো :

- কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোয় বেআইনি প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন, বিনষ্ট বা অকার্যকরের চেষ্টা কিংবা কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রাম ধ্বংস/পরিবর্তন বা অকার্যকর করতে পারবেন না।
- ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে পারবেন না, সেখান থেকে কোনো তথ্য বা উদ্ধৃতাংশ বা উপাত্তের অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কারো সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা, জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে প্রচার বা অপপ্রচার কিংবা এতে মদদ দিতে পারবেন না।
- রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য অপপ্রচার বা কার্যকলাপ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা জাতিগত ঘৃণা-উস্কানি বা বিভেদ/বিদ্বেষ সৃষ্টি করে কিংবা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় এরূপ কোনো কার্যক্রম ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে করা যাবে না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট, অপমান বা অপদস্থ করা কিংবা ভয়ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন করা যাবে না।
- ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে আর্থিক ক্ষতি বা তছরুপ কিংবা অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য চুরি, তথ্য পাচার করা যাবে না।

ডিজিটাল আইনের আওতায় উল্লিখিত কৃত অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি এবং আর্থিক দণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

তাই আমাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি সেক্টরের ন্যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনাকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সবধরনের অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা হতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

২০২৪-২০২৫

ভিন্ন ধরনের অপরাধ

অ্যান্টিট্রাস্ট : প্রযুক্তি মোড়লদের বিরুদ্ধে শুনানি

আমরা যখন সাইবার ক্রাইম নিয়ে কথা বলি তখন সবসময়ই ব্যক্তিগত অপরাধ কিংবা ছোটখাটো অপরাধী সংগঠনের অপরাধ নিয়ে কথা বলি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো অনেক বড় বড় অপরাধ করে শুধু দোষী সাব্যস্তই হয়নি, তার জন্য শাস্তিও ভোগ করেছে। ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য কেমব্রিজ এনালিটিকাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দিয়ে অনেক বড় অপরাধ করেছিল। হোয়াটসঅ্যাপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার জন্য তাদেরকে ১১০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ২০১৬ সালে অ্যাপেল কোম্পানিকে আয়ারল্যান্ডকে ১৪.৫ বিলিয়ন ইউরো ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইন ভঙ্গ করে অন্যান্য ছোট কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন করে বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য গুগলকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য জার্মানিতে আমাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। এরকম উদাহরণের কোনো শেষ নেই, এই বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর কাছে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ডেটা। যারা ডেটা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই একধরনের আশঙ্কা আছে যে পৃথিবীর মানুষের সচেতন না হলে পুরো পৃথিবী একসময় কয়েকটি দৈত্যাকৃতির সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে। সেটি যেন না হতে পারে সেজন্য সবার সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে।

১.৫ সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of ICT in Social Life)

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। পৃথিবীর মানুষ তথ্য প্রযুক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এখন একটি দিনও অতিবাহিত করতে পারে না। গত কয়েক বছরে আন্তযোগাযোগ এবং স্মার্ট অটোমেশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন এসেছে প্রযুক্তি, শিল্প, এমনকি সামাজিক রীতিনীতিতেও। এই পরিববর্তনকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 4th Industrial Revolution (4IR) বা Industry 4.0 দ্বারা। ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে World Economic Forum এর প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস সোয়ব (Klaus Schwab) এর দ্বারা ২০১৬ সালে। বর্তমানে আমরা 5IR/৫ম শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করেছি। এক কথায় মানুষের জীবনযাত্রার সর্বস্তরে এর একটি অভাবনীয় প্রভাব রয়েছে।

১.৫.১ তথ্য প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব

শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, প্রকাশনা, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজের সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। আইসিটির প্রভাবাধীন উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

শিক্ষাক্ষেত্রে : তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন, ফি ইত্যাদি পরিশোধ, ভর্তি, ফলাফল তৈরি ও প্রকাশ, রেজিস্ট্রেশন বা পরীক্ষার ফরম পূরণ, বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কাজে অত্যন্ত সহজ, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, দেশে অবস্থান করেও শিক্ষার্থীগণ বিশ্বসেরা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, পড়াশোনা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণেই।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাক্ষেত্রে : আমরা জানি, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ধারায় তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান উৎকর্ষে উন্নীত হয়েছে। ঠিক একইভাবে, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমেই কিন্তু বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অগ্রগতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে চলেছে। অন্যান্য সেক্টর তো রয়েছেই, শুধু চিকিৎসাক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সুফল বলে শেষ করা যাবে না। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবা দেয়া, ঘরে বসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানা, সর্বশেষ আবিষ্কৃত ওষুধ সংগ্রহ ও ব্যবহারে সক্ষমতা এনে দিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : ব্যাংকে অর্থ জমা-উত্তোলন, ক্লিয়ারিং হাউস বা আন্তঃব্যাংক লেনদেন, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান, স্মার্ট কার্ড ব্যবহারে এটিএম বুথের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিল গ্রহণ, দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ অনুমোদন, ঋণের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, সুদের হার নির্ণয়, মেয়াদ নির্ধারণ, শেয়ার কেনা-বেচা ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজকাল অতি সহজেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মোট কথা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকসেবায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা প্রশ্নাতীত।

অফিস-আদালতে : আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রায় সবধরনের প্রতিষ্ঠানের অফিস ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ একটি অনিবার্য বিষয়। প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি, কর্মী ব্যবস্থাপনা, টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম, কমিশন, বেতন-ভাতা নির্ধারণ থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ-বিতরণে টেলিফোন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার হয়ে আসছে। তাছাড়া, বিচারিক কার্যক্রমেও একজন বিচারপ্রার্থী অনলাইনে মামলা দায়েরসহ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সেখানে উপস্থাপন করতে পারছেন, যার ফলে বিচার প্রক্রিয়াতেও গতিশীলতা বেড়েছে অনেকাংশে।

শিল্পক্ষেত্রে : বিশ্ববাজার অনুসন্ধানের মাধ্যমে কলকারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্যের ডিজাইন, উৎপাদন ও মাননিয়ন্ত্রণে উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিবেশে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র রোবটের ব্যবহার, জীবাণুমুক্ত খাদ্যপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, মজুদ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাসাধারণের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন, অনলাইনে অর্ডার গ্রহণ, পণ্য সরবরাহ, বিশ্ববাজার অর্থনীতির সাথে ভারসাম্য রক্ষা, বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতায় প্রবেশ, প্রাধান্য বিস্তার ইত্যাদি শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশের কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে বহু পূর্বেই। জমির ধরন, মাটির গুণগতমান, স্থানীয় আবহাওয়ার ধরন, শস্যবীজ প্রাপ্তি, দেশি বা বিশ্ববাজারে চাহিদানুযায়ী সকল তথ্য জেনে লাভজনক শস্য নির্বাচন সম্ভব তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। বীজ বপনের সময় নির্ধারণ ও তার পদ্ধতি, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কৌশল, জমি তৈরির প্রক্রিয়া, পোকামাকড় আক্রমণের ধরন, পোকার প্রকৃতি নির্ণয় ও নিধন, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সম্ভব হচ্ছে।

চিত্র 1.17 : কৃষি সংক্রান্ত a2i এর সহায়তায় নির্মিত একটি ওয়েবসাইট

যোগাযোগ ব্যবস্থায় : আজকাল তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। ব্যক্তিগত তথ্য যোগাযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের গণপরিবহন পর্যন্ত সর্বস্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স, টেলিকমিউনিকেশন, ওয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে : তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্বে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বিনোদনের নব নব মাত্রা সংযুক্তি মানব জীবনকে আয়েশি করে তুলেছে। সেই সাথে যুগোপযোগী ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তদনুযায়ী দেশীয় সংস্কৃতির মূলধারার পাশাপাশি এর মানোন্নয়নও ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

১.৫.২ তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

আসক্তি : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ ব্যবহারের ফলে পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতিবাচক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন— ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহারের তীব্র আসক্তির ক্ষতিকারক প্রভাব আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে অল্পবয়সি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় অমনোযোগী, নৈতিক-অনৈতিকতার তফাত শনাক্ত করতে না পারা, শৃঙ্খাচারে অনীহাসহ নানা অসামাজিকতায় লিপ্ততা তাদের পেয়ে বসছে। অভিভাবকগণও এর আসক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না; যার দরুন কর্মক্ষেত্রে শ্রমঘণ্টা নষ্ট, অনৈতিক কার্যকলাপে অর্থহীনভাবে সময়ক্ষেপণ, স্বাভাবিক পারিবারিক নিয়মাচারে ব্যত্যয়, সন্তানদের সময় না দেয়া বা তাদের প্রতি যত্নবান না হওয়ায় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম হচ্ছে। অনলাইনে গেমসের আসক্তি আরো ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে সামাজিক জীবনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতে কালক্ষেপণ মাদকাসক্তির মতো ভয়ংকর নেশাগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিরাট অংশ। এসব গেমসের জন্য নিজের সন্তান বিক্রির মতো চরম অনৈতিক ঘটনাও সংঘটনের খবর পাওয়া গেছে। অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে ব্যবহারকারীদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মতো ঘটনাও বিভিন্ন দেশে ঘটেছে। জনৈক রাশিয়ান নাগরিকের সৃষ্ট গেমসের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়ে আত্মহত্যা বা অকাল মৃত্যুর খবর আমরা সবাই অবগত আছি। এছাড়া বিদেশি সংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব তো রয়েছেই। ইদানীং প্রতিটি দেশের চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত মারামারি, হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ভায়োলেন্স অনুকরণ করে

উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদেরকে সহিংস করে তুলছে। এসবের ফলে আচার-আচরণ, মানসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছদে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয় মাত্রায় বাড়তে দেখা যাচ্ছে। অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারে কুরুচিপূর্ণ ছবি বা ভিডিও এখন স্বল্পমূল্যের মোবাইল ফোনেও দৃশ্যমান।

অপরাধ : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র আসক্তির কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোরসহ সমাজের এক বৃহদংশ বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। মতলববাজ হ্যাকাররা নানা কৌশলে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য চুরি/পাচার, সাইবার হামলা, নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্ম দিতে পারে।

স্বাস্থ্যগত সমস্যা : তথ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিশেষত কম্পিউটারের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে চোখের উপর চাপ পড়ে, মাথা ব্যথা, হাত ব্যথা, ঘাড় ও পিঠের সমস্যায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় অনেককেই। রাত জেগে মোবাইল ফোন ব্যবহার, কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে সময় কাটানোর কারণে স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের নানাবিধ অসুস্থতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সার্জারির চাকুর ব্যবহার যথাযথভাবে না করে খুন-খারাবির কাজের অপব্যবহার রোধ করার দায়িত্ব সার্জারি-চাকুর নয়, এই দায়িত্ব আমাদের সবার। একইভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে আরো অনন্যমাত্রায় অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে।

১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ICT & Economic Development)

তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতিতে নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়ায় মানুষের জীবন আরও বেগবান, সহজ, নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে। সেইসাথে অবাধ তথ্য প্রবাহের জন্য পুরো পৃথিবীকেই একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। আজকের বিশ্বে কম্পিউটার, সাবমেরিন ক্যাবল এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ নিজেদের মতো করে তথ্য প্রবাহের মহাসড়কে প্রবেশ করে চলেছে। এর সূত্র ধরে অর্থনীতিবিদগণ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন খরচ অনেক কম হওয়ায়, আইসিটির উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

১.৬.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, এদের সমৃদ্ধির পেছনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই খাতে প্রচুর বিনিয়োগ বেড়েছে, মূলধন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বহুগুণ।

কাজের সুযোগ : আইসিটির ক্রমবিকাশের ফলে নতুন অনেক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বিনিয়োগ : আইসিটির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিই আইসিটি খাতে বিনিয়োগের প্রধান কারণ। আইসিটির ব্যবহারে আর্থিক লেনদেন সহজ এবং দ্রুততর হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা কম সময়ে বিনিয়োগ করছেন এবং এই বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্রুত সংগ্রহ করতে পারছেন।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : বর্তমানে আইসিটি ব্যবহারে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করানো যাচ্ছে। ফলে কর্মী প্রতি ব্যয় কমেছে, বিনিয়োগ কম করতে হচ্ছে, কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে; যার ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : আইসিটির কল্যাণে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক দ্রুততর এবং সহজতর হওয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এসেছে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পরিবেশ সংরক্ষণ : পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে; যা একইসাথে পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসার : আইসিটির কল্যাণে প্রথাগত ব্যবসার বাইরে ই-কমার্স ও এম-কমার্সের প্রচলন ঘটেছে। প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশে প্রচলিত নানারকম ক্ষুদ্র ব্যবসা করা হচ্ছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.৬.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশে প্রচলিত ই-সেবাসমূহ :

ই-ব্যাংকিং : ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বা ই-ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো বর্তমানে অনলাইনে ও এটিএম বুথের মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা দিতে পারছে। ফলে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠানো অনেক সহজ ও দ্রুততর হয়েছে।

ই-কমার্স : ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন অ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ঘরে বা যেকোনো জায়গায় বসে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে নানা ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনসহ সব কার্যক্রম ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব। এভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে।

ই-কৃষি : ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকগণ জানতে পারছেন। ফলে কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকগণ সচেতন হচ্ছেন, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

ই-গভর্নেন্স : সরকারি কার্যক্রমে ও প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকগণ সহজে, দ্রুততম সময়ে এবং স্বল্পব্যয়ে ২৪ ঘণ্টা সরকারি সেবা পেতে পারেন। ই-গভর্নেন্সের বাস্তবায়ন প্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ করে, ফলে জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ই-পর্চা সেবা : অনলাইন হতে জমি সংক্রান্ত তথ্য, জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করার সিস্টেমই হলো ই-পর্চা। আগে জমি বা ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের তথ্য জমির রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হতো, যা সময়সাপেক্ষ এবং তুলনামূলক ব্যয়বহুল ছিল। এই গতানুগতিক পদ্ধতি আর ভোগান্তি কমানোর জন্য বর্তমানে চালু হয়েছে ই-পর্চা সেবা। ফলে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইন হতে স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহ করা যায়।

১.৬.৩ বাংলাদেশের উন্নয়নে আইসিটি : ডিজিটাল বাংলাদেশ

বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এখন 'উদীয়মান নক্ষত্র' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নের সূচকে পৃথিবীর 'পরবর্তী এগারোটি' দেশের একটি দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, থ্রি ডি প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও অন্যান্য প্রযুক্তি মিলেই এ বিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে ফলপ্রসু করতে আইসিটির কোনো বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির সাথে একাত্ম হতে বিভিন্ন উদ্যোগ আর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

২০২৪-২০২৫

মেইড ইন বাংলাদেশ : আমদানি কমিয়ে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে গাজীপুরের চন্দ্রায় হাইটেক ও মাইক্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কে চালু হয়েছে দেশের প্রথম কম্পিউটার উৎপাদন কারখানা। ইতোমধ্যে এই কারখানায় তৈরি ল্যাপটপ মেইড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ যুক্ত হয়ে আফ্রিকায় রপ্তানিও শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপোতে দেশে তৈরি রোবট ও স্টার্টআপগুলো তাদের উদ্ভাবন প্রদর্শন করে।

জাতীয় ডেটা সেন্টার : বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ফোর টায়ার জাতীয় ডেটা সেন্টারটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে উন্নীত করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষায়িত ল্যাব এবং একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

আইটি পার্ক : তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি খাতের একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। অপরদিকে বিপুল সংখ্যক কর্মীর কর্মসংস্থানের হাতছানি দিচ্ছে যশোরে গড়ে ওঠা শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চট্টগ্রামে চুয়েট আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন কার্যক্রমসহ আইটি শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্টার্টআপ কালচার : বাংলাদেশে প্রযুক্তিখাতের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ বা স্টার্টআপের সম্ভাবনা বিপুল। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টার্টআপ চালু হয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি সরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ। ইতোমধ্যে শতাধিক স্টার্টআপ কোম্পানিকে অনুদানও দেওয়া হয়েছে।

ক্যাশলেস বাংলাদেশ : ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক QR কোড ভিত্তিক দ্রুতগতির সর্বজনীন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। এ ক্যাশলেস লেনদেনব্যবস্থা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। QR কোড কেবল একটি প্রিন্টেড ছবি হওয়ায় এই পরিশোধ ব্যবস্থায় মার্চেন্টের অংশগ্রহণে খরচ নেই। সচেতন ও সুচারুভাবে ক্যাশলেস লেনদেন সিস্টেম চালু হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : অবকাঠামো উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য বাংলাগভর্নেট ও ইনফো সরকার-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলার সরকারি অফিসসমূহ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি অফিসসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ডিজিটাল ল্যাব, অ্যাগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও টেলিমেডিসিন সেন্টারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কক্ষ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিশ্বগ্রামের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?

ক. তথ্য খ. সফটওয়্যার
গ. হার্ডওয়্যার ঘ. কানেক্টিভিটি

২. DNA- এর নতুন সিকুয়েন্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ন্যানো টেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বায়োম্যাট্রিক্স

৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কত মাত্রার ইমেজ ব্যবহার করা হয়?

ক. একমাত্রিক খ. দ্বি-মাত্রিক
গ. ত্রি-মাত্রিক ঘ. বহুমাত্রিক

৪. রোবট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

ক. প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে খ. মানুষের বিকল্প হিসাবে বিপজ্জনক কাজে
গ. মানুষের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে ঘ. স্বাধীনভাবে জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে

৫. টেলি প্রেজেন্স এর প্রয়োগ ক্ষেত্র কোনটি?

ক. ক্রায়োসার্জারি খ. বায়োম্যাট্রিক্স
গ. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

৬. বায়োম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়–

i. বাড়ির নিরাপত্তায়
ii. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নির্ণয় করতে
iii. অপরাধ প্রবণতা শনাক্তকরণে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

চার বন্ধু চারটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এদের অফিসের প্রবেশ পথে কাউকে হাতের আঙুল, কাউকে সম্পূর্ণ হাত একটি যন্ত্রের ওপর রেখে অফিসে ঢুকতে হয়। কাউকে একটি ক্যামেরার সামনে চোখ স্থির করে দাঁড়াতে হয় কিংবা সম্পূর্ণ মুখমন্ডলই ক্যামেরার সামনে কয়েক মুহূর্ত রাখতে হয়। এদের প্রত্যেকের দাবি, অফিসের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্ব-স্ব অফিসে ব্যবহৃত পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

২০১৪-২০১৫

৭. উদ্দীপকে অফিসের প্রবেশ পথে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. বায়োম্যাট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি

৮. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে বেশি নির্ভুলভাবে কাজ করে কোনটি?
ক. ফিঙ্গারপ্রিন্ট খ. হ্যান্ড জিওমেট্রি
গ. আইরিশ ও রেটিনা স্ক্যান ঘ. ফেস রিকগনিশন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

উচ্চ ফলনশীল ধান গবেষণায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করায় দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে।

৯. উদ্দীপকের নতুন প্রযুক্তি কোনটি?
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োম্যাট্রিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি

১০. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডে–
i. ভূমির উর্বরতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রযুক্তির এই যুগে শওকত এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঘরে বসেই ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আবার তার বাবা অন্য একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জাতের ফুল চাষ করছেন।

১১. শওকতের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি–
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. ই-লার্নিং
গ. ই-কমার্স ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

১২. উদ্দীপকে শওকতের বাবার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির সীমাবদ্ধতা হলো এর ফলে –
i. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তি হতে পারে
ii. ফলন কমে যেতে পারে
iii. নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে
নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিপ্লবী ও কেয়া দুইজনই উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করে। তাদের আইসিটি শিক্ষক "বিশ্বের পরিচ্ছন্ন শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি ঢাকায় ব্যবহার" বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে দিলেন। বিপ্লবী কলেজ লাইব্রেরি এবং অন্যান্য লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করল। অ্যাসাইনমেন্টে সে তথ্যসূত্র উল্লেখ করল। কেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র ভাইয়ের অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টারনেট থেকে নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করে জমা দিল। কেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট দেখে আইসিটি শিক্ষকের বুঝতে অসুবিধা হলো না— এটি কপি করা।

ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী?
খ. 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মৌলিক গবেষণা সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা কর।
গ. বিপ্লবী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন অবদান ব্যবহার করেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনায় বিপ্লবী এবং কেয়ার কাজের বৈসাদৃশ্য মূল্যায়ন কর।

২. ইমা তার বাসায় আনা নতুন টিভিতে একটি সিনেমা দেখল। সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করলে নিজেকে সিনেমার অংশ মনে হয়। সে খুবই আনন্দিত হলো। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিভি এবং সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। ইমা তার এই আনন্দ অনুভূতি তার Facebook account এর মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করল।

ক. রোবোটিক্স কী?
খ. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বন্ধুদের সাথে ইমার আনন্দ-অনুভূতি শেয়ার 'বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট'— এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৩. গবেষক ড. হাসিব সকালে তাঁর ল্যাবে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজা খুলতে পারছেন না। কারণ গতকাল তিনি তার হাতের একটি আঙ্গুল কেটে যাওয়ায় ব্যান্ডেজ করে রেখেছেন। ফলে তাঁকে সহকর্মী শাফায়াত না আসা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে হলো। এতে বিরক্ত হয়ে তিনি ল্যাবের দরজা খোলার জন্য পাসওয়ার্ডযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী?
খ. বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে — ব্যাখ্যা কর।
গ. ল্যাবে কোন প্রযুক্তির ব্যবহার করে ড. হাসিব দরজা খুলে থাকেন — ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ড. হাসিব কর্তৃপক্ষকে যে প্রস্তাব দিলেন, তা কি যৌক্তিক — বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং
Communication Systems and Networking

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন

এটি মোটেও অতিশয়োক্তি নয় যে বর্তমান পৃথিবীর মানুষ পারিবারিক বন্ধনের মতো একটি বিস্ময়কর মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। একসময় সকলের অগোচরে পৃথিবীর কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মনুষ্যত্বের উপর চরম অবমাননা ঘটে যাওয়া সম্ভব হতো। এখন সেটি আর সম্ভব হয় না। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ এখনো পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু সেটি কমানো সম্ভব হয়েছে, তার প্রধান কারণ তথ্য প্রযুক্তি। এখন কোনো দেশই বিশ্ব-বিবেকের কাছে জবাবদিহি না করে একটি অন্যায় যুদ্ধ শুরু করতে পারে না, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না। নেটওয়ার্কিংয়ের কারণে পুরো পৃথিবী এখন একটি বড় পরিবারের মতো, এখানে সবাই সবার সাথে যুক্ত হয়ে বসবাস করে। এই নেটওয়ার্কিংকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একসাথে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের সামনে সেই প্রযুক্তিগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে;
- ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে;
- ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে;
- ডেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;
- বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)

২.১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (Concept of Communication System)

যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন একটি সহজাত প্রক্রিয়া। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখিরাও নিজেদের মতো করে নিজেরা যোগাযোগ করে। মানব সভ্যতার উন্মেষের আগে থেকেই নানা ধরনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একজন মানুষ অন্যজনের সাথে নানা পদ্ধতিতে যোগাযোগ করেছে। এজন্য প্রথমে অংগভংগি বা আকার ইংগিত, পরবর্তীকালে নিজেদের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে। সভ্যতার উন্মেষের পর এর ধারাবাহিকতায় দূরবর্তী কারো সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যক্তির মাধ্যমে চিঠি পাঠানো এবং পরবর্তীকালে ডাকবিভাগ, ট্রাঙ্ক কল, টেলিগ্রাফ কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রেডিও, টিভি ইত্যাদিও এক ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বা মাধ্যম, যার মাধ্যমে একজন উপস্থাপক বা সংবাদ পাঠক অসংখ্য দর্শক-শ্রোতার কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে। এধরনের ভাবের আদান প্রদান বা তথ্য বিনিময়ের জন্য যখন একজন অন্যজনের সাথে যোগাযোগ করে থাকে সেই প্রক্রিয়াটাই কমিউনিকেশন সিস্টেম বা যোগাযোগ পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট, বা মোবাইল ফোনের উদ্ভাবনের পর যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পরিধি আরো ব্যাপক, সুবিশাল এবং সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, এখন শুধু মানুষের সাথে মানুষ নয়, যন্ত্রের সাথে যন্ত্রেরও যোগাযোগ হতে শুরু করেছে।

আমরা বলতে পারি কমিউনিকেশন (Communication) বা যোগাযোগ কতকগুলো উপাদানের সুসমন্বয়ে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান- প্রদানের একটি প্রক্রিয়া। এটি প্রেরক, প্রাপক, যোগাযোগ-মাধ্যম এবং কিছু যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মৌখিক কিংবা অন্য যেকোনো ধরনের তথ্য বা বার্তা আদান—প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.১.২ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা (Concept of Data Communication)

কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ হলো তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দুটি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ বা লিংক স্থাপনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রেরণকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে ডেটা আদান-প্রদানের একটি ব্যবস্থা। 2.1 চিত্রে একটি ইলেকট্রনিক ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির গঠন দেখানো হয়েছে।

চিত্র 2.1: ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন অংশ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে উৎস হতে শব্দ, প্রতীক, তরঙ্গ, ছবি ইত্যাদি একটি মাধ্যম হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে। এ প্রক্রিয়ায় একটি ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্র এবং একটি রিসিভার বা গ্রাহক যন্ত্র প্রয়োজন হয়। উৎস বা সোর্স হতে প্রাপ্ত ডেটাকে ইনপুট ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে ইলেকট্রিক সংকেততে (আলোক সংকেতও হতে পারে) রূপান্তর করে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মিডিয়ামে (তারযুক্ত

বা তারবিহীন) পাঠায়। এরপর মিডিয়াম হতে রিসিভার ইলেকট্রিক সংকেতকে আউটপুট ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে পুনরায় রূপান্তর করে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেয়। এখানে প্রাপ্ত ডেটা উৎস ডেটার ন্যায় হয়ে থাকে। উল্লেখ থাকে, উৎস হতে গন্তব্যে ডেটা প্রেরণের সময় মিডিয়ামে নয়েজ (বিক্ষিপ্তভাবে অপ্রত্যাশিত ইলেকট্রিক সংকেত) যুক্ত হতে পারে, যা সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে।

ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর উদাহরণ:

১. উৎস বা সোর্স (তথ্য উৎস ও ইনপুট ট্রান্সডিউসার)- মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, কিবোর্ড ইত্যাদি।

২. ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্র- বেতার কেন্দ্র, টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, মডেম, রাউটার ইত্যাদি।

৩. মিডিয়াম বা মাধ্যম- টেলিফোন/ফাইবার অপটিক ক্যাবল, রেডিও/মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।

৪. রিসিভার বা গ্রাহক যন্ত্র- টেলিফোন একচেঞ্জ, মডেম, রাউটার ইত্যাদি।

৫. গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন (আউটপুট ট্রান্সডিউসার ও তথ্য গন্তব্য)- লাউড স্পিকার, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

২.১.৩ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

বর্তমান বিশ্বে আমাদের সবারই কম-বেশি ইন্টারনেট এবং তার গতি বা স্পিড সম্পর্কে একটি ধারণা আছে। এই 'ইন্টারনেট' -এর গতি বা স্পিড তার ব্যান্ডউইথের উপর নির্ভরশীল। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে অর্থাৎ ডেটা স্থানান্তরের হারকে ব্যান্ডউইথ বলে। ব্যান্ডউইথ সাধারণত bit per second (bps) -এ হিসাব করা হয়। তবে ইদানীং নেটওয়ার্কে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায় বলে বিপিএস (bps) - এর পরিবর্তে কেবিপিএস (kbps: প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার বিট) বা এমবিপিএস (Mbps: প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন বিট) এমনকি জিবিপিএস (Gbps: প্রতি সেকেন্ডে এক বিলিয়ন বিট) অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। আট বিটকে এক বাইট বলা হয় বলে এক MBps বলতে আট Mbps বোঝানো হয়।

একটি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সেখানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং মিডিয়ামের উপর নির্ভর করে। যেমন মিডিয়াম হিসেবে সাধারণ টেলিফোনের তার ব্যবহার করলে যত ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়, ফাইবার অপটিক ক্যাবলে তার থেকে অনেক গুণ বেশি পাওয়া যায়। আবার ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে যদি যথাযথ স্পিডের টারমিনাল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা না হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ পাওয়া সম্ভব হয় না।

একটি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক যেহেতু অনেকে ব্যবহার করে তাই নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সকল ব্যবহারকারীর মাঝে ভাগ হয়ে যায়। অনেক সময় একজন ব্যবহারকারী কিংবা একটি সার্ভিস ব্যান্ডউইথের একটা বড় অংশ দখল করে অন্যদের শেয়ার কমিয়ে দেয়। একটি নেটওয়ার্কে একজন ব্যবহারকারী কতটুকু প্রকৃত ব্যান্ডউইথ পাচ্ছে সেটি মাপার নানা ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, নেটওয়ার্কের ডিজাইনে কিংবা যন্ত্রপাতিতে কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো বের করা সম্ভব। সে কারণে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট বর্তমান সময়ে অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

২.১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)

ডেটা কমিউনিকেশনে এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ডেটা বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলে।

বিটের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন এবং সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন এই দুভাবে ভাগ করা হয়েছে। সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনে একটি মাধ্যম দিয়ে একবারে একটি বিট পাঠানো হয়। প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনে অনেকগুলো মাধ্যম দিয়ে একবারে একসাথে অনেক বিট পাঠানো হয়।

প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন

প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনে একসাথে ডেটা ট্রান্সমিশন করার জন্য অনেক ডেটা লাইনের সাথে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র পরস্পরের সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি বা দুইটি কন্ট্রোল লাইনও থাকে। বিটগুলো ঠিক একই সময়ে একই সাথে স্থানান্তরিত হয়। কম্পিউটারের ভেতরের সার্কিটে যেহেতু ডেটাগুলো প্যারালাল পদ্ধতিতে কাজ করে সেজন্য প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনই তার স্বাভাবিক বিন্যাস। একসাথে অসংখ্য লাইনে ডেটা পাঠানো হয় বলে এটি অনেক দ্রুতগতির ট্রান্সমিশন। তবে অনেক দূরে ডেটা পাঠাতে হলে এটি বাস্তবসম্মত নয়। দ্রুতগতিসম্পন্ন এই পদ্ধতি অনেক সময় ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, প্যারালাল প্রিন্টার পোর্ট ও ক্যাবল ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের সংযোগ ইত্যাদি এর উদাহরণ।

প্রেরক
গ্রাহক
প্যারালাল
প্রেরক
সিরিয়াল
গ্রাহক
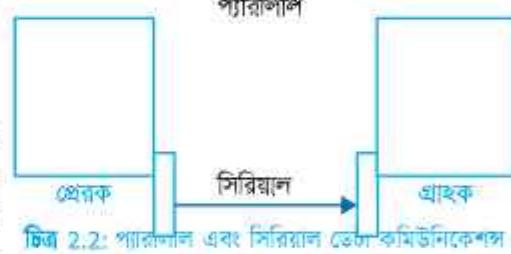
চিত্র 2.2: প্যারালাল এবং সিরিয়াল ডেটা কমিউনিকেশন্স

সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন

এই ট্রান্সমিশনে যেকোনো দূরত্বে অবস্থিত প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এক বিটের পর অপর একটি বিট স্থানান্তরিত করা হয়। এটি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, কেননা এতে পূর্ববর্তী ডেটা বিট প্রেরণের পর অপরটি প্রেরিত হয়। একটি মাত্র তার ব্যবহার হয় বলে যন্ত্রপাতি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সাশ্রয়ী। পাশাপাশি অনেক তার নেই বলে নিজেদের ভেতর নয়েজের প্রভাব কম। কম্পিউটার এবং প্রায় সকল ডিভাইসে আজকাল যে ইউএসবি (USB: Universal Serial Bus) পোর্ট দেখা যায় সেটি সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের উদাহরণ।

প্রেরক যে সময় ডেটা প্রেরণ করবে, গ্রাহক ঠিক একই সময় ডেটা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহকের ক্লক একই রকম থাকতে হয়। এজন্য সিরিয়াল পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের সময় প্রেরক এবং গ্রাহক দুটি ডিভাইসকেই ক্লক ব্যবহার করতে হয়। ক্লকের প্রতি পালসে একটি করে বিট প্রেরণ এবং গ্রহণ করা হয়। ক্লক পালস্ বলতে একটি ক্লক সংকেতের সক্রিয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। এই ক্লক ব্যবহার করে বিটের শুরু ও শেষ বোঝার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যাকে বিট সিনক্রোনাইজেশন বলে। বিট সিনক্রোনাইজেশনের কারণেই প্রাপক সিগন্যাল থেকে ডেটা শনাক্ত এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বিট সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

চিত্র ২.৩: তিন ধরনের সিরিয়াল ডেটা কমিউনিকেশন

১. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission) ও
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা ক্যারেক্টার (বর্ণ, সংখ্যা বা চিহ্ন) ফরম্যাটে হয়ে থাকে। প্রতিবারে একটি করে ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করে। প্রতিটি ক্যারেক্টার আট বিটের হয়ে থাকে। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রেরক যখন খুশি তখন ডেটা প্রেরণ করতে পারে, গ্রাহক সবসময়েই সেই ডেটা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। শুধু তাই নয় একবার ডেটা পাঠিয়ে তার পরবর্তী সময় আরেকবার ডেটা পাঠানোর মাঝখানে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ সময় নেয়া যায়। ডেটা পাঠানোর আগে একটি স্টার্ট বিট পাঠানো হয় এবং সেই বিটটি দেখে গ্রাহকযন্ত্র বুঝতে পারে ডেটা আসতে শুরু করেছে এবং তার ক্লক সেই বিটের শুরুর সাথে সমন্বয় করে নেয়। ডেটা পাঠানো শেষ হওয়ার পর একটি বা দুইটি স্টপ বিট পাঠানো হয় এবং সেটি দেখে গ্রাহক যন্ত্র বুঝতে পারে ডেটা পাঠানো শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে ডেটার প্রতি ক্যারেক্টারের মাঝে বিরতির সময় সমান নাও হতে পারে। যখন প্রয়োজন তখন ডেটা প্রেরণ করা যায় বলে সেই ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের (কম্পিউটারে ব্যবহৃত RAM, Cache, or CPU memory ইত্যাদি) প্রয়োজন হয় না। ধীর গতিতে অল্প পরিমাণ ডেটা পাঠানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের একটি উদাহরণ হচ্ছে কম্পিউটারের কি-বোর্ড। এখানে একটি কি (Key) চাপার পর পরবর্তী কি চেপে টাইপ করার মধ্যবর্তী সময়সীমা অসম বা অনির্ধারিত হতে বাধ্য। এজন্যই এই ট্রান্সমিশন পদ্ধতির নাম অ্যাসিনক্রোনাস রাখা হয়েছে।
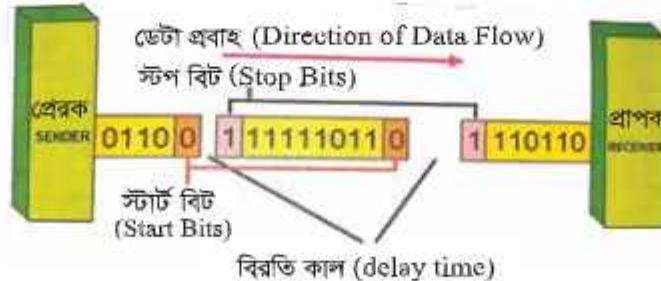
সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে বলা যায় বিরতিহীন ডেটা ট্রান্সমিশন। এই পদ্ধতিতে বিরতিহীনভাবে প্রেরক যন্ত্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রে ডেটা পাঠানো হয়। যেহেতু প্রেরিত ডেটা ব্যবহার করে গ্রাহক যন্ত্র তার ক্লককে সমন্বিত

করে তাই প্রেরণ করার জন্য কোনো ডেটা না থাকলেও আইডল সিকোয়েন্স (idle sequence) হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত ডেটা পাঠানো হয়।

সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরক-স্টেশনে প্রথমেই ডেটাকে প্রাইমারি স্টোরেজে (কম্পিউটারে ব্যবহৃত RAM, Cache, or CPU memory ইত্যাদি) সংরক্ষণ করে ডেটার ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে ভাগ করে নেয়। প্রতিবার একটি করে ব্লক বা ফ্রেম ক্লকের সাথে সমন্বয় করে সমান বিরতি দিয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি ব্লক-ডেটার শুরুতে 1 বা 2 বাইটের একটি হেডার ইনফরমেশন এবং ব্লক-ডেটার শেষে একই পরিমাপের একটি ট্রেইলার ইনফরমেশন সিগন্যাল পাঠানো হয় এবং বিশাল নেটওয়ার্কে গন্তব্য খুঁজে বের করার জন্য এর মাঝে সাধারণত প্রেরক ও গ্রাহককে চিহ্নিতকরণের সংখ্যা বা অ্যাড্রেস দেয়া থাকে। গ্রাহক যন্ত্র এই হেডার সিগন্যাল ব্যবহার করে প্রেরকের ক্লক-স্পিডের সাথে সিনক্রোনাইজ বা সমন্বিত করে। ট্রেইলার ব্লকের শেষ নির্দেশ করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্লকের ভেতরকার ভুল নির্ণয় এবং সংশোধনে সহায়তা করে।

প্রযুক্তিগতভাবে এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং ব্যয়বহুল হলেও বেশি ব্যান্ডউইথের ডেটা দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাই বড় ধরনের নেটওয়ার্কসহ মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক, টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।
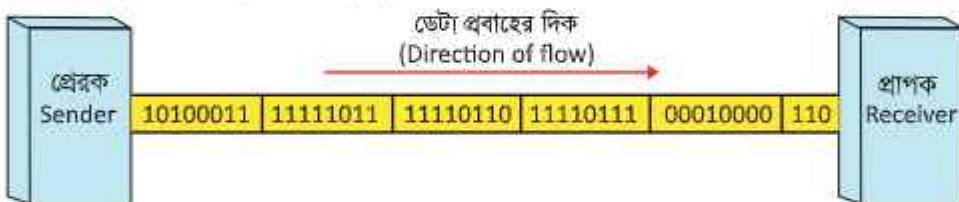
আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস -এর একটি মিশ্র পদ্ধতি হচ্ছে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন। এ প্রক্রিয়ায় অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতির স্টার্ট ও স্টপ বিটের মাঝখানে সিনক্রোনাস পদ্ধতিতে ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সফার করা হয়। যেহেতু পুরোটা সিনক্রোনাস নয়, তাই স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই যখন প্রয়োজন তখন সেই ডেটা ট্রান্সমিট করা যায়। সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে এর প্রচলন বেশি। বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন, অডিও বা ভিডিও কলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

২.১.৫ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশককে ডেটা ট্রান্সমিশন বা ডেটা কমিউনিকেশন মোড বলে। ডেটা প্রবাহের দিক -এর উপর নির্ভর করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

সিমপ্লেক্স মোড (Simplex mode) : এই পদ্ধতিতে শুধু একদিকে ডেটা পাঠানো সম্ভব হয়, প্রেরক শুধু ডেটা প্রেরণ করে এবং গ্রাহক শুধু ডেটা গ্রহণ করে। কি বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক সিমপ্লেক্স মোডের উদাহরণ।

চিত্র 2.4: সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স

হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-duplex mode) : এই পদ্ধতিতে দুইদিকেই ডেটা পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু একসাথে নয়, আলাদা আলাদাভাবে। একটি ডিভাইস ডেটা পাঠালে অন্যটিকে অপেক্ষা করতে হয় তার সুযোগ আসার জন্য। এই পদ্ধতিতে ডেটার ভেতর সংঘর্ষ (collision) না হওয়ার জন্য বিশেষ সার্কিটের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, এস.এম.এস ইত্যাদি হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে চলে।

ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-duplex mode) : ফুল-ডুপ্লেক্স মোডে একই সময়ে উভয় প্রান্তের দুটি ডিভাইস একই সাথে ডেটা প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারে। টেলিফোন, মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন এই পদ্ধতির উদাহরণ।

ডেটা বিতরণ বা ডেলিভারি মোড (Data distribution mode)

প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডেটা বিতরণ বা ডেলিভারি মোড ভিন্ন ভিন্ন মোডে হতে পারে। যেমন :

ইউনিকাস্ট (Unicast mode) : এই ব্যবস্থায় একটি প্রেরকের কাছ থেকে শুধু একটি গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারবে। ইউনিকাস্ট মোড সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স হতে পারে। ফ্যাক্স, মোবাইল, টেলিফোন, খেলনা, ওয়াকিটকি, সিঙ্গেল এসএমএস ইত্যাদি ইউনিকাস্ট মোডের উদাহরণ।

চিত্র 2.5: ইউনিকাস্ট, ব্রডকাস্ট এবং মাল্টিকাস্ট

ব্রডকাস্ট (Broadcast mode) : এ পদ্ধতিতে শুধু একজন প্রেরক থাকে, কিন্তু ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের আওতাধীন সব গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারে। ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন শুধু সিমপ্লেক্স হয়ে থাকে। রেডিও, টেলিভিশন ব্রডকাস্ট মোডের উদাহরণ।

মাল্টিকাস্ট (Multicast mode) : মাল্টিকাস্ট মোড অনেকটা ব্রডকাস্ট মোডের মতো হলেও এই মোডে নেটওয়ার্কের একটি প্রেরক হতে ডেটা প্রেরণ করলে তা শুধু অনুমোদিত সদস্যরা গ্রহণ করতে পারে। মাল্টিকাস্ট ট্রান্সমিশন হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স-এ হয়ে থাকে। ভিডিও কনফারেন্সিং, চ্যাটিং, গ্রুপ SMS ইত্যাদি মাল্টিকাস্ট মোডের উদাহরণ।

২.২ ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Medium of Data Communication)

ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত যে সব সংযোগ স্থাপন করা হয় তাদেরকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। অথবা উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যার মধ্য দিয়ে তথ্য প্রবাহিত হয় তা-ই ডেটা কমিউনিকেশন চ্যানেল বা মাধ্যম। এই চ্যানেল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম বা মিডিয়া থাকে। রেডিও, টিভি, ডিশ চ্যানেল ইত্যাদি গ্রাহক পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তারযুক্ত বা তারবিহীন যে সংযোগ প্রদান করা হয়, তা হলো মাধ্যম বা মিডিয়া। ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যম 2.6 চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।
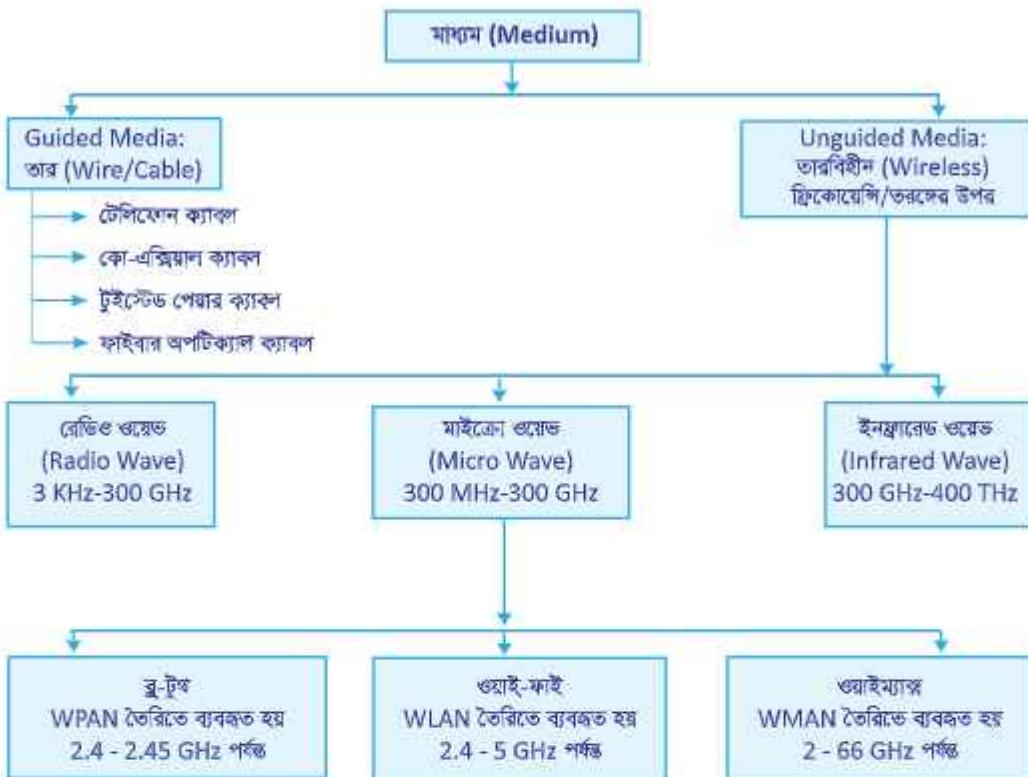
চিত্র 2.6: ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যম

২.২.১ তার মাধ্যম (Wired Media)

এ পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ধাতব তার ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট কোনো পথে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠনোর জন্য মাধ্যম হিসেবে কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তার বা ক্যাবল ব্যবহার করে ডেটা কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এটি ক্যাবল গাইডেড মিডিয়া। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহারের ভিন্নতার উপর তার বা ক্যাবলের ভিন্নতা রয়েছে, নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted pair cable)

দুটি পরিবাহী তারকে পরস্পর সুষমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুধরনের হয়ে থাকে, আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (UTP: Unshielded Twisted Pair) এবং শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (STP: Shielded Twisted Pair)।

চিত্র 2.7: আনশিল্ডেড এবং শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

সাধারণ কপার নির্মিত এ সব ক্যাবলে মোট চার জোড়া তার প্রতিটি পৃথক অপরিবাহী পদার্থের আবরণে (ইন্সুলেটর) আবৃত থাকে। প্রতি জোড়া তারে একটি কমন রঙের (সাদা রঙের) আরেকটি ভিন্ন রঙের (যেমন : নীল, সবুজ, কমলা ও বাদামি) তারের সাথে প্যাঁচানো থাকে। প্রতি জোড়া তার পৃথক অপরিবাহী আবরণে আবৃত করা থাকে। এ ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে 100 মিটারের বেশি দূরত্বে কোনো ডেটা প্রেরণ করা যায় না। ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এর ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে, তবে দূরত্ব বাড়তে থাকলে ডেটা ট্রান্সফার রেট কমতে থাকে। বাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial Cable)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল তামা বা কপার নির্মিত মূলত তিনটি স্তর বিশিষ্ট তারের ক্যাবল, কেন্দ্রস্থলে একটি শক্ত তামার তারের কন্ডাক্টর, সেটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে প্লাস্টিকের অপরিবাহী স্তর এবং এই স্তরকে ঘিরে তামার তারের একটি জাল বা শিল্ড (Braided Shield)। অনেক সময় শিল্ড এবং প্লাস্টিক অপরিবাহী স্তরের মাঝে একটি মেটালিক ফয়েলও থাকে। সবশেষে রাবারের অপরিবাহী পুরু স্তর এই ক্যাবলটিকে আবৃত করে রাখে। তামার তারের জালি এবং মেটালিক ফয়েলটি একসাথে আউটার কন্ডাক্টর (Outer conductor) হিসেবে বাইরের সকল প্রকার বৈদ্যুতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। বাইরের শিল্ড এবং কেন্দ্রীয় তামার তারের অক্ষ (axis) একই থাকার দরুন এর নামকরণ কো-এক্সিয়েল করা হয়েছে। কো-এক্সিয়েল ক্যাবলে ডেটা ট্রান্সফার রেট টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। কো-এক্সিয়েল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সমিশন লস্ অপেক্ষাকৃত কম এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য। ডিজিটাল এবং অ্যানালগ উভয় ধরনের ডেটা এই ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দুধরনের হয়- থিননেট (Thinnet) এবং থিকনেট (Thicknet)।

থিননেট (Thinnet) : থিননেট হালকা ও নমনীয় তার। এই তার 10BASE-2 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলটি দ্বারা রিপিটার (দুর্বল সংকেতকে শক্তিশালী সংকেতে বিবর্ধিত (Amplify) করা) ছাড়া সর্বোচ্চ 185 মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে 10 মেগাবিট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

থিকনেট (Thicknet) : থিকনেট ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এই তার 10BASE-5 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলটি দ্বারা সর্বোচ্চ 500 মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে 10 মেগাবিট ডেটা সহজেই আদান-প্রদান করা যায়।

চিত্র 2.8: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

ফাইবার অপটিক ক্যাবল বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ কাচের তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তু, যদিও বিশেষায়িত কাজের জন্য প্লাস্টিক বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের তৈরি ফাইবার অপটিক ক্যাবলও পাওয়া যায়। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ইনফ্রা রেড আলোর একটি রেঞ্জের ভেতর (1300-1500nm) অবিশ্বাস্য রকম স্বচ্ছ, তাই শোষণের কারণে বিশেষ কোনো লস ছাড়াই এর ভেতর দিয়ে সিগন্যাল দীর্ঘ দূরত্বে নেয়া যায়।

২০১৪-২০১৫

চিত্র 2.9: অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রের অংশটুকুর প্রতিসরণাঙ্ক বাইরের অংশের প্রতিসারাংক থেকে বেশি। যে অংশের প্রতিসারাংক বেশি তাকে কোর (Core) বলে, এবং যে অংশের প্রতিসারাংক কম তাকে ক্ল্যাড (Clad) বলে। প্রতিসরণাঙ্কের পার্থক্যের কারণে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে কোনো লস ছাড়াই কোরের ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে। (তবে কোরের ভেতর আলো আটকে থাকার প্রক্রিয়াটি সাধারণ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির) ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন্সে ব্যবহৃত কাচের তন্তু অত্যন্ত ভঙ্গুর বলে এটি তৈরি করার সময়েই পাতলা প্লাস্টিকের আবরণে আবৃত করে ফেলা হয়। ব্যবহারের আগে কেভলারের জালি এবং পলিমারের (চিত্র 2.9) আবরণে ঢেকে নেয়া হয়। ক্যাবল তৈরি করার সময় বেশ কয়েকটি ফাইবারকে একত্র করে পলিমারের আবরণে ঢেকে নেয় হয়। ফাইবার বাঁকা করলে সেখানে লস হতে পারে বলে ক্যাবলের ভেতর একটি সরু ধাতব রড ঢুকিয়ে রাখা হয়।

সিঙ্গেল মোড এবং মালটি মোড ফাইবার : অপ্টিক্যাল ফাইবারের ব্যাস ১৫০ মাইক্রনের মতো হয়। ফাইবারের কোরের ব্যাস ৮ থেকে শুরু করে ১০০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র 2.10)। কোরের ব্যাস যখন ৮ থেকে ১২ মাইক্রন হয় তখন সেটিকে সিঙ্গেল মোড ফাইবার বলে, কারণ তখন শুধু একটি মোড ফাইবারের কেন্দ্র দিয়ে যেতে পারে। দূরপাল্লার হাই স্পিড ট্রান্সমিশনে সব সময় সিঙ্গেল মোড ফাইবার ব্যবহার করা হয়। কোরের ব্যাস অত্যন্ত কম হওয়ায় এই ফাইবারের প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে ব্যয়সাধ্য।

চিত্র 2.10: মালটি মোড এবং সিঙ্গেল মোড ফাইবার

ফাইবারের কোরের ব্যাস যদি ৫০ থেকে ১০০ মাইক্রনের মতো হয় তখন তার ভেতর অসংখ্য মোড যেতে পারে, একেকটি মোড একেকভাবে যায় বলে আলোর সিগন্যালে বিকৃতি হয় বলে এই ফাইবার শুধু স্বল্প দূরত্বে কম স্পিডের কাজে ব্যবহার হয়। কোরের ব্যাস বেশি বলে প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মূল্য সাশ্রয়ী।

লেজার : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সত্যিকার অর্থে কাজ করার জন্য 1300 nm থেকে 1500 nm লেজার উদ্ভাবনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এলইডি (LED)-এর আলোতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ফাইবারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বিচ্ছুরণের (Dispersion) কারণে সিগন্যালের বিচ্যুতি ঘটে, সেজন্য এটি দীর্ঘ দূরত্বে ব্যবহার করা যায় না। লেজারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট বলে এটি দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা যায়।

যদিও 1300 nm এবং 1500 nm এই দুই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন করা সম্ভব কিন্তু 1500 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য ফাইবার অ্যামপ্লিফায়ার উদ্ভাবনের কারণে দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে বর্তমানে প্রায় একচেটিয়াভাবে 1500 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র 2.11: বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম

২.২.২ তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)

তার মাধ্যম ছাড়া যখন প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তখন তাকে তারবিহীন বা ওয়্যারলেস মিডিয়া বলে। এটি সম্ভব হয় কারণ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

2.11 চিত্রে Electromagnetic spectrum বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম দেখানো হয়েছে। এই তরঙ্গের কম্পন যত বেশি হবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত কম হবে। এই স্পেকট্রামের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ আমরা দৃশ্যমান আলো হিসেবে দেখতে পাই। এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) স্পেকট্রামের দুইটি ক্ষেত্র কমিউনিকেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে দুইটি হলো- রেডিওওয়েভ (Radiowave), এবং মাইক্রোওয়েভ (Microwave)।

রেডিওওয়েভ (Radio wave)

3 কিলোহার্টজ থেকে 300 গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে রেডিও ওয়েভ বলা হলেও কমিউনিকেশনের প্রেক্ষিতে সাধারণত 10 কিলোহার্টজ থেকে 1 গিগাহার্টজকে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 30km থেকে 30 cm) রেডিও ওয়েভভিত্তিক কমিউনিকেশন বলে বিবেচনা করা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তাই ব্রডকাস্টের বেলায় রেডিও ওয়েভ বেশি ব্যবহার হয়। রেডিও

চিত্র 2.12: পৃথিবী পৃষ্ঠে রেডিও ওয়েভের ট্রান্সমিশন

ওয়েভ পাঠানোর জন্য যে অ্যান্টেনার প্রয়োজন হয় তার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আনুমানিক চার ভাগের এক ভাগ হতে হয়। সে কারণে কম ফ্রিকোয়েন্সির (বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) রেডিও ওয়েভ খুব বাস্তবসম্মত নয়। রেডিও ওয়েভ বায়ুমন্ডলে খুব বেশি শোষিত হয় না, ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিল্ডিংসহ পাহাড়-পর্বত কিংবা অন্যান্য বাধা অতিক্রম করতে পারে। রেডিও ওয়েভ বায়ুমন্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পাঠানো সম্ভব। এজন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মাইক্রোওয়েভ (Microwave) : 300 MHz হতে 300 GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে মাইক্রোওয়েভ (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1 mm থেকে 1m পর্যন্ত) বলা হলেও কমিউনিকেশনের প্রেক্ষিতে সাধারণত 1 গিগাহার্টজ হতে 100 গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়। এটি রেডিও ওয়েভের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, সোজাসুজি যায়। তাই এই কমিউনিকেশনের জন্য ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা ও রিসিভার অ্যান্টেনাকে মুখোমুখি থাকতে হয় বা সংযোগ লাইন অব সাইট (LOS: Line of sight) অবলম্বন করতে হয়। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটি ট্রান্সসিভার (Transceiver) নিয়ে গঠিত হয়, যার একটি সিগন্যাল পাঠায় অন্যটি গ্রহণ করে।

মাইক্রোওয়েভে যোগাযোগ দুধরনের হয়ে থাকে :

১. টেরিস্ট্রিয়াল (Terrestrial) বা ভূপৃষ্ঠে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ এবং
২. স্যাটেলাইট (Satellite) বা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ।

টেরিস্ট্রিয়াল (Terrestrial) : সাধারণত যে সব জায়গায় ক্যাবল ব্যবহার করার অনুপযোগী সে সব স্থানে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার বসানো হয়। মাইক্রোয়েভ সংকেতের মধ্যে বাধা থাকলে ডেটা স্থানান্তর হয় না, তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন এবং সুষ্ঠু করার জন্য সাধারণত বড় টাওয়ার, উঁচু ভবন বা পাহাড়ে এ টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের অসমতল এলাকা কিংবা গাছপালা, ভবন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রতি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন বসাতে হয়।

চিত্র 2.13: টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশনের উদাহরণ

স্যাটেলাইট (Satellite)

চিত্র 2.14: স্যাটালাইট ট্রান্সমিশনের উদাহরণ

মাইক্রোওয়েভ বায়ুমন্ডলের আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে যেতে আসতে পারে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের (Artificial Satellite) মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা শুরু হয়। একটি স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিমি উর্ধ্বাকাশে স্থাপিত করা হলে সেটি জিওস্টেশনারি হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষে ঘূর্ণনের সমান গতিতে এই স্যাটেলাইট পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। পৃথিবী থেকে তখন এই স্যাটেলাইটকে আকাশের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির মনে হয়। সেজন্য ভূমিতে স্থাপিত VSAT (Very Small Aperture Terminal) কে একটি নির্দিষ্ট দিকে আকাশমুখী করে স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু-১ একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট এবং গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে অ্যান্টেনাগুলো আকাশের সেই বিন্দুর দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাপী টিভি চ্যানেলগুলোর সরাসরি সম্প্রচার, প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

২.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System)

২.৩.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Wireless Communication System)

টেলিফোনকে তারের সংযোগ থেকে মুক্ত করে ওয়্যারলেস প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা বর্তমান জগতের অনেক বড় একটি অর্জন। সেই টেলিফোন যখন শুধু কথা বলা এবং মেসেজ পাঠানোর মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আরো অসংখ্য কাজে আমাদের সহায়তা করতে শুরু করেছে তখন সবার কাছে একটি নতুন জগতের উন্মোচন হয়েছে। মোবাইল ফোন এখন শখের কিছু নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যাবশ্যক অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বিশ্ব ওয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া একেবারেই অচল। পারস্পরিক যোগাযোগ, বিনোদন, শিক্ষা, পরিবহন বা চিকিৎসার কাজে একজন মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেভাবে স্মার্ট ফোনে ওয়্যারলেসের সহায়তা নেয়, ঠিক একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, দাপ্তরিক কাজ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ব্যাপকভাবে ওয়ারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ চালনায় ভূ-পৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণকারী স্টেশনের সাথে এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতাবৃদ্ধিতে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বহুমাত্রিক ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ। নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষত অপরাধী শনাক্তকরণ অথবা ভ্রমণকারীর অবস্থান কিংবা কোনো যানবাহন ট্র্যাক করার কাজে এ প্রযুক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া ইন্টারনেটভিত্তিক আধুনিকতম তথ্যবিনিময় বা যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-আইওটি (IOT: Internet of Things)। ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যা ইলেকট্রনিক্স, সফটওয়্যার, সেন্সর, নেটওয়ার্ক সংযোগের সাথে সংযুক্ত ফিজিক্যাল ডিভাইস যা পরিবহন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, অ্যাকচুয়েটর এবং অন্যান্য ডিজিটাল আইটেমের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত এবং তথ্য বিনিময় করতে সক্ষম। ফলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে বিল্ডিং, হোম অটোমেশন, অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, ম্যানুফেকচারিং, কৃষি, চিকিৎসা, এনার্জি ইত্যাদি সেক্টরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। একটি স্মার্ট রিস্ট-ব্যান্ড পালস রেট, হার্টবিট, স্ট্রেস লেভেল, কত সময় হাঁটাহাঁটি করা হলো এবং শারীরিক ওজন মাপার কাজ দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে পারে।

২.৩.২ ব্লুটুথ (Bluetooth)

ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং জগতে ব্লুটুথ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে। ব্লুটুথ নেটওয়ার্কটির ব্যান্ডউইথ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এটি বহুল ব্যবহৃত। যে সব ডিভাইসে এই পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোকে ব্লুটুথ ডিভাইস বলে। বর্তমানে ল্যাপটপ, ট্যাব, পিডিএ, স্মার্ট ফোনে ব্লুটুথ প্রযুক্তি আগে থেকে দেওয়া থাকে। এছাড়া ইদানীং মাউস, কিবোর্ড, হেডফোন সেট, স্পিকার ইত্যাদিতেও ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

এটি একটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক-প্যান (PAN), 2.45 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এর ব্যাপ্তি ৩ থেকে ১০ মিটার হয়ে থাকে। হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে এর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট প্রায় 1Mbps বা তারচেয়ে বেশি। এটি স্থাপন করা সহজ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগারেশন করা হয়। ব্লুটুথ নেটওয়ার্ককে পিকোনেটও বলা হয় -এর আওতায় সর্বোচ্চ ৮ (আট) টি যন্ত্রের সাথে সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারে, এর মধ্যে একটি মাস্টার ডিভাইস এবং বাকিগুলো স্লেভ ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। কতকগুলো পিকোনেট মিলে আবার একটি স্ক্যাটারনেট গঠিত হতে পারে।

চিত্র 2.15: ব্লুটুথের লোগো

২.৩.৩ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)

আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও Wi-Fi কে Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে মনে করা হয়। (Wi-Fi শব্দটি স্বত্বাধিকারী Wi-Fi Alliance নামীয় একটি সংস্থার নির্ধারিত ট্রেডমার্ক) প্রযুক্তিটি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যেটা উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারসহ কম্পিউটারের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

চিত্র 2.16: ওয়াইফাইয়ের লোগো এবং আইকন

এই নেটওয়ার্কের জন্য কোনো লাইসেন্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না এবং যেকোনো মানের Wi-Fi ডিভাইস পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় কাজ করতে পারে। সে কারণে ডেটার

নিরাপত্তার খানিকটা ঝুঁকি থাকে। এটি সাধারণত 2.4 থেকে 5 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এর কভারেজ এরিয়া 50 থেকে 300 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপুল জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার সহজ হওয়ার কারণে একসাথে অনেক ব্যবহারকারী খুব সহজেই এই নেটওয়ার্কে সিগন্যাল জ্যামে পড়তে পারে।

২.৩.৪ ওয়াই-ম্যাক্স (WiMAX)

এটি দ্রুতগতির একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি, যেটি প্রচলিত DSL (Digital Subscriber Line) এবং তারযুক্ত ইন্টারনেটের পরিবর্তে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা দিয়ে থাকে। Worldwide Interoperability for Microwave Access -এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে WiMAX।

এটি সাধারণত 2 থেকে 66 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং 80 Mbps থেকে 1Gbps পর্যন্ত গতিতে ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রদানে সক্ষম।

চিত্র 2.17: ওয়াইম্যাক্সের লোগো

WiMAX এর প্রধান অংশ দুটি :

১. বেস স্টেশন, যেটি ইনডোর ডিভাইস এবং আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। প্রতিটি বেস স্টেশনের কভারেজ এরিয়া 10 থেকে 50 km পর্যন্ত হয়ে থাকে।
২. অ্যান্টেনাযুক্ত WiMAX রিসিভার, যা কম্পিউটারে সংযুক্ত করা হয় যেটি ওয়্যারলেস নির্ভর হওয়ায় পরিবহনযোগ্য।

এই প্রযুক্তিতে একটি একক বেস স্টেশনের মাধ্যমে বিশাল ভৌগোলিক এলাকায় হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া যায়। ওয়্যারলেস হওয়ায় পোর্টেবিলিটির সুবিধা পাওয়া যায় এবং এর রিসিভার সহজে বহনযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের মাধ্যমে শহর এবং গ্রামে পোর্টেবল ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করে।

WiMAX নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অনেক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক হওয়ায় অন্যান্য নেটওয়ার্কের তুলনায় এটি ব্যয়বহুল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।

Bluetooth, Wi-Fi এবং WiMAX– এই তিনটি ওয়্যারলেস প্রযুক্তির তুলনামূলক কার্যকারিতার ছক দেওয়া হলো :

টেবিল 2.2

Name	Bluetooth	Wi-Fi	WiMax
Standard(IEEE)**	802.15	802.11	802.16
Frequency (GHz)	2.4-2.45	2.4-5	2-66
Speed (Mbps)*	0.72-25	11-1300	80 Mbps বা তার অধিক
Range (Meter)*	3-10	50-300	10000-50000 (50 km)
Network	WPAN	WLAN	WMAN

**IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers

* প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে পরিবর্তনযোগ্য

২.৪ মোবাইল যোগাযোগ (Mobile Communication)

দুটি ডিভাইসের মধ্যে চলমান বা স্থিতাবস্থায় তারবিহীন যোগাযোগকে মোবাইল যোগাযোগ বলে। বর্তমান বিশ্বে মোবাইল ফোনের সাথে পরিচয় নেই সেরকম মানুষকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মোবাইল ফোনকে কার্যকর করার জন্য পুরো অঞ্চলকে অসংখ্য সেলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি সেলে একটি করে বেস স্টেশন থাকে। কোনো একজন ব্যবহারকারী যখন অন্য আর একজনের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তখন তার কলটি নিজের বেস স্টেশনের মাধ্যমে সুইচিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। সুইচিং কেন্দ্র খোঁজ করে বের করে যার কাছে টেলিফোন করা হয়েছে সে কোন সেলে রয়েছে এবং তার কল সেই সেলের বেস স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই বেস স্টেশন নির্দিষ্ট মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে দেয়। মোবাইল টেলিফোনের প্রত্যেকটি সেটই একই সাথে একটি করে ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার। এই প্রযুক্তি আলাদা আলাদা সেলের মাধ্যমে কাজ করে বলে মোবাইল ফোনকে অনেক সময় সেল ফোনও বলা হয়ে থাকে।

চিত্র 2.14: মোবাইল যোগাযোগ

শুরুতে শুধু কথা বলার জন্য ফোন উদ্ভাবন করা হলেও বর্তমানে এই ফোন অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং এখন টেলিফোনে কথা বলার সাথে সাথে ডেটা আদান প্রদান করা যায়। আগে যে সমস্ত কাজ শুধু কম্পিউটার বা ল্যাপটপের মাধ্যমে করা যেতো এখন তার প্রায় সবকিছুই স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে করা যায়।
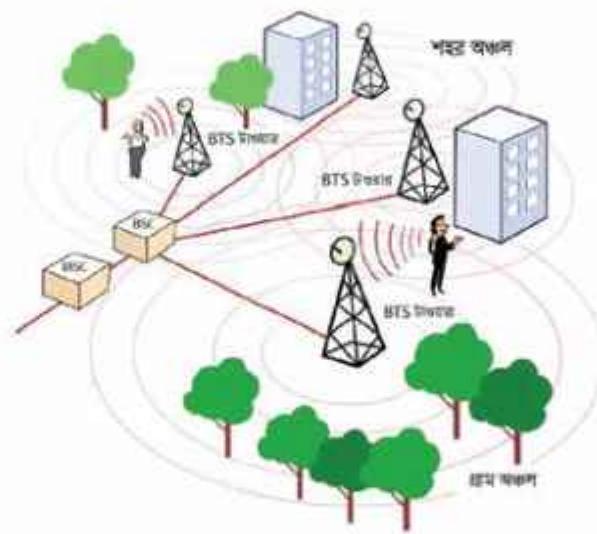
২.৪.১ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন (Different Generations of Mobile Phone)

আমরা বর্তমানে যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছি, শুরুতে তা এমন ছিল না। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে মোবাইল ফোন বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উন্নয়নের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম নামে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই মোবাইল ফোনের কার্যক্ষমতা ছিল খুবই কম; দুর্বল নেটওয়ার্কের দরুন সীমিত এলাকাভিত্তিতে ব্যবহার হতো। 1940 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু করে। এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি জাপানের NTTC (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোন উৎপাদন শুরু করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোবাইল ফোন উন্নতির সময়কালকে পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রজন্ম (First Generation-1G: 1979-1990)

টেলিফোন প্রযুক্তিতে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মোবাইল বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম Motorola Dyna TAC নামে হ্যান্ড মোবাইল সেট চালু করে। একই সময়ে সেখানে AMPS (Advanced Mobile Phone System) স্ট্যান্ডার্ড বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করা হয়। AMPS অ্যানালগ সিস্টেম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করত। এর পাশাপাশি ব্রিটেনে TACS (টোটাল অ্যাকসেস কমিউনিকেশন সিস্টেম) সব টেলিফোনে সেমিকন্ডাক্টর ও মাইক্রোপ্রসেসর এবং কম ব্যান্ডের সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হতো। তাই এতে যেকোনো ধরনের মোবাইল অপারেটর কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুবিধা ছিল না। এছাড়া রোমিং ব্যবস্থা সীমিত ছিল।

চিত্র 2.19: প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন

দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation-2G: 1991-2000)

অ্যানালগ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ডিজিটাল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু হয়। তাই Second Generation-2G-কে ডিজিটাল সেলুলার নেটওয়ার্ক বলা হয়। এ সময়ের মোবাইল ফোনের টেকনোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো GSM (Global System for Mobile Communication) এবং CDMA (Code Division Multiple Access) সুবিধা।

চিত্র 2.20: দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

এসব সুবিধা নিয়ে এবং ভয়েসকে নয়েজমুক্ত করার মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সূচনা হয়। এজন্য সেকেন্ড জেনারেশন মোবাইলকে জিএসএম বা সিডিএমএ স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। সময়ের পরিক্রমায় মোবাইল হ্যান্ডসেটের আকৃতি ও ওজন উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রি-পেইড পদ্ধতি, এসএমএস, এমএমএস ও ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। এ সময়ে আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেম চালু হয়। যখন কোনো মোবাইল ফোন তার সার্ভিস অপারেটরের কভারেজ এরিয়ার বাইরে থেকেও সর্বদা ডেটা সার্ভিস দিতে পারে তখন তাকে রোমিং বলে।

২০১৪-২০১৫

তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation-3G: 2001-2008)

জাপানের DoCoMo কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করে। দ্বিতীয় হতে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত পার্থক্য হলো সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের ব্যবহার। সার্কিট সুইচিং পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কিং রিসোর্স বা ব্যান্ডউইথ বিভিন্ন অংশ বা পার্টে বিভক্ত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পথে গন্তব্যে পৌঁছে, যার ফলে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কম। প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কিং রিসোর্স বা ব্যান্ডউইথ বিভিন্ন প্যাকেটে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে গন্তব্যে পৌঁছে এবং এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। এতে অবশ্য উভয় সুইচিং পদ্ধতি চলে। পূর্বের তুলনায় উচ্চ ব্যান্ডের সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবহার শুরু হয় (ডেটা ট্রান্সফার রেট 2 Mbps- এর বেশি)।

মূলত এই প্রজন্মের ফোনে নিম্নের চারটি স্ট্যান্ডার্ড চালু হয় :

1. HSPA (High speed package Access)
2. WCDMA (Wide band code division multiple access)
3. 3GPP (3rd Gen Partnership Project)
4. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)।

চিত্র 2.21: তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

ভিডিও কল, ইন্টারনেট, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, FOMA (Freedom of Multimedia access) ইত্যাদি সুবিধা নিয়ে থ্রি-জি মোবাইল ফোন চালু হয়।

চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation-4G: 2009-2020)

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো সার্কিট সুইচিং বা প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার। ফলে LAN, WAN, VoIP, Internet প্রভৃতি সিস্টেমে প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে প্রটোকলভিত্তিক ভয়েস ডেটা ট্রান্সফার সম্ভব হচ্ছে। দ্রুত চলনশীল ডিভাইসের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ডেটা ট্রান্সফার রেট

চিত্র 2.22: চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন

100 Mbps, ত্রিমাত্রিক এবং স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে। এটি LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে। মোবাইল ওয়েব অ্যাকসেস, আই.পি টেলিফোনিং, গেমিং সার্ভিসেস, হাই ডেফিনিশন মোবাইল টিভি, ভিডিও কনফারেন্সিং, থ্রিডি টিভি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 4G প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এর গতি 3G'র চেয়ে 50 গুণ বেশি।

পঞ্চম প্রজন্ম (Fifth Generation-5G: 2020- ...)

5G বা পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম মোবাইল ফোনের মধ্যে অত্যাধুনিক ও সর্বশেষ সংস্করণ। এ ধরনের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়্যারলেস ওয়েব (World Wide Wireless Web) বা সংক্ষেপে WWWW নামে পরিচিত। এ ধরনের মোবাইল ফোনের স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে 5G NR (New Radio), RAT (Radio Access Technology), MIMO (Multiple input and multiple output) অন্যতম। এই প্রজন্মের মোবাইল ফোনের পারফর্ম্যান্স 4G'র তুলনায় অনেকগুণ বেশি এবং অনেক দ্রুতগতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে 4K টিভি বা ভিডিও উপভোগ করা যায়।

চিত্র 2.23: পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন

যুগের সাথে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার উৎকর্ষের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করে বিশ্বসেরা মোবাইল ফোন কোম্পানি এবং অন্যান্য বেশ কটি প্রতিষ্ঠান এর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে 5G প্রযুক্তির মোবাইল ফোন একটি বাস্তবতা। পৃথিবীর অনেক দেশেই এটি চালু হয়েছে। আমাদের দেশেও 5G চালু হতে যাচ্ছে।

২.৫ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking)

আমরা সবাই কম-বেশি নেটওয়ার্কিং শব্দটির সাথে পরিচিত। জালের মতো বিস্তৃতি বোঝাতে নেটওয়ার্ক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যবসা, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিজেদের স্বার্থে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ কিংবা পারস্পরিক সংযোগ ব্যবস্থা দৃঢ়করণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। ঠিক একইভাবে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই ধরনের সংযোগ ব্যবস্থার জন্য কিছু বিশেষ ধরনের মিডিয়া এবং নেটওয়ার্ক-ডিভাইস প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

২.৫.১ নেটওয়ার্কিংয়ের ধারণা (Concept of Networking)

দৈনন্দিন কাজকর্ম সহজ করার স্বার্থে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য একজন অপরজনের সাথে পরিচিতি কিংবা নির্ভরশীলতা দিয়ে কিন্তু আমাদের অজান্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলি। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সাথে সাথে যোগাযোগের মাত্রা ও ধরন পরিবর্তনের দরুন নেটওয়ার্কিংয়েও অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। আমরা মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও, টেক্সট মেসেজ বিনিময় করে থাকি। এক্ষেত্রে কোনো রকম সংযোগ ব্যতিরেকে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা

বিনিময় সম্ভব; তবে এই ধরনের তথ্য আদান-প্রদান বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। তাই, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে আমরা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগ ব্যবস্থাকে বুঝি। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ডেটা স্থানান্তর, ই-মেইল, অনলাইন ব্যাংকিং, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। কোনো কম্পিউটার অকেজো হয়ে গেলেও নেটওয়ার্কযুক্ত অন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে সবধরনের কাজ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া একটি কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য একাধিক ব্যবহারকারী নিজ নিজ কম্পিউটারের মাধ্যমে অ্যাকসেস ও ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক একইভাবে একটি প্রিন্টার বহু ব্যবহারকারী ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারেন। এভাবেই নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

২.৫.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের উদ্দেশ্য (Objectives of Computer Networking)

দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রিসোর্স শেয়ার করা এবং একসাথে কাজ করা। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কোনো কম্পিউটারের জন্য 'রিসোর্স' হচ্ছে অন্য কম্পিউটারের এমন কোনো উপাদান বা সুবিধা যা তার কাছে নেই। যে কোনো কম্পিউটারের তথ্য কিংবা উপাদানগত সীমাবদ্ধতা এড়ানোর জন্য রিসোর্স শেয়ার করে কাজের সূক্ষ্মতা, গতি এবং ক্ষেত্র বা পরিধি অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায়। তাই কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের মূল উদ্দেশ্যই হলো, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে তথ্য এবং রিসোর্সসমূহ ব্যাপক সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে সহজলভ্য করা। রিসোর্স শেয়ার বলতে যা বোঝানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ার : যে কোনো বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য এখন সবাই ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট সার্চ করে। কিংবা একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান করে দ্রুত ও সহজে কাজ সম্পাদন করা যায়।

সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার : নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা যায়। এক্ষেত্রে একটি সফটওয়্যারই যদি নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় তবে একাধিক সফটওয়্যার ক্রয় না করে একটি সফটওয়্যার সবাই ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা লেনদেনের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টারে ভিন্ন ভিন্ন কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেখা যায় তা মূলত একটি সফটওয়্যারকেই সকলে শেয়ার করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দিক দিয়ে ব্যাপক সাশ্রয় ঘটে।

হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার : বিভিন্ন অফিস, ব্যাংক, কম্পিউটার ল্যাব, সাইবার ক্যাফেতে আমরা দেখতে পাই যে অনেক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সুবিধা দ্বারা শুধু একটি প্রিন্টার সবাই ব্যবহার করছেন। এখানে মূলত প্রিন্টারটি সংযুক্ত থাকে সার্ভার কম্পিউটারে। অন্য কম্পিউটারগুলো (যাদেরকে ক্লায়েন্ট বা ওয়ার্কস্টেশন বলা হয়) নেটওয়ার্কভুক্ত থাকার কারণে সার্ভারের প্রিন্টারটি শেয়ার করতে পারে। আর এতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয় ঘটছে।

২.৫.৩ নেটওয়ার্কিংয়ের প্রকারভেদ (Types of Networking)

চিত্র 2.24: নেটওয়ার্কিংয়ের প্রকারভেদ

আধুনিক যুগের বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় অবাধ তথ্য প্রবাহ জীবনের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। জীবনের সর্বস্তরে তথ্য শেয়ারের এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় নানা ধরনের অজস্র কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রচলিত আছে। এ সব নেটওয়ার্কের সাথে বিপুল পরিমাণ কম্পিউটারসহ আরো অনেক আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইসের নেটওয়ার্কসমূহকে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

- নেটওয়ার্কের ভৌগোলিক বিস্তৃতি
- সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
- নেটওয়ার্কের মালিকানা।

নেটওয়ার্কের ভৌগোলিক বিস্তৃতি

নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN)
৩. ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network-CAN)
৪. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN)
৫. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN) : কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়, তাকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN বলে। PAN-এর ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ওয়েব ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেম, পিডিএ, মোবাইল, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর পরিধি সর্বোচ্চ 10 মিটার।

চিত্র 2.25: পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN

২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN) : দৈনন্দিন জীবনে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN-ই বেশি ব্যবহার করে থাকি। ছোট অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিংবা একটি বিল্ডিং বা স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত কয়েকটি ভবনে স্থাপিত অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এতে অনেক ডিভাইস অ্যাকসেস পাওয়া যায় এবং রিপিটার ব্যবহার করে এর বিস্তৃতি সর্বোচ্চ 1 কিমি করা যায়। LAN-এর টপোলজি সাধারণত স্টার, বাস, ট্রি ও রিং হয়ে থাকে। এই ধরনের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।

চিত্র 2.26: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN

৩. ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network-CAN) : অনেক LAN-এর সমন্বয়ে CAN-গঠিত হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, স্টুডেন্ট সেন্টার, আবাসিক হলসমূহ, জিমনেসিয়াম এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভবনে স্থাপিত LAN গুলোকে সংযুক্ত করতে CAN ব্যবহার করা হয়। এর বিস্তৃতি 1 থেকে 5 কিমি দূরত্ব পর্যন্ত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় অফিস কমপ্লেক্সের একাধিক ভবনে LAN ব্যবহারকারীদের কাজের সমন্বয়ের জন্য কিংবা ব্যয়বহুল এক বা একাধিক পেরিফেরাল ডিভাইস অনেক ব্যবহারকারীর জন্য CAN ব্যবহার করা হয়। যেমন- Googleplex এবং Microsoft's-এর নেটওয়ার্ক।

চিত্র 2.27: ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক বা CAN

৪. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN) : মেট্রোপলিটন এরিয়া বলতে একটি শহর বা ছোট অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত এলাকাকে বোঝায়, এ রকম একটি বড় এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অনেকগুলো কম্পিউটার নিয়েই MAN গঠিত হয়। MAN-এর বিস্তৃতি LAN-এর চেয়ে বড় কিন্তু WAN-এর চেয়ে ছোট হয়। প্রায় 50 কিমি দূরত্ব পর্যন্ত MAN-এর নেটওয়ার্ক থাকতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্কে যখন তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) বলা হয়। ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় টেলিফোন লাইন, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, রেডিও ওয়েভ বা টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ। নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ, গেটওয়ে ইত্যাদি এই নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।
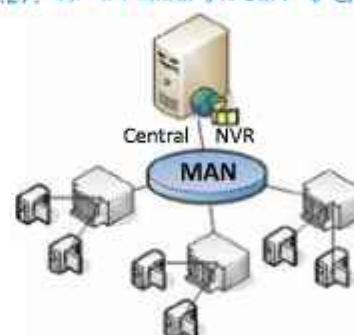
চিত্র 2.28: মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN

৫. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN) : ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক দিয়ে বড় ধরনের এলাকাজুড়ে নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করা হয়। একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটারের মধ্যে গড়ে তোলা নেটওয়ার্কই ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN নামে পরিচিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় WAN-এর উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ডিভাইসসমূহ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সেগুলোর সার্ভিস মডেল কেমন হবে, তার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা :

১. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)
২. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network)
৩. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)
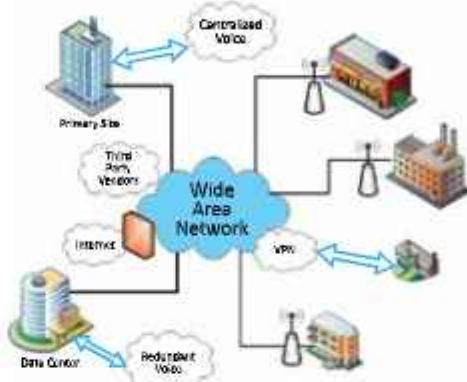
চিত্র 2.29: ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN

১. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network) : পৃথক সার্ভার কম্পিউটার ব্যতীত দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে রিসোর্স শেয়ার করার জন্য যে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয় তা হলো পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক।

২. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network): একাধিক ক্লায়েন্ট/ওয়ার্কস্টেশন ও একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সমন্বয়ে ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। এখানে সার্ভার কম্পিউটারে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা জমা রাখা হয় এবং এসব ডেটা নেটওয়ার্কে অবস্থিত ক্লায়েন্ট কম্পিউটার কর্তৃক রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার (শেয়ার) করা হয়। একে সার্ভার-বেজড নেটওয়ার্কও বলা হয়।

স্টোরেজ মিডিয়া, হোস্ট ও টার্মিনাল (ক্লায়েন্ট/ইউজার/নোড) সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ককে আবার সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Certralized Network) এবং ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network) এই দুভাগে ভাগ করা যায় :

ক. সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Certralized Network) : এ ধরনের নেটওয়ার্কে সাধারণত একটি প্রধান কম্পিউটার থাকে, যাকে হোস্ট কম্পিউটারও বলে এবং কিছু টার্মিনাল দিয়ে গঠিত হয়।
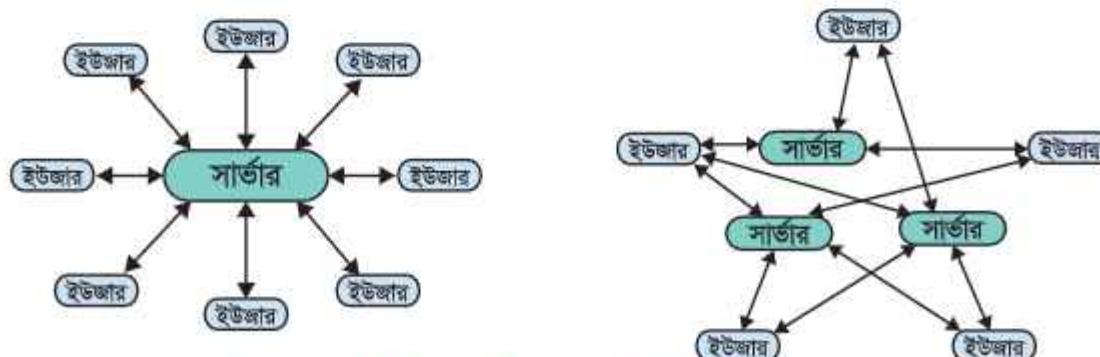
চিত্র 2.30: সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক এবং ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক

খ. ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network) : এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরস্পর সংযুক্ত কিছু ওয়ার্কস্টেশন বা টার্মিনাল, বিভিন্ন শেয়ারড্ স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

৩. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network) : এটি মূলত পিয়ার-টু-পিয়ার ও ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে হোস্ট কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিং-এর পাশাপাশি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য (যেমন– গ্লোবাল স্টোরেজ মিডিয়া) বিদ্যমান থাকায় কর্পোরেট ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই নেটওয়ার্কে ক্লায়েন্ট সার্ভারের প্রাধান্য বেশি থাকে।

নেটওয়ার্কের মালিকানা

নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network) এবং প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network) : যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেকোনো সময় যেকোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে, তাকে পাবলিক নেটওয়ার্ক বলে। এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয় অনেক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে, অর্থাৎ এর একক মালিকানা থাকে না। এর ব্যবহারকারীকে সাধারণত ফিস্ বা মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। WAN বা ইন্টারনেট এ ধরনের নেটওয়ার্কের উদাহরণ।

২. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network) : যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত এবং কোনো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাকে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলে। কেউ ইচ্ছা করলেই এই নেটওয়ার্কে অ্যাকসেস করতে পারে না। এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয় একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে। এর সিকিউরিটি সিস্টেম মজবুত এবং এতে ট্রাফিক নেই বললেই চলে। ডেটা আদান-প্রদান (Delay) কম হয়। PAN, LAN বা CAN এ ধরনের নেটওয়ার্ক।

২.৫.৪ নেটওয়ার্ক ডিভাইস (Network Devices)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কম্পিউটারগুলো যুক্ত করতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলা হয়। এসব যন্ত্রপাতি মূলত নেটওয়ার্কে ডেটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংকেত ও ডেটাকে তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে :

- মডেম
- হাব
- রাউটার
- গেটওয়ে
- সুইচ
- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

মডেম (MODEM) : নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি গড়ে ওঠার আগে টেলিফোন লাইন (এবং কখনো কখনো টেলিভিশনের ক্যাবল লাইন) ব্যবহার করে নেটওয়ার্কিং করার জন্য মডেম উদ্ভাবিত হয়েছিল। মডেম (MODEM) শব্দটি Modulator ও Demodulator শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে ফাইবার এবং ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার কারণে মডেমের ব্যবহার বিলুপ্তির দিকে।

হাব (HUB) : একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটার বা ডিভাইসের নেটওয়ার্কিং করার জন্য হাব ব্যবহৃত হয়। হাবের পোর্টগুলোতে কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং পোর্টগুলো সংযুক্ত করা হলে একটি LAN তৈরি হয়ে যায়। হাবের ভেতরে কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই, এটি বিভিন্ন ডিভাইসের নেটওয়ার্কিং পোর্টগুলোর ভেতর একধরনের পরিবাহিক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য হাবে প্রেরিত যেকোনো সংকেত কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসে ব্রডকাস্ট করে, এক্ষেত্রে সংকেতটি যে ডিভাইসের জন্য পাঠানো হয়েছে সেই ডিভাইসটিই শুধু সংকেত গ্রহণ করে, বাকি ডিভাইসগুলো সংকেত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সে কারণে হাবে ডেটা কলিশন বা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে এবং নেটওয়ার্কে ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যায়। বর্তমানে হাবের ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।

সুইচ (Switch) : নেটওয়ার্কিং করার জন্য বর্তমানে হাবের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে সুইচ ব্যবহৃত হয়। কার্যক্রমের দিক থেকে হাবের সাথে সুইচের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। সুইচ কোনো সংকেতকে ব্রডকাস্ট করে না, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রতিটি কম্পিউটারের MAC (Media Access Control) অ্যাড্রেস ব্যবহার করে শুধু নির্দিষ্ট পোর্টে সিগন্যালটি পাঠায়। শুধু তাই নয় দুর্বল হয়ে পড়া সংকেতটিকে অ্যামপ্লিফাই (বর্ধিত) করে গন্তব্য কম্পিউটারের পোর্টে প্রেরণ করে।

চিত্র 2.31: সুইচ

সুইচে পোর্টের সংখ্যা 8, 16, 24 থেকে 48 পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতে ডেটা ফিল্টারিং (প্রকৃত সিগন্যাল থেকে নয়েজ সিগন্যাল বাদ দেয়া) করা সম্ভব। তবে ব্যবহারের দিক থেকে একটু জটিল। একটি সুইচ দিয়ে একটি LAN তৈরি করা যায়, একাধিক LAN তৈরি সম্ভব নয়।

রাউটার (Router) : রাউটার এমন একটি কানেকটিং ডিভাইস, যা একই প্রটোকলভুক্ত (নেটওয়ার্কের নিয়মকানুনসমূহ) দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র নেটওয়ার্কের সংযোগ করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে পারে। এর মাধ্যমে একই ধরনের ছোট আকারের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের একাধিক LAN সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। WAN-এর সাথে একটি LAN যুক্ত করতে রাউটার ব্যবহৃত হয়।

চিত্র 2.32: রাউটার

একটি নেটওয়ার্ক থেকে পাওয়া ডেটা সংকেত রাউটার সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ব্যবহার করে অন্য নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট ডিভাইসে পাঠাতে পারে। কোনো একটি ডেটা প্যাকেটকে কোন পথ দিয়ে পাঠানো সবচেয়ে সুবিধাজনক রাউটার সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাউটার ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে। নেটওয়ার্কে ডেটার আধিক্য এবং ব্যস্ততা দেখতে পেলে রাউটার সেই রুট (পথ) পরিহার করে অন্য রুট (পথ) দিয়ে ডেটা

পাঠাতে সক্ষম হয়। তবে এর কনফিগারেশন অপেক্ষাকৃতভাবে একটু জটিল। একই প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মাঝে সংযোগ স্থাপন করলেও রাউটার ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্কের মাঝে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।

গেটওয়ে (Gateway) : ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য গেটওয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি একই ধরনের বা ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেয় অর্থাৎ এটি মূলত একটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস। অপেক্ষাকৃত দামি এবং কনফিগারেশন জটিল প্রকৃতির হলেও গেটওয়ে ও রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। গেটওয়েকে প্রটোকল কনভার্টার বলে। এটি ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে এবং শুধু টার্গেট আই.পি অ্যাড্রেসে সংকেত পাঠায়।

চিত্র 2.33: গেটওয়ের ব্যবহার

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) : একসময় কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইসকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য আলাদা করে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC: Network Interface Card) ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে কম্পিউটারগুলোতে এই কার্ড বিল্ট-ইন অবস্থায় থাকে বলে আলাদাভাবে এর ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।

২.৫.৫ নেটওয়ার্কের কাজ (Functions of Network)

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রধান কাজ হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং এবং ডেটা কমিউনিকেট করা। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকা একাধিক কম্পিউটার ও পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো নিয়ন্ত্রণসহ নেটওয়ার্কের কাজগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানে সহায়তা করা এবং রিসোর্সের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা।
২. ব্যবহারকারীর অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রণ-পর্যবেক্ষণসহ তার সময় এবং আর্থিক সাশ্রয় ঘটানো।
৩. তথ্যের সহজ প্রাপ্তি ও দ্রুততা নিশ্চিতকরণ।
৪. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের সাথে কম সময়ের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থাকরণ।
৫. শিক্ষা, চিকিৎসা, আর্থিক বিষয়, ক্যারিয়ার গঠন, হোটেল বা ফ্লাইট বুকিংসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার।
৬. সার্ভার কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭. ডেটার ব্যাকআপ রাখা। ব্যবহারকারীকে নিরাপদ ও সহজ অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদান করা।
৮. স্পর্শকাতর ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীকে আপডেটেড তথ্য সরবরাহ করা।
৯. সিস্টেমকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারী থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা।

২.৫.৬ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

নেটওয়ার্ক টপোলজি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, কম্পিউটার ও অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো কীভাবে অপর কম্পিউটার এবং অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে, তার পরিকল্পনা বা ধারণা। এতে নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদান সহজসাধ্য এবং সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করা। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ভৌত সংযোগ বিন্যাস এবং নির্বিঘ্নে ডেটা আদান-প্রদানের যুক্তিনির্ভর সুনিয়ন্ত্রিত পথের পরিকল্পনা, এ দুইয়ের সমন্বিত ধারণাই নেটওয়ার্ক টপোলজি। একটি কম্পিউটার-নেটওয়ার্কে কম্পিউটার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি থাকতে পারে। নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের (কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য পেরিফেরাল যন্ত্র) সংযোগস্থলকে সাধারণভাবে নোড (Node) নামে অভিহিত করা হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত নিচে উল্লিখিত টপোলজিগুলো ব্যবহার করা হয়।

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)
৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)
৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
৫. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)
৬. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

বাস টপোলজি (Bus Topology)

এ ধরনের টপোলজিতে একটি সংযোগ লাইনের সাথে সবধরনের নোড অর্থাৎ কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। এই প্রধান সংযোগ লাইনকে বাস (Bus) বলা হয়, যা কো-এক্সিয়াল অথবা ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে তৈরি হয়। এটি নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করে। এর লাইনের দু প্রান্তে দুটি টার্মিনেটর থাকে।

চিত্র 2.34 : বাস টপোলজি

নেটওয়ার্কের প্রতিটি নোড স্বতন্ত্রভাবে বাসে সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহ ব্যবস্থা হয় দ্বিমুখী। ডেটা পাঠানোর প্রয়োজন হলে প্রেরক কম্পিউটার এ লাইনে ডেটা পাঠিয়ে দেয়। প্রেরিত ডেটার সাথে প্রাপক শনাক্তের তথ্যও থাকে। বাসের সাথে যুক্ত অন্যান্য প্রতিটি কম্পিউটার বাসে প্রবাহিত ডেটা পরীক্ষা করে দেখে। শুধু প্রাপক কম্পিউটারই ডেটা গ্রহণ করে, অন্যগুলো এই ডেটা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।
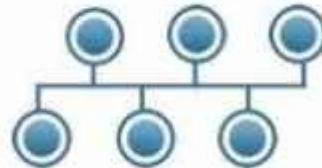
বাস টপোলজির সুবিধা

১. কম তার এবং সরল সংগঠনের কারণে বাস টপোলজি ইনস্টলেশন সহজ ও সাশ্রয়ী।
২. কানেক্টর বা রিপিটার দ্বারা সহজেই নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বাস– এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটানো যায়।
৩. নেটওয়ার্কে যে কোনো সময়ে নতুন নতুন ডিভাইস বা কম্পিউটার সংযুক্ত করা যায়।
৪. কোনো কম্পিউটার বিচ্ছিন্নকরণ বা নষ্ট হলেও সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে না।
৫. নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।

বাস টপোলজির অসুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সমিশন অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।
২. প্রধান সংযোগ লাইন বা বাস-এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে ব্যাপক ট্রাফিক সৃষ্টি হয় এবং গতি হ্রাস পায়।
৪. ডেটা সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রিং টপোলজি (Ring Topology)

যে টপোলজিতে রিং–এর ন্যায় কম্পিউটার নোডগুলো চক্রাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গঠন করে তাকে রিং টপোলজি বলে। এই বৃত্তাকার নেটওয়ার্কে প্রথম ও সর্বশেষ কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এবং এতে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।
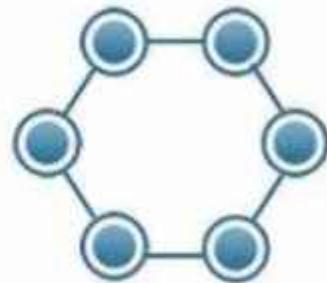
চিত্র 2.35: রিং টপোলজি

নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার ডেটা প্রেরণের জন্য সমান অধিকার পায়। একটি নোড সংকেত পাঠালে তা পরবর্তী নোডের কাছে যায়। সংকেতটি ঐ নোডের জন্য হলে সেটি সে নিজে গ্রহণ করে, অন্যথায় উক্ত নোড সংকেতকে তার পরবর্তী নোডের কাছে প্রেরণ করে। সঠিক নোডে না পৌঁছানো পর্যন্ত বৃত্তাকার নেটওয়ার্ক পথে সংকেত পরিভ্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে তার কাঙ্ক্ষিত নোডে পৌঁছে যায়।

রিং টপোলজির সুবিধা

১. এই টপোলজিতে হোস্ট কম্পিউটার বা কেন্দ্রীয় সার্ভারের দরকার হয় না।
২. সংকেত প্রবাহ একমুখী হওয়ায় ডেটা কলিশন বা সংঘর্ষ হয় না।
৩. প্রতিটি কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সমিশনে সমান গুরুত্ব পায়।
৪. তারের পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়, তাই বাস্তবায়ন খরচ কম।

রিং টপোলজির অসুবিধা

১. এই টপোলজিতে সংকেত আদান-প্রদান অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।
২. একমুখী বৃত্তাকার পথে সংযুক্তির কারণে একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারকে সরাসরি ডেটা প্রেরণ করতে সমর্থ হয় না এবং কোনো নোড অকার্যকর হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে।
৩. কোনো নতুন কম্পিউটার সংযোজন বা বিয়োজনে পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
৪. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়ালে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময়ও বেড়ে যায়।
৫. এই টপোলজি নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিল সফটওয়্যারের দরকার হয়।

স্টার টপোলজি (Star Topology)

যে টপোলজিতে কম্পিউটার বা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন- প্রিন্টার, সরাসরি একটি হাব বা সুইচের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে স্টার টপোলজি বলে। এ পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো এই হাব বা সুইচের মাধ্যমে একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগ ও ডেটা আদান-প্রদান করে। ফলে সংকেত আদান-প্রদানে কম সময় প্রয়োজন হয় এবং সংকেত সংঘর্ষের আশঙ্কা কম থাকে। সংকেত প্রবাহ দ্বিমুখী হয়। হাব বা সুইচ বা সার্ভার দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত স্টার টপোলজির নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা শনাক্ত করা সহজ হয়। সাধারণত এই টপোলজিতে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা গেলেও টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহারের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।
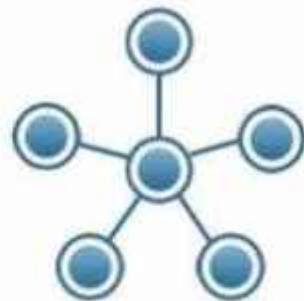
চিত্র 2.36: স্টার টপোলজি

স্টার টপোলজির সুবিধা

১. অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান হয়।
২. সংকেত সংঘর্ষ ঘটার আশঙ্কা কমায়।
৩. সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সচল রেখেই যে কোনো সময়ে নেটওয়ার্কে নতুন নোড যুক্ত করা যায়।
৪. কোনো নোড বিচ্ছিন্ন বা অচল হলেও নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ সচল থাকে।
৫. সুইচ ব্যবহারের কারণে বাস বা রিং টপোলজির তুলনায় এর ডেটা নিরাপত্তা বেশি।
৬. কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি স্বাভাবিক থাকে।

স্টার টপোলজির অসুবিধা

১. হাব বা সুইচ বা সার্ভার অচল হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অকেজো হয়ে পড়ে।
২. প্রতিটি নোডের জন্য পৃথক পৃথক তারের প্রয়োজন হয়। তাই এতে অপেক্ষাকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় বেশি।
৩. নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পরের মধ্যে সরাসরি তথ্য বা ডেটা আদান-প্রদানে সক্ষম হয় না।

ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

ট্রি টপোলজিতে কম্পিউটার বা নোডগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায় বিন্যস্ত ও যুক্ত থাকে। এতে একাধিক স্তরের কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটার বা সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকে। এই হোস্ট কম্পিউটারের সাথে স্তর বিন্যাস বা হায়ারারর্কি (Hierarchy) অনুসারে বিভিন্ন স্তরের ডিভাইস নেটওয়ার্ক হাব বা সুইচের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এজন্য এটিকে হায়ারারর্কিক্যাল টপোলজিও বলা হয়। এ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি স্তরের কম্পিউটার তার পরবর্তী স্তরের কম্পিউটারের জন্য অন্তর্বর্তী হোস্ট কম্পিউটার হিসেবে কাজ করে। যে কম্পিউটারের পরে আর কোনো কম্পিউটার যুক্ত হয় না সেই কম্পিউটারকে পেরিফেরাল টার্মিনাল বা প্রান্তীয় কম্পিউটার বলে। ট্রি টপোলজির নেটওয়ার্ক সহজেই সম্প্রসারণ করা যায়। এক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহ হয় দ্বিমুখী।

চিত্র 2.37: ট্রি টপোলজি

ট্রি টপোলজির সুবিধা

১. যে কোনো সময়ে নতুন শাখা সৃষ্টি করে এর নেটওয়ার্ক সহজেই সম্প্রসারিত করা যায়।
২. বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গঠনে অন্যান্য টপোলজির তুলনায় এটি বেশি সুবিধা প্রদান করে।
৩. কোনো নোড বিচ্ছিন্ন বা নতুন নোড যুক্ত করা হলে নেটওয়ার্ক কার্যক্রম ব্যাহত হয় না।
৪. ডেটা নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি।
৫. নেটওয়ার্কের কোনো শাখা নষ্ট হলে, সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে না।

ট্রি টপোলজির অসুবিধা

১. প্রধান কম্পিউটার নষ্ট হলে সমগ্র নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
২. অন্যান্য টপোলজির তুলনায় জটিল প্রকৃতির।
৩. বাস্তবায়ন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি।
৪. অন্তর্বর্তী কম্পিউটারগুলো অচল হলে নেটওয়ার্কের অংশবিশেষ অকেজো হয়ে পড়ে।

মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

যে টপোলজিতে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত অন্য প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে তাকে মেশ টপোলজি বলা হয়। এতে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর সাথে সরাসরি অপেক্ষাকৃত দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। এতে কেন্দ্রীয় সার্ভার বা ডিভাইসের দরকার পড়ে না। এই নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (পিয়ার-টু-পিয়ার) লিংক বলা হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আন্তঃসংযুক্ত (Completely interconnected) টপোলজি নামেও পরিচিত। প্রচুর পরিমাণ তারের প্রয়োজন এবং বেশি কম্পিউটার ব্যবহৃত হওয়ায় এই টপোলজি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর জটিল কনফিগারেশনের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত এটি ব্যবহার করা হয় না।
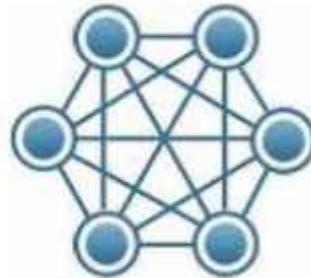
চিত্র 2.34: মেশ টপোলজি

এই টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য প্রতিটি নোডে (n-1) টি সংযোগের প্রয়োজন হয়। নেটওয়ার্কে মোট তারের সংখ্যা হবে $\frac{n(n-1)}{2}$ । ডেটা যোগাযোগের নির্ভরশীলতাই যেখানে মুখ্য, সেসব ক্ষেত্রে মেশ টপোলজি ব্যবহার করা হয়। যেমন– প্রতিরক্ষা বা ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে।

মেশ টপোলজির সুবিধা

১. অন্যান্য সব ধরনের টপোলজির তুলনায় এতে ডেটা ট্রান্সমিশন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।
২. নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কমে না।
৩. নেটওয়ার্কস্থ যেকোনো কম্পিউটার নষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হলেও নেটওয়ার্ক সচল থাকে।
৪. কোনো সংযোগ তার নষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হলে বিকল্প সকল কম্পিউটারে ডেটা আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে।
৫. নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।

মেশ টপোলজির অসুবিধা

১. বেশি পরিমাণ তার ও অতিরিক্ত লিংক প্রয়োজন হওয়ায় এটি ব্যয়বহুল।
২. নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন অত্যন্ত জটিল।
৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়ের পরিমাণও বেড়ে যায়।

২০১৪-২০১৫

হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

স্টার, রিং, বাস, মেশ প্রভৃতি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড টপোলজি বলে। বিশেষ কোনো কাজের ক্ষেত্রে একটিমাত্র টপোলজি স্বয়ংসম্পূর্ণ না-ও হতে পারে।
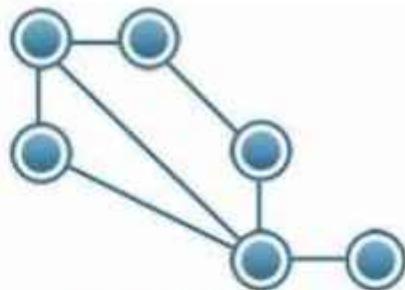
চিত্র 2.39: হাইব্রিড টপোলজি

এজন্য এসব ক্ষেত্রে হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহৃত হয়। হাইব্রিড টপোলজির উপর ভিত্তি করে ইন্টারনেট গঠন করা হয়েছে। কেননা এতে প্রায় সব ধরনের টপোলজির নেটওয়ার্কই সংযুক্ত আছে। হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা নির্ভর করে ঐ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টপোলজির উপর।

হাইব্রিড টপোলজির সুবিধা

১. এতে হাব বা সুইচ যুক্ত করে প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা যায়।
২. এই নেটওয়ার্কের ট্রাবল শুটিং সহজতর।
৩. একটি টপোলজি নষ্ট হলে অন্য কোনো টপোলজির উপর প্রভাব পড়ে না।
৪. যেহেতু এটি মিশ্র টপোলজি তাই এতে ব্যবহৃত টপোলজিগুলোর সুবিধাগুলোও এতে অন্তর্নিহিত থাকে।

হাইব্রিড টপোলজির অসুবিধা

১. টপোলজির সংখ্যা বেশির কারণে এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া জটিল।
২. এই টপোলজির ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল প্রকৃতির।
৩. মিশ্র টপোলজি হিসেবে এতে ব্যবহৃত টপোলজিগুলোর অসুবিধাগুলোও এতে অন্তর্নিহিত থাকে।

২.৫.৭ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

আমরা সবাই জানি, তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের দরুন আজকের যুগে আমরা নিজের ঘরের কোণে বসে নিজস্ব ছোট্ট কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে একটি বিশালাকার কম্পিউটারকে ভাড়ার মাধ্যমে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেই কম্পিউটারে সংরক্ষণও করতে পারি। এই বিশালাকার কম্পিউটারের ধারণাটিই ক্লাউড কম্পিউটিং।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগত সবকিছুই চলছে এই ক্লাউড কম্পিউটিং ধারণার উপর ভিত্তি করে। 'ক্লাউড' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো ব্যবহারকারী পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিশাল তথ্যভান্ডার দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে পারেন। আমরা বর্তমানে যারা কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করি তাদের প্রায় সবারই Facebook, E-mail বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আমরা ইচ্ছানুযায়ী এসব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্টেটাস দিচ্ছি কিংবা মেইল আদান-প্রদান করে থাকি। এসব সেবা গ্রহণের জন্য আমাদেরকে কোনো টাকা খরচ করতে হয় না। কেননা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইসব সার্ভিস বা সেবা প্রদানকারী বেশকিছু কোম্পানির বিপলু সংখ্যক সার্ভার রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা অসংখ্য ক্লায়েন্টকে একই সময়ে সার্ভিস প্রদান

করে যাচ্ছেন। আবার কিছু সংখ্যক সার্ভিস রয়েছে যেগুলো অর্থের বিনিময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা দান করে থাকেন। বিনামূল্যের এবং অর্থের বিনিময়ে উভয় প্রকার সার্ভিস ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে কম্পিউটার রিসোর্স যেমন– হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকে, ক্রেতা বা ব্যবহারকারী নিজস্ব কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভিসদাতা সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কম্পিউটিংয়ের কাজ সমাধা করে থাকে। ক্লাউড কম্পিউটিংকে সমন্বিত টেকনোলজি হিসেবে গণ্য করা হয়, যার দ্বারা ব্যবহারকারী এবং সার্ভিস প্রদানকারী উভয়ই ব্যাবসায়িকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন।

ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud) : একক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় কিংবা থার্ড পার্টির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় যাতে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এ ধরনের ক্লাউডকে প্রাইভেট ক্লাউড বলে। এ সব পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তবে অনেক বড়ো প্রতিষ্ঠানের অনেক শাখায় ডেটা সেন্টার না বসিয়ে একটিমাত্র ক্লাউড ডেটা সেন্টার স্থাপন করলে প্রতিষ্ঠানটির জন্য সাশ্রয়ী হয়।

পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud) : জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্লাউডকে পাবলিক ক্লাউড বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলের বিনামূল্যে বা স্বল্প ব্যয়ে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, স্টোরেজ এবং অন্যান্য রিসোর্স ইত্যাদির সার্ভিসযুক্ত ক্লাউড-ই পাবলিক ক্লাউড। Amazon, Microsoft এবং Google ইত্যাদি তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টারে পাবলিক ক্লাউডের অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে।

হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud) : দুই বা ততোধিক ধরনের ক্লাউডের (প্রাইভেট, পাবলিক বা কমিউনিটি) সংমিশ্রণই হলো হাইব্রিড ক্লাউড। বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড পৃথক বৈশিষ্ট্যের হলেও এক্ষেত্রে একই সাথে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। ক্লাউড সার্ভিসের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য একাধিক ক্লাউডকে একীভূত করা হয়ে থাকে।

২.৫.৮ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধা (Advantages of Cloud Computing)

ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এ সব সার্ভিস মডেলকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

অবকাঠামোগত সেবা (IaaS: Infrastructure as a service) : এই মডেলে অবকাঠামো ভাড়া দেওয়া হয়। অ্যামাজন– এর ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড (EC2) এরকম একটি মডেল। EC2 -এর প্রতিটি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিনে চলে, ক্রেতারা এগুলোই ভাড়া নিয়ে থাকেন। ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়াল মেশিনে নিজেদের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নিজের নিয়ন্ত্রণে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালাতে পারেন।

প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (PaaS: Platform as a service) : এই মডেলে ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেওয়া হয় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এক্সিকিউশন পরিবেশ, ডেটাবেজ এবং ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি। এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারী স্বল্প ব্যয়ে তার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে পারেন। Microsoft–এর Azure এবং Google–এর App Engine এই মডেলের উদাহরণ।

সফটওয়্যারভিত্তিক সেবা (SaaS: Software as a service) : এই মডেলে ব্যবহারকারীরা সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা সফটওয়্যার ও ডেটাবেজে অ্যাকসেস এবং ব্যবহারে সুযোগ পায়। এর ফলে

ব্যবহারকারীকে সিপিইউ বা স্টোরেজের অবস্থান, কনফিগারেশন ইত্যাদি জানা বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। Google Apps, Dropbox, Hubspot ইত্যাদি এই মডেলের উদাহরণ।

নেটওয়ার্কভিত্তিক সেবা (NaaS: Network as a Service) : এটি এমন একটি মডেল, যেখানে গ্রাহকরা তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনের পরিবর্তে ক্লাউড বিক্রেতার কাছ থেকে নেটওয়ার্ক পরিষেবাগুলো ভাড়া নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ আর্যাকা এবং পার্টিনো সংস্থা দুটি WAN এবং SVPN (Secure Virtual Private Network) সেবা প্রদান করে থাকে।

এ ছাড়াও ক্লাউড সার্ভিসের ব্যবহারকারীরা নিচের সুবিধাগুলো ভোগ করে থাকে :

যত চাহিদা তত সার্ভিস (Resource Flexibility/Scalability) : ছোট কিংবা বড় যে কোনো ক্রেতার সব রকম চাহিদা মেটানো হবে, ক্রেতা যত চাইবে সার্ভিসদাতা তত পরিমাণে সার্ভিস দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছে অনুযায়ী চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

যখন চাহিদা তখন সার্ভিস (On Demand) : ক্রেতা যখনই চাইবে সার্ভিসদাতা তখনই সার্ভিস দিতে পারবে। ক্রেতা যে সময় ইচ্ছে সার্ভিস চাইতে পারবে এবং সে সময়ই সার্ভিসদাতা তার চাহিদা পূরণ করবে।

যখন ব্যবহার তখন মূল্য শোধ (Pay as you go) : ক্রেতাকে আগে থেকেই কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যতটুকু ব্যবহার করবে, শুধু ততটুকুর জন্যই মূল্য পরিশোধ করবে।

উদ্যোক্তাদের সুযোগ (Opportunity for Entrepreneurs) : সার্বক্ষণিক ব্যবহারযোগ্য ক্লাউড সার্ভিস ছোট ও প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের জন্য সহজেই ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গা থেকে ডেটা আপলোড ও ডাউনলোড করা যায়। নিজস্ব হার্ডওয়্যার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। শুধু তাই নয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট হয় বলে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, লাইসেন্স ফি ইত্যাদির জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পরিচালনা ব্যয় কম এবং স্বল্প সংখ্যক ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল দিয়েও অনেক কাজ করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে পৃথিবীর প্রযুক্তির জগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে সত্যি, কিন্তু একই সাথে এটি তথ্যের জগতে বিশাল নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এই সার্ভিসে আপলোড করা তথ্য কোথায় সংরক্ষিত এবং প্রক্রিয়াকরণ হয়, তা ব্যবহারকারী জানতে পারে না। সেই তথ্য বা ডেটার উপর এবং প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের উপর ব্যবহারকারীর একক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা কম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডেটা স্থানান্তরের হার কোনটি?

ক. ব্যান্ড মিটার
খ. ব্যান্ডউইথ
গ. ডেটা ট্রান্সমিশন
ঘ. ডেটা কানেকশন

২. গ্রুপ SMS হলো–

ক. ইউনিকাস্ট
খ. মাল্টিকাস্ট
গ. ব্রডকাস্ট
ঘ. টেলিকাস্ট

৩. নিচের কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব?

ক. হাব
খ. সুইচ
গ. রিপিটার
ঘ. NIC

৪. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে-

i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি
ii. ডেটার বিটের বিন্যাস ও সংযুক্ত অতিরিক্ত বিট
iii. ব্যান্ডউইথের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য-

i. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
ii. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
iii. একের অধিক কম্পিউটারের সংযোগ সাধন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হুমায়রা তার বাবার অফিসে গিয়ে দেখল তার বাবা নিজের টেবিলে বসে কম্পিউটার প্রিন্ট কমান্ড দিলেন এবং তার থেকে কিছু দূরে অবস্থিত অফিসারও একই সাথে প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে একই প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট নিলেন। হুমায়রার বাবা নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে বিদেশে অবস্থানরত একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বললেন।

২০২৪-২০২৬

৬. উদ্দীপকে নেটওয়ার্কের ধরন হচ্ছে–

i. LAN
ii. WAN
iii. MAN

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব–

i. ক্ষুদ্র ডিভাইসে অধিক সেবা
ii. গ্রাহকদের সাথে সহজ যোগাযোগ
iii. ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি রুমে থাকা ল্যাপটপগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক হবে কোনটি?

ক. WPAN খ. WLAN গ. WMAN ঘ. WWAN

৯. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটির ল্যাপটপগুলো সংযুক্ত-

i. ক্যাবলের মাধ্যমে
ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
iii. ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কামাল রেজা সাহেব ঢাকায় অবস্থিত তার অফিসের বিভিন্ন শাখায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য কয়েকটি কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। এখন তিনি ডেটার গতি বৃদ্ধির জন্য কমিউনিকেশনের মাধ্যম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১০. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি?

ক. PAN খ. LAN
গ. MAN ঘ. WAN

১১. কামাল রেজা সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হবে?

ক. বাস্তবায়ন খরচ হ্রাস পাবে খ. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাবে
গ. বেশি শক্তি ব্যবহৃত হবে ঘ. প্রতিস্থাপন সহজ হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'Y' কলেজে মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের ৩টি আলাদা ভবন রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে তাদের কম্পিউটারের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিটি বিভাগকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিভাগগুলোর দূরত্ব বেশি হওয়ায় মাধ্যম হিসেবে ক্যাবল ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না।

ক. ব্যান্ডউইথ কী?
খ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'Y' কলেজটির বর্তমান নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি নির্বাচন করা উচিত– যুক্তিসহ মতামত দাও।

২.

চিত্র-1 চিত্র-2 চিত্র-3
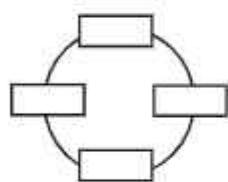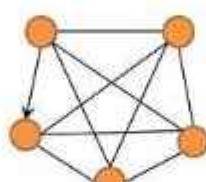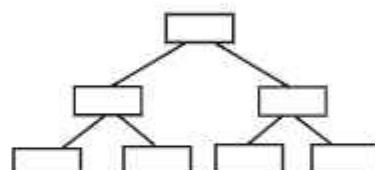
ক. মডুলেশন কী?
খ. ডেটা ট্রান্সফার মোড ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হলে যে টপোলজি তৈরি হবে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র ২ ও চিত্র ৩ নম্বর টপোলজিগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক হবে– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩. স্বপ্না তার অফিসের দ্বিতীয় তলায় বন্ধু আরিফের সাথে বিনা খরচে তথ্য শেয়ারিং করছিলেন। এমন সময় পঞ্চম তলার তার সহকর্মী একটি ফাইলের তথ্য দেখতে চাইলে তিনি সিটে বসেই নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সহকর্মীর কম্পিউটারে তা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে স্বপ্না ফাইলের তথ্য বিদেশে অবস্থানরত ক্রেতার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করেন।

ক. ফুল ডুপ্লেক্স কী?
খ. ডেটা ব্লক যা প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিশন হয়, ব্যাখ্যা কর।
গ. স্বপ্নার বন্ধু আরিফের সাথে তথ্য শেয়ারিংয়ে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তথ্য পাঠাতে আরিফের ব্যবহৃত নেটওয়ার্কের মধ্যে দ্বিতীয়টিই উত্তম– মতামত দাও।

৪. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তলার অনেকগুলো কাম্পউটার একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলো। কিছুদিন পর বিশেষ একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় অন্য কম্পিউটারগুলো থেকে তথ্য আদান-প্রদানে জটিলতা দেখা দিল।

ক. NIC কী?
খ. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন টপোলজি ব্যবহার করেছিল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জটিলতা এড়াতে কোন টপোলজি ব্যবহার করা প্রয়োজন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়
সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number Systems and Digital Devices

আন্তর্জাতিক রোবটিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমরা সবাই জানি আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে কম্পিউটার এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির অবদান সবচাইতে বেশি। একসময় যে কম্পিউটারটি বসানোর জন্য একটি পুরো বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হতো এখন তার চাইতেও শক্তিশালী একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে তৈরি একটি মোবাইল ফোন আমরা আমাদের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এই কম্পিউটার এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইলেকট্রনিক্সের যে শাখার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি দুইভিত্তিক বাইনারি সংখ্যা এবং বুলিয়ান অ্যালজেবরা নামে বিস্ময়করভাবে সহজ একটি গাণিতিক কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়গুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে;
- সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে;
- বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে;
- বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে;
- চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে;
- কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে;
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে;
- লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যাবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে;
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩.১ সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত ভাষা এবং একই সাথে সংখ্যাকেও ব্যবহার করি। আমাদের প্রয়োজনের কারণে ভাষার সাথে সাথে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, অনেক প্রাণী এবং পাখিও অল্প কিছু গুনতে পারে। শুনে অবাক হয়ে যেতে হয় যে এখনো পৃথিবীর গহিন অরণ্যে এমন আদিবাসী মানুষ আছে, যাদের জীবনে সংখ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না বলে সেভাবে গুনতে পারে না। ব্রাজিলের পিরাহা নামের আদিবাসীরা এক এবং দুই থেকে বেশি গুনতে পারে না। এর চাইতে বেশি যে কোনো সংখ্যা হলেই তারা বলে 'অনেক'।

আদিম মানুষ যখন শিকারি হিসেবে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত তখন হিসেব রাখা বা গোনার সেরকম প্রয়োজন ছিল না। যখন তারা কৃষিকাজ করার জন্য থিতু হয়েছে, গবাদি পশু পালন করতে শুরু করেছে, শস্যক্ষেত্রে চাষাবাদ করেছে, গ্রাম, নগর-বন্দর গড়ে তুলেছে, রাজস্ব আদায় করা শুরু করেছে তখন থেকে গোনার প্রয়োজন শুরু হয়েছে। সেজন্য সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস এবং সভ্যতার ইতিহাস খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমাদের প্রয়োজনের কারণে এখন আমরা অনেক বড় বড় সংখ্যা ব্যবহার করতে পারি, গণিতের সাহায্যে সেগুলো নানাভাবে প্রক্রিয়া করতে পারি।

আদিমকালে মানুষেরা গাছের ডাল বা হাড়ে দাগ কেটে কিংবা কড়ি, শামুক বা নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে সংখ্যার হিসাব রেখেছে। তবে যখন আরো বড় সংখ্যা আরো বেশি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়েছে তখন সংখ্যার একটি লিখিত রূপ বা চিহ্ন সৃষ্টি করে নিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মোটামুটি একই সময়ে সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান এবং মিশরীয় সভ্যতার শুরু হয় এবং এই দুই জায়গাতেই সংখ্যার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া গেছে। সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা ছিল ষাটভিত্তিক এবং মিশরীয় সংখ্যা ছিল দশভিত্তিক। ব্যবলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতির রেশ পৃথিবীতে এখনো রয়ে গেছে, আমরা মিনিট এবং ঘণ্টার হিসেব করি ষাট দিয়ে এবং কোণের পরিমাপ করি ষাটের গুণিতক দিয়ে। সুমেরিয়ান- ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল, মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে ছিল না। দুই পদ্ধতিতেই কোনো কিছু না থাকলে সেটি বোঝানোর জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হতো কিন্তু সেটি মোটেও গাণিতিক সংখ্যা শূন্য ছিল না।

পরবর্তীকালে আরো তিনটি সভ্যতার সাথে সাথে সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে ওঠে, সেগুলো হচ্ছে মায়ান সভ্যতা, চীন সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতা। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল কুড়িভিত্তিক, চীন এবং ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল দশভিত্তিক। (আমাদের দেশে যেসব মানুষ লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি তারা কাজ চালানোর জন্য মৌখিকভাবে কুড়িভিত্তিক এক ধরনের সংখ্যা ব্যবহার করে থাকে।) মায়ান এবং ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহার করে। প্রয়োজনের কারণে সব সংখ্যা পদ্ধতিতেই শূন্যের জন্য একটি চিহ্ন থাকলেও প্রকৃত অর্থে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে ধরে সেটিকে সংখ্যা পদ্ধতিতে নিয়ে এসে গণিতে ব্যবহার করে ভারতীয়রা এবং এই শূন্য আবিষ্কারকে আধুনিক গণিতের একটি অন্যতম যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মায়ান এবং চীন সংখ্যা পদ্ধতি মাত্র দুই-তিনটি (চিত্র 3.1) চিহ্ন ব্যবহার করে লেখা হতো। কিন্তু হাতে লেখার সময় পাশাপাশি অসংখ্য চিহ্ন বসানোর বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে 1 থেকে 9 পর্যন্ত নয়টি এবং শূন্যের জন্য একটি চিহ্ন- এভাবে দশটি চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করে। আমরা এই চিহ্নগুলোকে অঙ্ক বা Digit বলি।

২৫০০ বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলানিয়ান এবং মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তাদের পূর্ণাঙ্গ ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। রোমানরা গ্রিক সভ্যতার পতন ঘটানোর পর গণিতের অভূতপূর্ব বিকাশ থেমে যায়। রোমান সাম্রাজ্যে গণিতের সেরকম প্রয়োজন ছিল না। তাদের সংখ্যাগুলোতে আলাদা রূপ ছিল না এবং রোমান অক্ষর দিয়ে সেগুলো প্রকাশ করা হতো। অনাবশ্যকভাবে জটিল এবং অবৈজ্ঞানিক রোমান সংখ্যা এখনো বেঁচে আছে এবং ঘড়ির ডায়াল বা অন্যান্য জায়গায় মাঝে মাঝে আমরা তার ব্যবহার দেখতে পাই।

Hindu-Arabic	Roman	Greek	Egyptian	Babylonian	Chinese	Mayan
0				[illegible]	0	[illegible]
1	I	A	I	Y	I	•
2	II	B	II	YY	II	••
3	III	Γ	III	YYY	III	•••
4	IV	Δ	IIII	[illegible]	IIII	••••
5	V	E	[illegible]	[illegible]	IIIII	—
6	VI	F	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	VII	Z	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	VIII	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	IX	Θ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	X	I	∩	‹	—	=
50	L	N	∩∩∩∩∩	‹‹‹‹‹	[illegible]	[illegible]
100	C	P	e	Y‹‹‹‹	100	

চিত্র 3.1 : বিভিন্ন প্রাচীন সংখ্যা

ইসলামি সভ্যতার বিকাশ হওয়ার পর ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, যেটি আমাদের আধুনিক দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। এই সংখ্যা পদ্ধতিকে Hindu-Arabic সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এখানে উল্লেখ্য যে শূন্য ব্যবহারের ফলে সংখ্যা পদ্ধতিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি হলেও খ্রিষ্টীয় শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করায় দীর্ঘদিন সেটাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল!

আমাদের হাতে দশ আঙুল থাকার কারণে দশভিত্তিক সংখ্যা গড়ে উঠলেও দুই, আট কিংবা ষোলোভিত্তিক সংখ্যাও আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

সংখ্যাকে প্রকাশ করার এবং গণনা করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই প্রতীকগুলোকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়।

৩.২.১ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

সংখ্যা পদ্ধতিকে নন-পজিশনাল এবং পজিশনাল এই দুটি মূল পদ্ধতিতে ভাগ করা যায় :

নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্নগুলো যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকবে। রোমান সংখ্যা হচ্ছে নন-পজিশনাল (Non positional) সংখ্যার উদাহরণ। যেমন– রোমান সংখ্যায় 5 বোঝানোর জন্য V ব্যবহার করা হয়। V, VI কিংবা VII এই তিনটি উদাহরণে V তিনটি ভিন্ন জায়গায় বসেছে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই V চিহ্নটি 5 বুঝিয়েছে। তথা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির ন্যায় V যতই ডান হতে বাম দিকে সরতে (স্থান পরিবর্তন) থাকুক না কেন তার স্থানীয় মানের (একক, দশক, শতক ইত্যাদির ন্যায়) কোনো পরিবর্তন হয় না। এর কারণ হলো নন-পজিশনাল (অস্থানিক) সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানিক মানের অনুপস্থিতি। প্রাচীনকালে যখন সংখ্যাতত্ত্ব সেভাবে গড়ে ওঠেনি তখন নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে চিহ্ন বা প্রতীকটিকে কোন অবস্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর মানটি নির্ভর করে। আধুনিক সংখ্যাতত্ত্ব গড়ে ওঠার পর পজিশনাল (Positional) সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে। আমাদের প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ। কারণ 555 সংখ্যাকে ডান দিকের প্রথম অঙ্কটি 5 সংখ্যাকে বোঝালেও তার বামেরটি 50 এবং এর বামেরটি 500 সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে। এটি 10 ভিত্তিক সংখ্যা এবং প্রত্যেকটি অবস্থানের একটি মান রয়েছে। ডান দিকের প্রথম অঙ্কটির মান 1, বামেরটি 10, এর বামেরটি 100 এভাবে আগের অবস্থান থেকে আগের অবস্থান সবসময়েই 10 গুণ বেশি। যদি এটি 8 ভিত্তিক সংখ্যা হতো তাহলে পরের অবস্থান আগের অবস্থান থেকে 8 গুণ বেশি হতো। 16 ভিত্তিক সংখ্যা হলে প্রতিটি অবস্থান আগের অবস্থান থেকে 16 গুণ বেশি হতো।

নিচে কয়েকটি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া হলো।

বাইনারি সংখ্যা

আমরা সবাই দশভিত্তিক দশমিক সংখ্যার সাথে পরিচিত কিন্তু ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের জন্য দশভিত্তিক সংখ্যা খুব কার্যকর নয়, দশটি চিহ্নের জন্য দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভোল্টেজ ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা বাস্তবসম্মত নয়। দুটি চিহ্নের জন্য দুটি ভোল্টেজ লেভেল তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। সেজন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আসলে 2 ভিত্তিক বা বাইনারি (Binary) সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

দশমিক সংখ্যায় যেরকম 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9– এই দশটি চিহ্ন বা অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে, বাইনারি সংখ্যা ঠিক সেরকম 0 এবং 1 এই দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে। তবে সে কারণে কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি অঙ্ক ব্যবহার করা ছাড়া বাইনারি সিস্টেমে আর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোনো সংখ্যা এই বাইনারি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া এই বাইনারি সংখ্যা দিয়ে করা সম্ভব।

বাইনারি সংখ্যাতেও প্রত্যেকটি অঙ্কের একটি স্থানীয় মান রয়েছে। দশমিক সংখ্যায় স্থানীয় মান 10^0, 10^1, 10^2 ... এভাবে বেড়েছে, বাইনারি সংখ্যাতে 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 ... এভাবে বেড়েছে। ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য দশমিক বিন্দুর পর অঙ্কগুলো 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3} ... এভাবে কমছে, ঠিক সেরকম বাইনারি সংখ্যায় বাইনারি বিন্দু (বা র‍্যাডিক্স বিন্দু)'র পর অঙ্কগুলো 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3} ... এভাবে কমেছে। তুলনা করার জন্য নিচে দশমিক এবং বাইনারি সংখ্যার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

এখানে MSD ও LSD বলতে বোঝানো হয় Most ও Least Significant Digit এবং MSB ও LSB বলতে বোঝানো হয় Most ও Least Significant Bit। দশমিক সংখ্যাটির মতো বাইনারি সংখ্যাটির মান বের করার জন্য আসলে বাইনারি সংখ্যার সাথে তার স্থানীয় মান গুণ দিয়ে সব যোগ করে নিতে হবে।

$$11001.110_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2} + 0\times2^{-3}$$

$$= 16 + 8 + 4 + 0 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0$$

$$= 25.75_{10}$$

এখানে বাইনারি সংখ্যার জন্য সাবস্ক্রিপ্টে যে 2 এবং দশমিক সংখ্যার জন্য 10 লেখা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে তাদের ভিত্তি বা বেজ (Base)। কোনো সংখ্যাপদ্ধতিতে একটি সংখ্যা বোঝানোর জন্য সর্বমোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করতে হয়, সেটি হচ্ছে সংখ্যাটির ভিত্তি বা বেজ। দশমিক পদ্ধতির জন্য বেজ 10, বাইনারির জন্য বেজ 2, ঠিক সেরকম অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেল নামেও সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়, যাদের বেজ যথাক্রমে 8 এবং 16. সাধারণভাবে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সবসময় তার বেজ লেখার প্রয়োজন হয় না। তবে একই সাথে একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি থাকলে সংখ্যাটির পাশে তার বেজ লেখা থাকলে বিভ্রান্তির সুযোগ থাকে না।

এই অধ্যায়ে আমরা একটি ডিজিটাল সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলব যেখানে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হবে না, কাজেই আমরা আমাদের সকল আলোচনা শুধু পূর্ণ সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব।

টেবিল: 3.1

স্থানীয় মান				দশমিক সংখ্যা
$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

3.1 টেবিলে বাইনারি সংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যার পর্যায়ক্রম মানের একটা উদাহরণ দেয়া হলো।

অক্টাল সংখ্যা

অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি বা বেজ হচ্ছে 8 এবং এই সংখ্যার জন্য যে আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7। 3.2 টেবিলে 0 থেকে 16 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যা লিখে দেখানো হলো :

টেবিল : 3.2

দশমিক সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা	দশমিক সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা
0	0	8	10
1	1	9	11
2	2	10	12
3	3	11	13
4	4	12	14
5	5	13	15
6	6	14	16
7	7	15	17

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা

হেক্সাডেসিমেলের ভিত্তি হচ্ছে 16। কাজেই এটাকে প্রকাশ করার জন্য 16 টি অঙ্ক প্রয়োজন। ডেসিমেল দশটি সংখ্যা 0 থেকে 9 পর্যন্ত, এর পরের ৬টি অঙ্কের জন্য A, B, C, D, E এবং F এই ইংরেজি বর্ণকে ব্যবহার করা হয়। ৩.৩ টেবিলে দশমিক সংখ্যা এবং তার হেক্সাডেসিমেল রূপটি দেখানো হলো। একই টেবিলে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাগুলোর জন্য তার বাইনারি রূপটিও দেখানো হয়েছে। প্রতিটি হেক্সাডেসিমেল অঙ্কের জন্য চারটি করে বাইনারি বিটের প্রয়োজন হয়। সে কারণে হেক্সাডেসিমেল 10 কে বাইনারি 10000 না লিখে 00010000 হিসেবে লেখা হয়েছে।

টেবিল: 3.3

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা
0	0	0000	0
1	1	0001	1
2	2	0010	2
3	3	0011	3
4	4	0100	4
5	5	0101	5
6	6	0110	6
7	7	0111	7
8	8	1000	10
9	9	1001	11
10	A	1010	12
11	B	1011	13
12	C	1100	14
13	D	1101	15
14	E	1110	16
15	F	1111	17
16	10	00010000	20

৩.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Numbers)

বাইনারি থেকে দশমিক

আমরা বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় এবং দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি। নিচে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার আরেকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

$$(101101)_2 = 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1$$
$$= (45)_{10}$$

দশমিক থেকে বাইনারি

ঠিক একইভাবে একটি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে দশমিক সংখ্যাটিকে প্রথমে 2– এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে লিখতে হবে। যেরকম :

$$76 = 64 + 8 + 4 = 2^6 + 2^3 + 2^2$$

বাইনারি সংখ্যায় যেহেতু স্থানীয় মান রয়েছে, তাই প্রত্যেকটি স্থানীয় মানকে দেখাতে হবে। যেগুলো নেই তার জন্য 0 ব্যবহার করতে হবে।

$$(76)_{10} = 2^6 + 0 + 0 + 2^3 + 2^2 + 0 + 0 = 1001100_2$$

তবে যে কোনো সংখ্যাকে 2-এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে বের করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে ক্রমাগত 2 দিয়ে ভাগ করে যাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগফল শূন্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 2 দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে। ভাগশেষগুলো LSB থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে MSB পর্যন্ত বাইনারি সংখ্যাগুলো বের করে দেবে। যেরকম 25– এর জন্য :

25 কে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে	$\frac{25}{2}$	ভাগফল 12 এবং ভাগশেষ 1	(LSB)
ভাগফল 12 কে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে	$\frac{12}{2}$	ভাগফল 6 এবং ভাগশেষ 0	
ভাগফল 6 কে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে	$\frac{6}{2}$	ভাগফল 3 এবং ভাগশেষ 0	
ভাগফল 3 কে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে	$\frac{3}{2}$	ভাগফল 1 এবং ভাগশেষ 1	
ভাগফল 1 কে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে	$\frac{1}{2}$	ভাগফল 0 এবং ভাগশেষ 1	

বাইনারি সংখ্যা : (MSB) 1 1 0 0 1

পদ্ধতিটা বুঝে গেলে আমরা সেটাকে আরো সংক্ষেপে লিখতে পারি। যেরকম 37-এর জন্য আমরা লিখব :

		ভাগশেষ
2	37	
2	18 → 1	↑ (LSB)
2	9 → 0	
2	4 → 1	
2	2 → 0	
2	1 → 0	
	0 → 1	(MSB)

বাইনারি সংখ্যা : 100101

এই পদ্ধতিটি আমরা দশমিক থেকে অন্য যে কোনো ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্যও ব্যবহার করতে পারি। শুধু 2 -এর পরিবর্তে যে ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই সেই সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক হতে বাইনারিতে রূপান্তর :

দশমিক ভগ্নাংশকে ২ দ্বারা গুণ করতে হয় এবং গুণফলের পূর্ণ অংশটি সংরক্ষিত রেখে ভগ্নাংশকে পুনরায় ২ দ্বারা গুণ করতে হয়, এরপর পূর্ণ অঙ্ক হিসেবে প্রাপ্ত অঙ্কগুলো প্রাপ্তির ক্রমানুসারে পাশাপাশি লিখে দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ : $(0.46)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।

সমাধান :

প্রথম পদ্ধতি-

		.46
MSB ↓		× 2
	0	.92
		× 2
	1	.84
		× 2
	1	.86
		× 2
	1	.36
		× 2
LSB	0	.72

$\therefore (0.46)_{10} = (0.01110...)_2$

দ্বিতীয় পদ্ধতি-

.46	.92	.84	.86	.36
× 2	× 2	× 2	× 2	× 2
0.92	1.84	1.86	1.36	0.72
↓	↓	↓	↓	↓
0	1	1	1	0
MSB				LSB

$(0.46)_{10} = (0.01110...)_2$

দশমিক থেকে অক্টাল

এখানে আমরা আগে দেখানো ডেসিমেল থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের পদ্ধতিটি ব্যবহার করব, তবে অক্টাল সংখ্যার বেজ যেহেতু ৪ তাই 2 দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাগ করার পরিবর্তে ৪ দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাগ করা হবে। যেমন-710 কে অক্টালে রূপান্তর করার জন্য লিখব :

অক্টাল সংখ্যা : 1306

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক হতে অক্টালে রূপান্তর :

দশমিক ভগ্নাংশকে ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অংশটি সংরক্ষিত রেখে গুণফলের ভগ্নাংশকে পুনরায় ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে এরপর পূর্ণ অঙ্ক হিসেবে প্রাপ্ত অঙ্কগুলো প্রাপ্তির ক্রমানুসারে পাশাপাশি লিখে দশমিক সংখ্যাটির সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ: $(123.45)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর কর।

সমাধান :

পূর্ণ অংশ- অবশিষ্ট (Remainer)

$\therefore (123.45)_{10} = (173.34631......)_8$

ভগ্নাংশ

MSB ↓ LSB

	.45
	× 8
3	.60
	× 8
4	.80
	× 8
6	.40
	× 8
3	.20
	× 8
1	.60

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে অক্টাল হতে দশমিকে রূপান্তর :

ভগ্নাংশের পর হতে অক্টাল বিন্দুর পর হতে -1, -2, -3 ইত্যাদি দ্বারা অবস্থান চিহ্নিত করে নিতে হয়। এর পর প্রতিটি ডিজিটকে 8^n দ্বারা গুণ করে গুণফলকে যোগ করে দশমিক সংখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে n হলো -1, -2, -3 ইত্যাদি।

উদাহরণ : $(123.45)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

সমাধান :

2 1 0 -1 -2

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

1 2 3 . 4 5

$$1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$
$$= 64 + 16 + 3 + 4/8 + 5/8^2$$
$$= 83 + 4/8 + 5/64$$
$$= 83 + 0.5 + 0.078125$$
$$= 83.578125$$
$$\therefore (123.45)_8 = (83.578125)_{10}$$

নিজে কর : ফাঁকা ঘরগুলোতে দশমিক 71 থেকে 90 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যায় লিখ এবং অক্টাল 41 থেকে 60 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যায় লিখ।

দশমিক	অক্টাল
71	107
72	110
73	
74	
75	

দশমিক	অক্টাল
76	
77	
78	
79	
80	

অক্টাল	দশমিক
41	
42	
43	
44	36
45	37

অক্টাল	দশমিক
46	
47	
50	
51	
52	

অক্টাল থেকে বাইনারি

অক্টাল সংখ্যার একটি বড় সুবিধা হচ্ছে যে, যেকোনো সংখ্যাকে খুব সহজে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায়। অক্টাল সংখ্যার অঙ্কগুলো হচ্ছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7 এবং এই প্রত্যেকটি সংখ্যাকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

Octal :	0	1	2	3	4	5	6	7
Binary :	000	001	010	011	100	101	110	111

এই রূপান্তরটি ব্যবহার করে যে কোনো অক্টাল সংখ্যাকে তার জন্য প্রযোজ্য তিনটি বাইনারি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করলেই পুরো অক্টাল সংখ্যার বাইনারি রূপ বের হয়ে যাবে। যেমন :

$$\begin{array}{lcccl} & 4 & 1 & 2 & \\ (412)_8 = & 100 & 001 & 010 & =(100001010)_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{lccccl} & 1 & 4 & . \; 5 & 3 & \\ (14.53)_8 = & 001 & 100 & 101 & 011 & = (001100.101011)_2 \end{array}$$

তবে নিচের উদাহরণে সর্ব বামে দুটি 0 রয়েছে এবং সেই দুটো লেখার প্রয়োজন নেই। তাই-

$$(14.53)_8 = (1100.101011)_2$$

বাইনারি থেকে অক্টাল

একই পদ্ধতির বিপরীত প্রক্রিয়া করে আমরা খুব সহজে যে কোনো বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারব। প্রথমে বাইনারি সংখ্যার অঙ্কগুলো তিনটি তিনটি করে ভাগ করে নিতে হবে। সর্ববামে যদি তিনটির কম অঙ্ক থাকে তাহলে এক বা দুইটি শূন্য বসিয়ে তিন অঙ্ক করে নিতে হবে। তারপর প্রতি তিনটি বাইনারি অঙ্কের জন্য নির্ধারিত অক্টাল সংখ্যাগুলো বসিয়ে নিতে হবে। যেমন :

$$\begin{array}{lccccl} (10100101011)_2 = & 010 & 100 & 101 & 011 & = (2453)_8 \\ & 2 & 4 & 5 & 3 & \end{array}$$

এখানে তিনটি করে মেলানোর জন্য সর্ববামে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে।

হেক্সাডেসিমেল থেকে ডেসিমেল

হেক্সাডেসিমেল থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর করার জন্য আমরা অঙ্কগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে একসাথে যোগ করে নেব। হেক্সাডেসিমেলের বেজ যেহেতু 16 তাই স্থানীয় মান হবে যথাক্রমে 16^0, 16^1, 16^2, 16^3 এরকম :

$$(356)_{16} = 3\times16^2 + 5\times16^1 + 6\times16^0 = 768 + 80 + 6 = (854)_{10}$$

$$(2AF)_{16} = 2\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0 = 512 + 160 + 15 = (687)_{10}$$

লক্ষ করতে হবে যে এখানে হেক্সাডেসিমেল A- এর পরিবর্তে 10 এবং F -এর পরিবর্তে 15 বসানো হয়েছে।

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমেল হতে দশমিকে রূপান্তর :

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমেল বিন্দুর পর হতে -1, -2, -3 ইত্যাদি দ্বারা অবস্থান চিহ্নিত করে নিতে হয়। এরপর প্রতিটি ডিজিটকে 16^n দ্বারা গুণ করে গুণফলকে যোগ করলে দশমিক সংখ্যা পাওয়া যায়। যেখানে n হচ্ছে -1, -2, -3 ইত্যাদি।

উদাহরণ : **$(AB.CD)_{16}$** কে দশমিকে রূপান্তর কর।

সমাধান:

$$A\,(10) \times 16^1 + B\,(11) \times 16^0 + C\,(12) \times 16^{-1} + D\,(13) + 16^{-2}$$

$$= 160 + 11 + \frac{12}{16} + \frac{13}{16^2}$$

$$= 171 + \frac{3}{4} + \frac{13}{256}$$

$= 171 + 0.75 + 0.0507$

$= 171.8007$

$\therefore (AB.CD)_{16} = (171.8007)_{10}$

দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেল

এখানেও আমরা বাইনারি কিংবা অক্টাল সংখ্যার জন্য আগে দেখানো পদ্ধতিটি ব্যবহার করব। তবে বেজ যেহেতু 16 তাই 2 কিংবা ৪ দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাগ করার পরিবর্তে 16 দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাগ করা হবে। ভাগশেষ যদি 10 কিংবা তার থেকে বেশি হয় তাহলে পরিচিত ডেসিমেল অঙ্কের পরিবর্তে যথাক্রমে A, B, C, D, E এবং F লিখতে হবে। এই পদ্ধতিতে 7106 কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ভাগশেষ হিসেবে 12 সংখ্যার জন্য C এবং 11 সংখ্যার জন্য হেক্সাডেসিমেল প্রতীক B লেখা হয়েছে।

16	7106	
16	444 - 2	(LSD)
16	27 - 12	
16	1 - 11	
	0 - 1	(MSD)

হেক্সাডেসিমেল: $1BC2_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক হতে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর :

দশমিক ভগ্নাংশকে ১৬ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অঙ্কটি সংরক্ষিত রেখে গুণফলের ভগ্নাংশকে পুনরায় ১৬ দ্বারা গুণ করতে হবে। তবে প্রাপ্ত ভগ্নাংশগুলো ৯ এর বেশি হলে প্রতিটি সংখ্যার সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেল মান লিখতে হবে। এরপর পূর্ণ অঙ্ক হিসেবে প্রাপ্ত অঙ্কগুলো প্রাপ্তির ক্রমানুসারে পাশাপাশি লিখলে উক্ত দশমিক সংখ্যাটির সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ : $(0.71)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর কর।

সমাধান :

প্রথম পদ্ধতি–

	.71
	×16
B (11)	.36
	×16
5	.76
	×16
C (12)	.16

$\therefore (0.71)_{10} = (0.B5C...)_{16}$

বিকল্প পদ্ধতি-

.71	.36	.76
× 16	× 16	× 16
11.36	5.76	12.16
↓	↓	↓
B	5	C

$\therefore (0.71)_{10} = (0.B5C...)_{16}$

হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি

অক্টাল সংখ্যার বেলায় আমরা প্রত্যেকটি অক্টাল অঙ্কের জন্য তিন বিট বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করেছিলাম। হেক্সাডেসিমেলের জন্য প্রতিটি হেক্সাডেসিমেল অঙ্কের জন্য চার বিট বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করা হবে।

	9	F	2	3	
$(9F23)_{16}$ =	1001	1111	0010	0011	$= (1001111100100011)_2$

সর্ববামে 0 থাকলে সেগুলোকে রাখার প্রয়োজন নেই।

বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল

এখানেও আগের মতো বাইনারি সংখ্যাগুলোকে চারটির সমন্বয় করে ভাগ করে নিতে হবে। সর্ববামে যদি চারটির কম বাইনারি অঙ্ক থাকে তাহলে সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 0 বসিয়ে চারটির গ্রুপ করে নিতে হবে। তারপর প্রতি চারটি বাইনারি সংখ্যার জন্য নির্ধারিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটি বসিয়ে দিতে হবে।

যেরকম :

$(10110111000011)_2 =$ 0010 1101 1100 0011 $= (2DC3)_{16}$
2 D C 3

হেক্সাডেসিমেলে যেহেতু চারটি বাইনারি অঙ্ক একটি হেক্সাডেসিমেল অঙ্ক দিয়ে প্রতিস্থাপন হয়, তাই অনেক বড় বাইনারি সংখ্যা লেখার জন্য হেক্সা অথবা অক্টাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

সমস্যা : হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 38 থেকে শুরু করে পরবর্তী 25টি সংখ্যা লিখ। হেক্সাডেসিমেল 38-এর দশমিক মান কত?

হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল কিংবা অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করার সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেয়া। তারপর হেক্সাডেসিমেলের জন্য চারটি করে এবং অক্টালের জন্য তিনটি করে বাইনারি অঙ্ক নিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত হেক্সাডেসিমেল অথবা অক্টাল সংখ্যাগুলো বেছে নেয়া। যেমন :

$(B2F)_{16} =$ 1011 0010 1111 = 101 100 101 111 $= (5457)_8$
B 2 F 5 4 5 7

এখানে $B2F_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর করার জন্য প্রথমে সংখ্যাটির তিনটি হেক্সাডেসিমেল অঙ্কের জন্য নির্ধারিত চারটি করে বাইনারি অঙ্ক ব্যবহার করে মোট 12টি বাইনারি অঙ্কে রূপান্তর করা হয়েছে। তারপর এই 12টি বাইনারি অঙ্ককে তিনটি করে মোট 4টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এবারে প্রতি গ্রুপের জন্য নির্ধারিত অক্টাল অঙ্কগুলো বসিয়ে 5457_8 পাওয়া গেছে। এভাবে তিনটি অঙ্কের গ্রুপ করার সময় প্রয়োজন হলে সর্ববামের গ্রুপটিতে একটি বা দুইটি বাড়তি 0 বসানো যেতে পারে।

৩.৩ বাইনারি যোগ বিয়োগ (Addition and Subtraction in Binary System)

বাইনারি সংখ্যা আমাদের পরিচিত দশমিক সংখ্যার মতোই একটি সংখ্যা পদ্ধতি। পার্থক্যটুকু হচ্ছে যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ভিত্তি 10 এবং বাইনারিতে ভিত্তি 2। কাজেই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা যেভাবে যোগ এবং বিয়োগ করতে পারি দশমিক পদ্ধতিতেও হুবহু সেভাবে যোগ এবং বিয়োগ করতে পারব। যেমন :

বাইনারি যোগ	বাইনারি বিয়োগ
101 100 101	101 100 101
11 001 001	11 001 001
1 000 101 110	10 011 100

তবে যেহেতু বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বড় ব্যবহার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে, তাই বাইনারি যোগ এবং বিয়োগের প্রয়োগের জন্য আলাদা কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ সংখ্যা যোগ-বিয়োগের বেলায় আমাদের কখনোই আমরা কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ কিংবা বিয়োগ করছি সেটি আগে থেকে জানার প্রয়োজন হয় না কিন্তু ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে বাইনারি যোগ-বিয়োগ করার সময় কত অঙ্কের

সংখ্যা যোগ করছি আগে থেকে জানতে হয়। কারণ সার্কিটটি যতগুলো বিট ধারণ করতে পারবে সংখ্যাটিতে তার থেকে বেশি সংখ্যক অঙ্ক থাকলে সেটি ব্যবহার করা যায় না। শুধু তাই নয় যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যা থেকে বিটের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেটিও সঠিকভাবে ফলাফল দেবে না। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে যেহেতু দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভোল্টেজ দিয়ে বাইনারি 0 এবং 1 অঙ্ক দুটি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই যাবতীয় গাণিতিক অঙ্কও এই অঙ্ক দুটো দিয়েই প্রকাশ করতে হবে।

অনেকে মনে করতে পারে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স করার জন্য বাইনারি সংখ্যা দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ এই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই করার ব্যবস্থা থাকতে হয়। আসলে একটি সংখ্যাকে নেগেটিভ করা এবং যোগ করার সার্কিট থাকলেই অন্য সব গাণিতিক প্রক্রিয়া করা যায়। কোনো একটি সংখ্যা বিয়োগ করতে হলে সংখ্যাটিকে নেগেটিভ করে যোগ করতে হবে। সংখ্যা দিয়ে গুণ করার পরিবর্তে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বার যোগ করলেই হয়। বার বার বিয়োগ করে ভাগের কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। তাই আমরা দেখব একটি সংখ্যাকে নেগেটিভ করার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানা থাকলে শুধু যোগ করার সার্কিট দিয়ে আমরা বিয়োগ, গুণ, এবং ভাগও করতে পারব।

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Numbers)

একটি বাইনারি সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে দেখানোর একটি সহজ উপায় হচ্ছে MSB টিকে সাইনের জন্য নির্ধারিত করে রাখা। যদি সেটি 0 হয় তাহলে বুঝতে হবে সংখ্যাটি পজিটিভ আর যদি সেটি 1 হয় তাহলে বুঝতে হবে সংখ্যাটি নেগেটিভ। কাজেই ৪ (আট) বিটের একটি সংখ্যার জন্যে 7টি বিট দিয়ে সংখ্যার মান প্রকাশ করা হবে এবং অষ্টম বিটটি সংখ্যার সাইন প্রকাশ করার জন্য আলাদাভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে সংখ্যা প্রকাশ করার সময় আরো একটি বিষয় সবসময় মেনে চলতে হয়। সংখ্যাগুলোর বিট সংখ্যা সবচেয়ে পরিপূর্ণ রাখতে হবে–এর মাঝে ফাঁকা অংশ থাকতে পারবে না। আট বিটের সংখ্যায় +1 লেখার সময় 01 লেখা যাবে না, 00000001 লিখতে হবে। প্রথম 0টি বোঝাচ্ছে সংখ্যাটি পজেটিভ, পরের সাত বিট দিয়ে 1 লেখা হয়েছে। একইভাবে -1 লিখতে হলে 11 লেখা যাবে না 10000001 লিখতে হবে। প্রথম 1টি বোঝাচ্ছে সংখ্যাটি নেগেটিভ পরের সাতটি বিট দিয়ে সংখ্যার মান (1) প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কিছু পজিটিভ এবং নেগেটিভ সংখ্যা লিখে দেখানো হলো :

এই পদ্ধতিতে সংখ্যাকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ হিসেবে প্রকাশ করায় একটি গুরুতর সমস্যা আছে। সমস্যাটি বোঝার জন্য আমরা নিচে চার বিটের দুটি সংখ্যা লিখছি, এক বিট সাইনের জন্য, বাকি তিন বিট মূল সংখ্যাটির মান বোঝানোর জন্য :

0000 এবং 1000

বোঝাই যাচ্ছে প্রথম সংখ্যাটি +0 এবং দ্বিতীয়টি -0 কিন্তু আমরা সবাই জানি, শূন্য (0) সংখ্যাটির পজিটিভ এবং নেগেটিভ হয় না- কিন্তু এই পদ্ধতিতে +0 এবং -0 মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। +0 এবং -0 এর অস্তিত্বটি কম্পিউটারে জটিল হিসেবে অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৩.৫ ২-এর পরিপূরক (2's Complement)

সাইন বিট দিয়ে সংখ্যার পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রকাশ করার জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি চমৎকার পদ্ধতি রয়েছে। সেটি হচ্ছে 2- এর পরিপূরক (2'S complement) বিষয়টি বোঝার আগে আমরা নেগেটিভ সংখ্যা বলতে কী বোঝাই সেটি বুঝে নেই। একটি সংখ্যার সাথে যে সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফল শূন্য হবে সেটিই হচ্ছে তার নেগেটিভ সংখ্যা। কাজেই আমাদেরকে কোনো একটি বাইনারি সংখ্যা দেওয়া হলে আমরা এমন আরেকটি বাইনারি সংখ্যা খুঁজে বের করব, যেটি যোগ করলে যোগফল হবে শূন্য।

আমরা আট বিটের একটি বাইনারি সংখ্যা দিয়ে শুরু করি। ধরা যাক সংখ্যাটি : 10110011। এবারে আমরা সংখ্যাটির 1- এর পরিপূরক (1's complement) নিই অর্থাৎ প্রত্যেকটি 1 কে 0 দিয়ে এবং 0 কে 1 দিয়ে পরিবর্তন করে নিই :

মূল সংখ্যা	10110011
1 -এর পরিপূরক	01001100
সংখ্যা দুটির যোগফল	11111111

এই বাইনারি সংখ্যাটি হচ্ছে আট বিটের সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর সাথে 1 যোগ করা হলে সংখ্যাটি আর আট বিটে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি হবে 9 বিটের একটি সংখ্যা।

```
 11111111
        1
---------
1 00000000
```

আমরা যেহেতু 8 (আট) বিটের সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই, তাই নবম বিটকে উপেক্ষা করে আমরা বলতে পারি সংখ্যাটি 00000000 বা শূন্য। যেহেতু একটা সংখ্যার সাথে শুধু তার নেগেটিভ সংখ্যা যোগ করা হলেই যোগফল হিসেবে আমরা শূন্য পাই, তাই আমরা বলতে পারি যে কোনো বাইনারি সংখ্যার 1 কে 0 এবং 0 কে 1 দিয়ে পরিবর্তন করে (বা 1-এর পরিপূরক নিয়ে) যে সংখ্যা পাব তার সাথে 1 যোগ করে নেয়া হলে সেটি মূল বাইনারি সংখ্যার নেগেটিভ হিসেবে কাজ করবে। এই ধরনের সংখ্যাকে বলা হয় মূল সংখ্যাটির 2- এর পরিপূরক।

আমরা এখন 10110011 -এর নেগেটিভ অথবা 2- এর পরিপূরক বের করতে পারি :

মূল সংখ্যা	10110011
1- এর পরিপূরক	01001100
1 যোগ	1
2- এর পরিপূরক	01001101

কাজেই আমরা বলতে পারি, আট বিটের একটি সংখ্যা হিসেবে 01001101 হচ্ছে 10110011 এর নেগেটিভ। একটি সংখ্যাকে একবার নেগেটিভ করে আবার সেটিকে নেগেটিভ করা হয় তাহলে আমরা আগের সংখ্যাটি ফিরে পাব। আমরা আমাদের এই উদাহরণটিতে সেটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। 01001101কে আবার 2- এর পরিপূরক করা হলে আমরা পাব :

মূল সংখ্যা	01001101
1– এর পরিপূরক	10110010
1 যোগ	1
2– এর পরিপূরক	10110011

আমরা সত্যি সত্যি মূল সংখ্যাটি ফিরে পেয়েছি, অর্থাৎ 01001101 এবং 10110011 হচ্ছে একটি আরেকটির নেগেটিভ।

এবারে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা 2– এর পরিপূরক বের করে যে কোনো বাইনারি সংখ্যাকে তার নেগেটিভ করতে পারব, কিন্তু মূল বাইনারি সংখ্যাটি শুরুতে কত ছিল সেটি কি আমরা জানি? যেমন ধরা যাক 1001 একটি চার বিটের বাইনারি সংখ্যা (যার দশমিক মান হচ্ছে 9), খুব সহজেই আমরা দেখাতে পারি 0111 হচ্ছে এর 2– এর পরিপূরক (যার দশমিক মান হচ্ছে 7)। অর্থাৎ এই সংখ্যা দুটি একে অপরের 2– এর পরিপূরক :

মূল সংখ্যা	1001	মূল সংখ্যা	0111
1 -এর পরিপূরক	0110	1 -এর পরিপূরক	1000
1 যোগ	1	1 যোগ	1
2 -এর পরিপূরক	0111	2 -এর পরিপূরক	1001

তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, চার বিটের একটি সংখ্যা হিসেবে আমরা কি 1001 কে +9 ধরে নিয়ে এর 2-এর পরিপূরক হিসেবে 0111কে -9 ধরে নেব? নাকি 0111কে +7 ধরে নিয়ে 2-এর পরিপূরক হিসেবে 1001কে -7 ধরে নেব? এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য একটি নিয়ম মেনে চলা হয়। নিয়মটি হচ্ছে MSB যদি 0 হয় শুধু তাহলেই সংখ্যাটি পজিটিভ হবে এবং বাইনারি সংখ্যাটি প্রকৃত মান দেখাবে। MSB যদি 1 হয় তাহলে সংখ্যাটি নেগেটিভ এবং শুধু 2– এর পরিপূরক নিয়ে তার প্রকৃত পজিটিভ মান বের করা যাবে।

এই পদ্ধতিতে কিছু সংখ্যার নেগেটিভ রূপ বের করে দেখানো হলো :

চার বিটের উদাহরণ :		আট বিটের উদাহরণ :	
$+6_{10}$ =	0110	$+83_{10}$ =	01010011
1 -এর পরিপূরক	1001	1 -এর পরিপূরক	10101100
1 যোগ	1	1 যোগ	1
2 -এর পরিপূরক -6_{10}	1010_2	2 -এর পরিপূরক -83_{10}	10101101

উদাহরণ : 50_{10} থেকে 25_{10} সংখ্যাটি 2– এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিয়োগ দাও।

উত্তর :

$(+25)_{10}$ =	$(0001\ 1001)_2$
1 এর পরিপূরক	1110 0110
1 যোগ	1
2 এর পরিপূরক $(-25)_{10}$	1110 0111

$(+50)_{10}$ =	$(0011\ 0010)_2$
$(-25)_{10}$ =	$(1110\ 0111)_2$
যোগফল	$(1\ 0001\ 1001)_2$

যোগফলে নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে, সেটিকে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

বাকি আট বিটের সংখ্যার MSB– এর মান 0, যার অর্থ সংখ্যাটি পজি ভ এবং আমরা জানি :
$0001\ 1001_2 = +25_{10}$ কাজেই উত্তরটি সঠিক।

উদাহরণ : 25_{10} থেকে 50_{10} সংখ্যাটি 2–এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিয়োগ দাও।

উত্তর :

$(+50)_{10}$ =	$(0011\ 0010)_2$
1 -এর পরিপূরক	1100 1101
1 যোগ	1
2 -এর পরিপূরক $(-50)_{10}$	1100 1110

$(+25)_{10}$ =	$(0001\ 1001)_2$
$(-50)_{10}$ =	$(1100\ 1110)_2$
যোগফল	$(1110\ 0111)_2$

যোগফলে আট বিটের সংখ্যার MSB- এর মান 1, যার অর্থ সংখ্যাটি নেগেটিভ। কাজেই 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে সংখ্যাটিকে আবার নেগেটিভ করে তার পজিটিভ মান বের করতে হবে।

যোগফল	1110 0111
1– এর পরিপূরক	0001 1000
1 যোগ	1
2– এর পরিপূরক	0001 1001

আমরা জানি$(00011001)_2 = (25)_{10}$ কাজেই প্রকৃত যোগফল $(-25)_{10}$, অর্থাৎ উত্তরটি সঠিক।

৩.৬ কোড (Code)

৩.৬.১ কোডের ধারণা (Concept of Code)

আমরা আগেই বলেছি কম্পিউটারের ভেতর ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালানোর জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভোল্টেজ দিয়ে যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স কাজকর্ম করা হয়। এই দুইটি ভোল্টেজের একটিকে 0 অন্যটিকে 1 হিসেবে বিবেচনা করে বাইনারি সংখ্যা হিসেবে যে কোনো সংখ্যাকে প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা সবাই জানি কম্পিউটারে শুধু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে সেগুলোকে নানা ধরনের প্রক্রিয়া করলেই হয় না সেখানে নানা ধরনের বর্ণ, শব্দ, চিহ্ন এগুলোকে প্রক্রিয়া করতে হয়। কম্পিউটার যেহেতু অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক সার্কিটে 0 এবং 1 ছাড়া অন্য অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক সার্কিটে কোনো কিছু প্রক্রিয়া করতে পারে না, তাই শব্দ চিহ্ন বর্ণ তাদের সবকিছুকেই প্রথমে এই 0 এবং 1 এ রূপান্তরিত করে নিতে হয়। বর্ণ, অক্ষর, শব্দ বা চিহ্নকে এভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে কোডিং করা বলা হয়ে থাকে। নিচে এই ধরনের প্রচলিত কয়েকটি কোডের উদাহরণ দেওয়া হলো।

৩.৬.২ কোডের উদাহরণ (Examples of Code)

বিসিডি (BCD)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ সবসময়ই দশমিক সংখ্যা দিয়ে করে থাকি। এই সংখ্যাকে কম্পিউটারে কিংবা ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার জন্য সেগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। কিন্তু দশমিক সংখ্যার বহুল ব্যবহারের জন্য এর দশমিক রূপটি যতটুকু সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য বিসিডি (BCD: Binary Coded Decimal) কোডিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দশমিক	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
বিসিডি	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

এই পদ্ধতিতে একটি দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে আলাদাভাবে চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যদিও চার বিটে 0 থেকে 15 এই 16টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু BCD কোডে 10 থেকে 15 পর্যন্ত এই বাড়তি ছয়টি সংখ্যা কখনোই ব্যবহার করা হয় না। দশমিক 10কে বাইনারিতে 1010 হিসেবে চার বিটে লেখা যায় কিন্তু বিসিডিতে 0001 0000 এই আট বিটের প্রয়োজন। নিচে BCD কোডের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

$(4578)_{10}$ 4 5 7 8

বিসিডি 0100 0101 0111 1000

উদাহরণ : 100100100110 বিসিডি কোডে লেখা একটি দশমিক সংখ্যা, সংখ্যাটি কত?

উত্তর : 100100100110 বিটগুলোকে চারটি করে বিটে ভাগ করে প্রতি চার বিটের জন্য নির্ধারিত দশমিক অঙ্কটি বসাতে হবে।

বিসিডি 1001 0010 0110

দশমিক 9 2 6

আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)

কম্পিউটারে সংখ্যার সাথে সাথে নানা বর্ণ, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। যে কোডিংয়ে সংখ্যার সাথে সাথে অক্ষর, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় সেগুলোতে আলফা নিউমেরিক কোড ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি আলফা নিউমেরিক কোডের উদাহরণ দেওয়া হলো।

ই বি সি ডি আই সি (EBCDIC)

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) একটি আট বিটের কোডিং। যেহেতু এটি আট বিটের কোড, কাজেই এখানে সব মিলিয়ে 256টি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করা সম্ভব। আই বি এম নামের একটি কম্পিউটার কোম্পানি তাদের কম্পিউটারে সংখ্যার সাথে সাথে অক্ষর যতিচিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য BCD–এর সঙ্গে মিল রেখে এই কোডটি তৈরি করেছিল। 1963 এবং 1964 সালে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল– অনেক প্রাচীন কাগজের কার্ডে গর্ত করে ইনপুট দিতে হতো। কাজেই EBCDIC তৈরি করার সময় কাগজে গর্ত করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছিল। সেই সময়ের কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার জটিলতা এখন আর নেই, কাজেই EBCDIC কোডটিরও কোনো গুরুত্ব নেই।

অ্যাসকি (ASCII)

ASCII হচ্ছে American Standard Code for Information Interchange কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি সাত বিটের একটি আলফানিউমেরিক কোড। এটি প্রাথমিকভাবে টেলিপ্রিন্টারে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে কম্পিউটারে এটি সমন্বয় করা হয়। সাত বিটের কোড হওয়ার কারণে এখানে সব মিলিয়ে 128টি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়। এর প্রথম 32টি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়, বাকি 96টি কোড ছোট হাতের, বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর, সংখ্যা, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। টেবিলে অ্যাসকি কোডটি দেখানো হলো। ইদানীং 16, 32 কিংবা 64 বিট কম্পিউটারের প্রচলনের জন্য সাত বিটের ASCII- তে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই বলে অষ্টম বিট যুক্ত করে Extended ASCII- তে আরো 128টি চিহ্ন নানাভাবে ব্যবহার হলেও প্রকৃত ASCII বলতে এখনো মূল 128টি চিহ্নকেই বোঝানো

হয়। টেবিলে অ্যাসকি কোডের প্রথম 32টি যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কোড (0 - 31) ছাড়া পরবর্তী 96টি (32 - 127) প্রতীক দেখানো হয়েছে।

টেবিল 3.4: অ্যাসকি টেবিল

সংখ্যা	প্রতীক	সংখ্যা	প্রতীক	সংখ্যা	প্রতীক	সংখ্যা	প্রতীক	সংখ্যা	প্রতীক	সংখ্যা	প্রতীক
32	Sp	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
36	$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	|
45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Del

ইউনিকোড (Unicode)

ইউনিকোড হলো প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অক্ষর, বর্ণ, চিহ্ন, ইমোজি ইত্যাদির এনকোডিং পদ্ধতি। বর্তমানে পূর্বের এনকোডিং পদ্ধতি যেমন ASCII ও EBCDIC-কেও ইউনিকোডের আওতায় আনা হয়েছে। তথা পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার লেখালেখির মাধ্যমগুলোকে ইউনিকোড পদ্ধতিতে সমন্বিত করা হয়েছে। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা ১৯৯১ সালে ২৪টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ 1.0.0 চালু করেন। ২০২০ সাথে ১৫৪টি ভাষা নিয়ে এর ১৩তম সংস্করণ চালু হয়েছে। ইউনিকোডের ৩টি বহুল প্রচলিত ফরম্যাট/স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। যথা–

১. **UTF-8**: এটি 8 বিটের (byte) একক। এখানে একটি অক্ষরকে 1 থেকে 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। তথা এ ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের জন্য 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ এর মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। যেমন 0041_{16} হচ্ছে ইংরেজি 'A' অক্ষর এবং 0995_{16} হচ্ছে বাংলা 'ক' অক্ষর যা UTF-8 রেঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। UTF-8 ইমেইল ও ইন্টারনেটে বহুল ব্যবহৃত এনকোডিং পদ্ধতি।

২. **UTF-16:** এটি 16 বিটের (shorts) একক। এখানে একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এর সাহায্যে মূলত ডেটা সংরক্ষণ ও টেক্সট প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

UTF-8 (৮ বিট) ও UTF-16 (১৬ বিট) মূলত ডেটার প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে ডেটা এনকোড করা হয়। UTF (Unicode Transformation Format) ডিফল্ট এনকোডিং ফর্ম ১৬ বিটের হয়ে থাকে। এর সাহায্যে ৬৫৫৩৬টি কোড তৈরি করা হয় যা পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণ, চিহ্ন প্রকাশের জন্য যথেষ্ট।

৩. **UTF-32:** এটি 32 বিটের (longs) একক। এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এখানে দক্ষতার সাথে অক্ষরকে ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ থাকে যে, UTF-8 এবং UTF-16 হচ্ছে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। এর মাঝে ওয়েবসাইটে ব্যবহার করার জন্য UTF-8 অলিখিত স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য 4 বাইট স্থান সংরক্ষণ করা থাকলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে UTF-8 শুধু যতগুলো বিট প্রয়োজন হয় ততটুকু ব্যবহার করে থাকে।

টেবিল 3.5: বাংলা ইউনিকোড

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+098x		◌ঁ	◌ং	◌ঃ		অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ঌ			এ
U+099x	ঐ			ও	ঔ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
U+09Ax	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন		প	ফ	ব	ভ	ম	য
U+09Bx	র		ল				শ	ষ	স	হ			◌়	ঽ	◌া	◌ি
U+09Cx	◌ী	◌ু	◌ূ	◌ৃ	◌ৄ			◌ে	◌ৈ			◌ো	◌ৌ	◌্	ৎ	
U+09Dx								◌ৗ					ড়	ঢ়		য়
U+09Ex	ৠ	◌ৡ	◌ৢ	◌ৣ			০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
U+09Fx	ৰ	ৱ	৲	৳	৴	৵	৶	৷	৸	৹	৺					

৩.৭ বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস (Boolean Algebra and Digital Devices)

৩.৭.১ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra)

আমরা সবাই কম-বেশি অ্যালজেবরা সাথে পরিচিত। বুলিয়ান অ্যালজেবরা একটি ভিন্ন ধরনের অ্যালজেবরা যেখানে শুধু 0 এবং 1 এর সেট {0, 1} নিয়ে কাজ করা হয়। প্রথমে দেখে মনে হতে পারে যে এলজেবরার প্রক্রিয়ায় এবং তার ফলাফলে 0 কিংবা 1-এর বাইরে কিছুই হতে পারবে না, সেটি আমাদের কী কাজে লাগবে? কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সের পুরো জগৎটি বুলিয়ান অ্যালজেবরাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মাত্র তিনটি প্রক্রিয়া (operation) করা হয়। সেগুলো হচ্ছে পূরক (Complement), গুণ (Multiply) এবং যোগ (Add)। যেহেতু সকল প্রক্রিয়া করা হবে 0 এবং 1 দিয়ে কাজেই, এই তিনটি প্রক্রিয়াও খুবই সহজ। সেগুলো এরকম :

বুলিয়ান পূরক : 0 এর পূরক 1 এবং 1 -এর পূরক 0 লেখা হয় এভাবে : $\bar{0} = 1$ এবং $\bar{1} = 0$

বুলিয়ান গুণ : 0.0 = 0, 1.0 = 0, 0.1= 0, 1.1 = 1

বুলিয়ান যোগ : 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 এবং 1 + 1 = 1

২০২৪-২০২৫

আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে দেখানো অ্যালজেবরা নিয়মগুলোর ভেতর শুধু $1 + 1 = 1$ এই যোগটি আমাদের প্রচলিত ধারণার সাথে মেলে না (কিন্তু যেহেতু আমরা শুধু {0, 1} সেট নিয়ে কাজ করছি এখানে অন্য কিছু বসানোরও সুযোগ নেই।) শুধু তাই নয় বুলিয়ান অ্যালজেবরা প্রক্রিয়াগুলো লেখার সময় আমরা যদিও 0 এবং 1 এই দুটি সংখ্যা লিখছি কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দুটি আসলে সংখ্যা নয়, এই দুটি হচ্ছে দুটি ভিন্ন অবস্থা। যেরকম 0 এবং 1 ইলেক্ট্রনিক সার্কিটে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভোল্টেজ (0 v এবং 5 v) হতে পারে, অপটিকেল ফাইবারে আলোহীন এবং আলোযুক্ত অবস্থা হতে পারে কিংবা লজিকের মিথ্যা (False বা F) এবং সত্য (True কিংবা T) হতে পারে।

বুলিয়ান অ্যালজেবরা করার সময় সবার প্রথম পূরক তারপর গুণ এবং সবশেষে যোগ করতে হয়। তবে পাশাপাশি অসংখ্য প্রক্রিয়া থাকলে ব্র্যাকেট ব্যবহার করে বিভ্রান্তি কমিয়ে রাখা ভালো। কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ না থাকলে x.y কে xy হিসেবে লেখা যায়।

উদাহরণ : $1.0 + \overline{(0 + 1)} = ?$

উত্তর : $1.0 + \overline{(0 + 1)} = 0 + \overline{1} = 0 + 0 = 0$

৩.৭.২ বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorem)

আমাদের প্রচলিত অ্যালজেবরার মতোই বুলিয়ান অ্যালজেবরার বেশ কিছু উপপাদ্য রয়েছে। এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে দেখানো হলো। বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেহেতু {0, 1} সেট দিয়ে তৈরি তাই চলকের (Variable) মান একবার 0 এবং আরেকবার 1 বসিয়ে এই উপপাদ্যগুলো খুবই সহজেই প্রমাণ করা যায়।

টেবিল 3.6: বুলিয়ান উপপাদ্য

দ্বৈত পরিপূরক (Double Complement)	$\bar{\bar{x}} = x$
অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য (Idempotent)	$x + x = x \quad x.x = x$
পরিচিতি উপপাদ্য (Identity)	$x + 0 = x \quad x.1 = x$
কর্তৃত্ব উপপাদ্য (Domination)	$x + 1 = 1 \quad x.0 = 0$
বিনিময় উপপাদ্য (Commutative)	$x + y = y + x \quad xy = yx$
অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative)	$x + (y + z) = (x + y) + z$ $x(yz) = (xy)z$
বিভাজন উপপাদ্য (Distributive)	$x + yz = (x + y)(x + z)$ $x(y + z) = xy + xz$
ডি মরগান উপপাদ্য (De Morgan)	$\overline{x.y} = \bar{x} + \bar{y}$ $\overline{x + y} = \bar{x}.\bar{y}$
সহায়ক উপপাদ্য (Absorption)	$x + xy = x$ $x(x + y) = x$

এখানে বেশ কিছু উপপাদ্য আমাদের পরিচিত অ্যালজেবরার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আবার বেশ কিছু উপপাদ্যের পরিচিত উপপাদ্যের সাথে মিল নেই। $x.\bar{x} = 0$

উদাহরণ : বিভাজন উপপাদ্য $x + yz = (x + y).(x + z)$ টি প্রমাণ কর।

উত্তর : ডানদিক $(x + y).(x + z)$

$= xx + xz + yx + yz$

$= x + xz + yx + yz$ $Idempotent\ x.x = x$

$= x(1 + z) + yx + yz$

$= x + yx + yz$ $Domination\ 1 + z = 1$

$= x(1 + y) + yz$

$= x + yz$ $Domination\ 1 + y = 1$

= বাম দিক (প্রমাণিত)

উদাহরণ : ডি মরগানের উপপাদ্য দুটি প্রতি ক্ষেত্রের জন্য মান বসিয়ে প্রমাণ কর।

উত্তর : এখানে যেহেতু x এবং y দুটি চলক রয়েছে, দুটিরই মান হওয়া সম্ভব 0 এবং 1 কাজেই সর্বমোট ২² বা চারটি ভিন্ন মান হওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে লেখা যেতে পারে।

x	y	$x.y$	$\overline{x.y}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x} + \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

$\overline{x.y} = \bar{x} + \bar{y}$ (প্রমাণিত)

x	y	$x + y$	$\overline{x + y}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x}.\bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

$\overline{x + y} = \bar{x}.\bar{y}$ (প্রমাণিত)

নিজে কর : বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভেতর কোন কোন উপপাদ্য আমাদের পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন। (Hint : চলক x, y, z -এর জন্য 0 এবং 1-এর বাইরে কোনো মান বসানো হলে যেগুলো কাজ করে না সেগুলো পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন।)

আমাদের পরিচিত সাধারণ অ্যালজেবরায় আমরা যেরকম বেশ কিছু চলক ব্যবহার করে অন্য আরেকটি বড় এক্সপ্রেশন তৈরি করতে পারি, বুলিয়ান অ্যালজেবরার বেলাতেও সেটা সত্যি। সাধারণ অ্যালজেবরার মতো বুলিয়ান অ্যালজেবরাতেও আমরা বুলিয়ান উপপাদ্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো অনেক সরল করে ফেলতে পারি। যেমন ধরা যাক x, y এবং z এই তিনটি চলক ব্যবহার করে নিচের এক্সপ্রেশনটি লেখা হয়েছে :

$$xyz + xy + x$$

এটাকে আমরা এভাবে সরল রূপ দিতে পারি :

$$xyz + xy + x = xy(z + 1) + x = xy + x = x(y + 1) = x$$

এটাকে সরল করার জন্য আমরা domination উপপাদ্য $z + 1 = 1$ এবং $y + 1 = 1$ ব্যবহার করেছি।

উদাহরণ : $xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$ এক্সপ্রেশনটিকে সরল কর।

উত্তর : $xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$

$= xz(y + \bar{y}) + \bar{x}z(y + \bar{y})$

$= xz + \bar{x}z$ যেহেতু $(y + \bar{y}) = 1$

$= z(x + \bar{x})$

$= z$ যেহেতু $(x + \bar{x}) = 1$

আমরা যখন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের শুরুতে নানা ধরনের গেট নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব বুলিয়ান অ্যালজেবরায় এভাবে একটি বড় এবং জটিল এক্সপ্রেশনকে সরল করতে পারলে একটি জটিল সার্কিটকে অনেক ছোট করে ফেলা যায়।

৩.৭.৩ সত্যক সারণি (Truth Table)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় পরিপূরক, যোগ এবং গুণ, এই তিনটি প্রক্রিয়াকে আমরা তিনটি সারণি বা টেবিল আকারেও লিখতে পারি। x এবং y যদি দুটি বুলিয়ান চলক হয় যেগুলো শুধু 0 এবং 1 এই দুটি মান পেতে পারে তাহলে কোন মানের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন ফলাফল পাওয়া যাবে সেটি আমরা এভাবে লিখতে পারি।

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1

x	y	$x.y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0

একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোন ইনপুটের জন্য কোন আউটপুট পাওয়া যায় সেটি যদি একটি সারনি বা টেবিল দিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা হয় সেটাকে সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল বলা হয়। উপরের সত্যক সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি একটি চলক (x) থাকে তাহলে সত্যক সারণি দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইনপুট থাকে। চলকের সংখ্যা যদি দুটি হয় তাহলে ইনপুটের সংখ্যা হয় $2^2 = 4$টি। চলকের সংখ্যা যদি হয় n তাহলে ইনপুটের সংখ্যা হয় 2^n টি।

উদাহরণ : $x.\overline{(y + z)}$ বুলিয়ান ফাংশনটির সত্যক সারনি লিখ।

উত্তর : নিচে দেখানো হলো।

২০২৪-২০২৫

x	y	z	$(y+z)$	$\overline{(y+z)}$	$x.\overline{(y+z)}$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

৩.৭.৪ মৌলিক গেট (AND, OR, NOT Gate)

এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছিল যে বুলিয়ান অ্যালজেবরা হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তি–বিষয়টি কীভাবে ঘটে সেটি এখানে আলোচনা করা হবে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে প্রক্রিয়াগুলোর কথা বলা হয়েছিল (পরিপূরক, গুণ এবং যোগ) সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য ইলেকট্রনিক গেট তৈরি করা হয়। অর্থাৎ যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে লজিক বাস্তবায়ন করা যায় সেগুলোকে গেট বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ইনপুট এবং আউটপুট দুটি সংখ্যা {0,1} দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে সেগুলো দুটি ভোল্টেজ দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। ব্যবহারের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে নানা ধরনের কাজের জন্য নানা ধরনের ভোল্টেজ নির্ধারণ করে দেওয়া আছে।

চিত্র 3.2 : NOT, AND এবং OR গেট এর প্রতীক এবং একটি ডিজিটাল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার তিনটি প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে তিনটি ইলেকট্রনিক গেট বা লজিক গেট ব্যবহার করা হয় তা 3.2 চিত্রে দেখানো হলো। এখানে পরিপূরক প্রক্রিয়াটির জন্য NOT গেট, গুণ করার জন্য AND এবং যোগ করার জন্য OR গেট। আমরা ছবিতে পরিপূরক, গুণ এবং যোগ করার জন্য যে সত্যক সারণি তৈরি করেছিলাম সেগুলোর দিকে তাকালেই এই নতুন নামকরণের যৌক্তিকতা বুঝতে পারব। NOT গেটটি একটি ইনপুটের বিপরীত অবস্থান তৈরি করে। AND গেটের আউটপুট 1 হওয়ার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি ইনপুটকেই 1 হতে হয়। OR গেটের আউটপুট 1 হওয়ার জন্য প্রথম অথবা দ্বিতীয় যে কোনোটি অথবা দুটিই 1 হতে হয়। আমরা এই গেটগুলোকে মৌলিক গেট বলি কারণ এই তিনটি গেট ব্যবহার করে আমরা যে কোনো জটিল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স গড়ে তুলতে পারব।
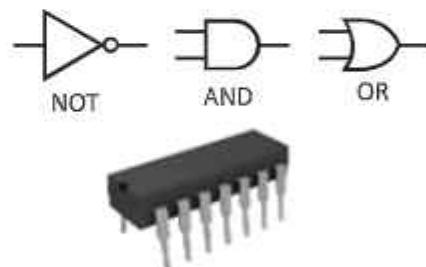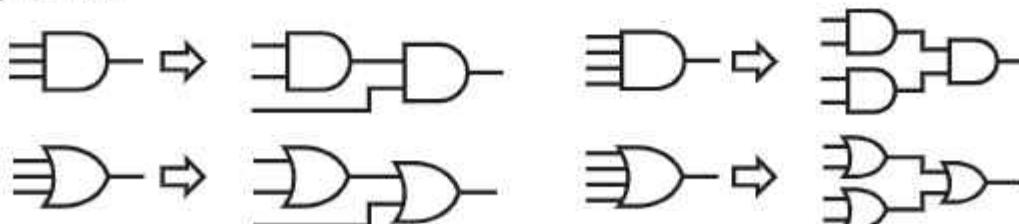
চিত্র 3.3 : তিন ইনপুটের AND এবং OR গেট

চিত্র 3.4 : চার ইনপুটের AND এবং OR গেট

আমরা যদিও দুই ইনপুটের AND এবং OR গেটের কথা বলেছি কিন্তু দুই থেকে বেশি ইনপুটের AND এবং OR গেট রয়েছে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছে করলে আমরা দুই গেটের লজিক গেট ব্যবহার করেই দুই থেকে বেশি ইনপুটের লজিক গেট তৈরি করতে পারব।

এবারে আমরা NOT, AND ও OR গেটগুলো ব্যবহার করে নানা ধরনের সার্কিট তৈরি করে এর ব্যবহারটি শিখে নেব।

উদাহরণ : নিচে দেখানো সার্কিটের ইনপুট দুটি যদি 1 হয় তাহলে আউটপুট কী হবে? একই সার্কিটে আমরা যদি নির্দিষ্ট মান না দিয়ে ইনপুট দুটিকে x এবং y বলি তাহলে আউটপুট কী?
উত্তর : নিচের ছবিতে দেখানো হলো।
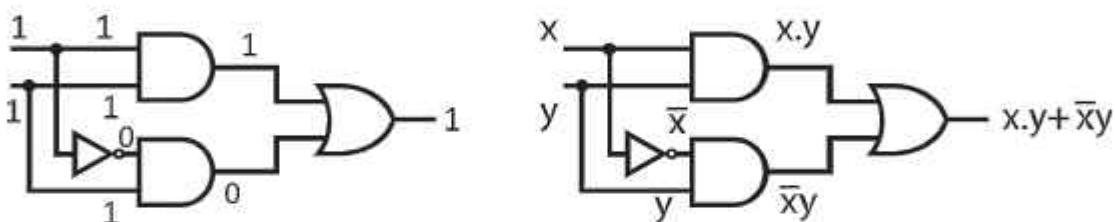
উদাহরণ : $(x+y)\bar{y}$ সার্কিটটি আঁকো।
উত্তর : পাশের ছবিতে দেখানো হলো।
x = 1, y = 0 হলে আউটপুট কী?
আউটপুট : $(x+y)\bar{y} = (1+0)\bar{0} = 1.1 = 1$
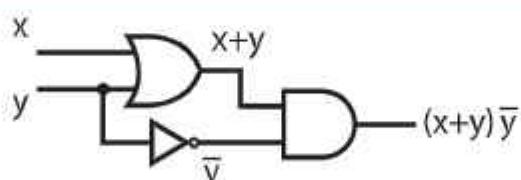
উদাহরণ : $\bar{x}\overline{(y+\bar{z})}$ সার্কিটটি আঁকো।
x = 1, y = 0 z = 1 হলে আউটপুট কী?
উত্তর : পাশের ছবিতে দেখানো হলো।
আউটপুট :
$\bar{x}\overline{(y+\bar{z})} = \bar{1}\overline{(0+\bar{1})} = 0\overline{(0+0)} = 0$
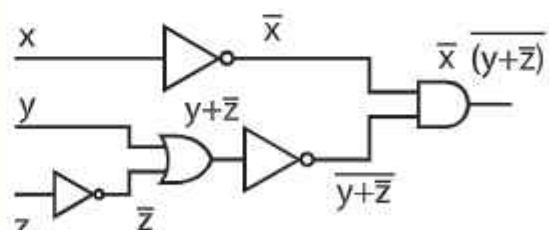
উদাহরণ : $\bar{x}\overline{(y+\bar{z})}$ সার্কিটটির সত্যক সারণি তৈরি কর।
উত্তর : নিচের টেবিলে দেখানো হলো।

x	y	z	$\bar{x}$	$\bar{z}$	$(y+\bar{z})$	$\overline{(y+\bar{z})}$	$\bar{x}.\overline{(y+\bar{z})}$
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0

উদাহরণ : তিনজনের ভিতর কমপক্ষে দুইজন "হ্যাঁ" ভোট দিলে ভোটে বিজয়ী বিবেচনা করা হবে এরকম একটি সার্কিট তৈরি কর।

উত্তর : পাশের ছবিতে দেখানো হলো।
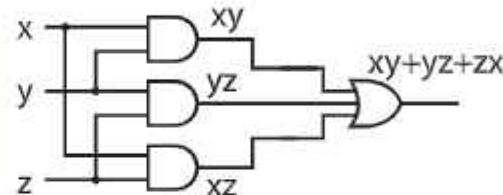
পরীক্ষা করে দেখো, সত্যি সত্যি তিনটির ভেতর কমপক্ষে দুটো যদি 1 হয় তাহলে আউটপুট 1.

উদাহরণ : ধরা যাক তুমি একটি ঘরের আলো দুটি ভিন্ন ভিন্ন সুইচ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও। অর্থাৎ আলো জ্বালানো থাকলে যে কোনো একটি সুইচ দিয়ে আলোটা নেভাতে পারবে আবার আলো নেভানো থাকলে যে কোনো একটি সুইচ দিয়ে সেটি দিয়ে জ্বালাতে পারবে।

উত্তর : মনে করি সুইচ দুটি হচ্ছে একটা সার্কিটের দুটি ইনপুট x এবং y, যখন x কিংবা y এর মান 1 তখন সুইচটি অন অবস্থায় আছে এবং যখন মান 0 তখন অফ অবস্থায় আছে। যেহেতু মাত্র দুইটি সুইচ কাজেই আমাদের মাত্র চারটি অবস্থানের জন্য আউটপুট Q বের করতে হবে। আলোটি আমরা Q আউটপুট দিয়ে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ যখন Q এর মান 1 তখন আলোটি জ্বলবে যখন Q এর মান 0 তখন আলোটি নিভে যাবে। যখন দুটি সুইচই অফ, ধরা যাক তখন আলোটি জ্বলছে, অর্থাৎ x = 0, y = 0 এবং Q = 1 এটি হবে সত্যক সারণির প্রথম অবস্থান। এখান থেকে শুরু করে আমরা অন্য অবস্থাগুলো বের করতে পারব। এই অবস্থান থেকে যদি যে কোনো একটি সুইচ পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেটা হওয়া সম্ভব : x = 0, y = 1 কিংবা x = 1, y = 0 এবং তখন Q = 0 হতে হবে (অর্থাৎ আলোটি নিভে যেতে হবে।) আমরা সত্যক সারণির আরো দুইটি তথ্য পেয়ে গেছি। সত্যক সারণির শেষ অবস্থান x = 1, y = 1, এই অবস্থানে পৌঁছাতে হলে যেহেতু x = 0, y = 1 কিংবা x = 1, y = 0 অবস্থানের একটি সুইচের পরিবর্তন করতে হবে, কাজেই Q-এর মানও 0 থেকে 1 হতে হবে। 3.5 নং চিত্রে এই লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের ট্রুথ টেবিল এবং নিচের ছবিতে এটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কিটটি দেখানো হয়।

x	y	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
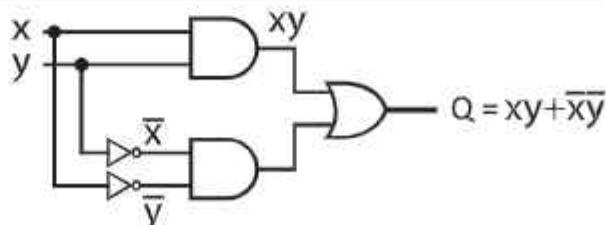
চিত্র 3.5 : লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের সত্যক সারণি এবং তার সার্কিট

৩.৭.৫ সর্বজনীন গেট (Universal Gate)

সর্বজনীন গেট আলোচনা করার আগে আমাদের NAND এবং NOR গেটের সাথে পরিচিত হতে হবে। এই গেট দুটির নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে NAND গেট হচ্ছে NOT-AND বা AND গেটের আউটপুটের NOT। অর্থাৎ একটি AND গেটের আউটপুটটি একটি NOT গেট দিয়ে রূপান্তরিত করে নিলে NAND গেটের আউটপুট পাওয়া যায়। চিত্রে NAND গেটের সত্যক সারণি, প্রতীক এবং লজিকেল রূপটি দেখানো হলো।

x	y	$\overline{x.y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র 3.6: NAND গেটের সত্যক সারণি, প্রতীক এবং লজিকেল রূপ

x	y	$\overline{x+y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
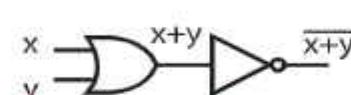
চিত্র 3.7: NOR গেটের সত্যক সারণি, প্রতীক এবং লজিকেল রূপ

একইভাবে NOR গেট হচ্ছে OR গেটের আউটপুটকে NOT গেট দিয়ে পরিবর্তিত করা রূপ। তার সত্যক সারণি প্রতীক এবং লজিক গেটের রূপটি 3.7 চিত্রে দেখানো হলো।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার পরিপূরক, যোগ ও গুণ এই তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে। ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে দেখানো হয়েছিল যে পরিপূরক ও যোগ কিংবা পরিপূরক ও গুণ এরকম দুটি প্রক্রিয়া দিয়েই বুলিয়ান অ্যালজেবরার যে কোনো প্রক্রিয়া করা সম্ভব। কাজেই আমরা বলতে পারি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যেকোনো সার্কিট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লজিক গেটের পরিবর্তে দুটি গেট দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব। সেই দুটি গেট হচ্ছে NOT এবং AND অথবা NOT এবং OR যেহেতু শুধু NAND গেট দিয়ে NOT এবং AND দুটি গেট তৈরি করা সম্ভব আবার শুধু NOR গেট দিয়েই NOT এবং OR গেট তৈরি করা সম্ভব তাই আমরা NAND এবং NOR গেটকে সর্বজনীন (Universal) গেট বলে থাকি।

পাশের ছবিতে শুধু NAND গেট ব্যবহার করে NOT গেট এবং AND গেট তৈরি করা এবং শুধু NOR গেট ব্যবহার করে NOT গেট এবং OR গেট তৈরি করার পদ্ধতি দেখানো হলো।

আমরা NAND গেট দিয়ে AND গেট এবং NOR গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করা দেখিয়েছি।

চিত্র 3.8: লজিকেল NOT গেট এবং লজিকেল AND গেট

এখন আমরা উল্টোটা দেখাব, অর্থাৎ NAND গেট দিয়ে OR গেট এবং NOR গেট দিয়ে AND গেট তৈরি করা দেখাব।
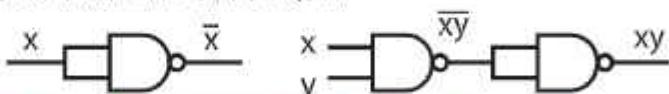
চিত্র 3.9: লজিকেল NOT গেট এবং লজিকেল OR গেট
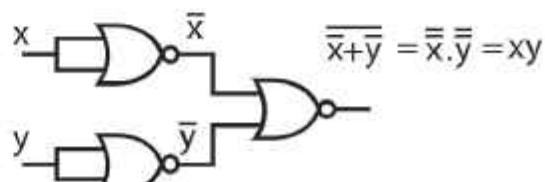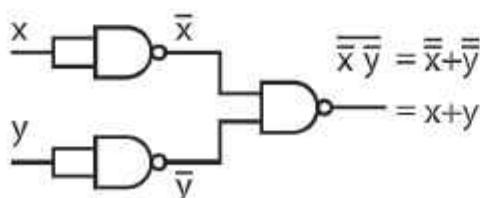
চিত্র 3.10: NAND গেট দিয়ে OR গেট বাস্তবায়ন এবং NOR গেট দিয়ে AND গেট বাস্তবায়ন

এবারে আমরা শুধু NAND অথবা শুধু NOR গেট দিয়ে যে কোনো একটি সার্কিট তৈরি করে সর্বজনীন গেটের গুরুত্বটি দেখাব।

উদাহরণ : $x.y + \bar{x}y$ সার্কিটটি শুধু NAND গেট এবং শুধু NOR গেট দিয়ে তৈরি কর।

উত্তর : NAND ও NOR গেট দিয়ে তৈরি সার্কিট দুটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছ যে একই সার্কিট ভিন্ন ভিন্নভাবে তৈরি করা সম্ভব। কোনো সার্কিটে হয়তো বেশি গেটের প্রয়োজন হয় আবার কোনো সার্কিটে কম গেটের প্রয়োজন হয়। যত্ন করে সার্কিট তৈরি করার সময় সব সময় চেষ্টা করে অল্প গেট ব্যবহার করে বুদ্ধিসম্মত সার্কিট তৈরি করা।
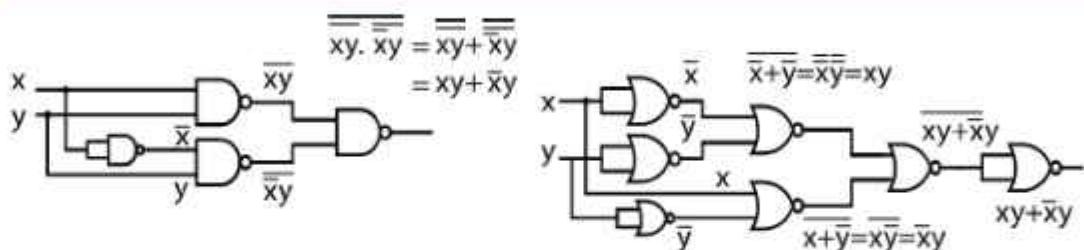
চিত্র 3.11: শুধু NAND গেট এবং শুধু NOR গেট দিয়ে তৈরি পূর্ণাঙ্গ সার্কিট

নিজে কর : পাশের ছবিটি কোন বুলিয়ান উপপাদ্য?
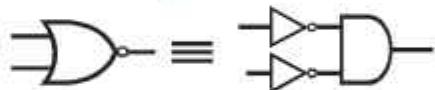
৩.৭.৬ বিশেষ গেট (XOR, XNOR Gate)

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের নানা ধরনের সার্কিটে অনেক সময়েই আমাদের বাইনারি সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করতে হয়। এক বিটের বাইনারি যোগ এরকম :

0	0	1	1
+0	+1	+0	+1
0	1	1	10

XOR গেটের সত্যক সারণী

x	y	$x\oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1-এর সঙ্গে 1-এর যোগফলে দুটি বিট এসেছে, এখানে ডানপাশের বিটটিকে আমরা যোগফল এবং বামপাশের বিটটিকে বলতে পার ক্যারি। ক্যারি বিটটি নিয়ে আমরা আপাতত মাথা না ঘামিয়ে শুধু যোগফলের বিটটি নিয়ে আলোচনা করি। আমরা দেখেছি বুলিয়ানের যোগটিতে 1+1 করে আমরা 0 পাই না, 1 পাই। কাজেই বুলিয়ানের যোগ করার লজিক গেট AND কে আমরা বাইনারি যোগে ব্যবহার করতে পারি না। বাইনারির যোগে ব্যবহার করার জন্য Exclusive OR বা সংক্ষেপে XOR নামে আরেকটি লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। এই গেটের সত্যক সারণি এবং প্রতীক 3.12 চিত্রে দেখানো হলো। সহজভাবে বলা যায় XOR গেটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1, তা না হলে আউটপুট 0। XOR গেটের লজিক $x\bar{y} + \bar{x}y$, তোমরা এটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নাও।
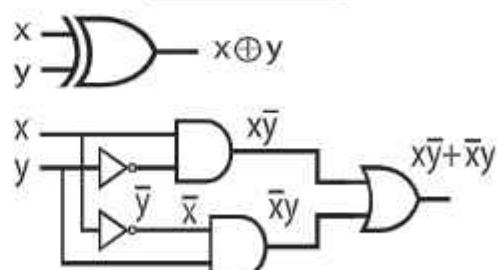
চিত্র 3.12: XOR গেটের প্রতীক এবং লজিক

২০২৪-২০২৫

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহার করার জন্য XOR গেট আলাদাভাবে পাওয়া যায়। তবে আমরা ইচ্ছে করলে মৌলিক গেটগুলো ব্যবহার করেও XOR–এর লজিক বাস্তবায়ন করতে পারি।

প্রয়োজনীয় কোনো গেট তৈরি করা হলে সাধারণত তার NOT গেটটিও তৈরি করা হয়। সেই হিসেবে XNOR গেটটি বহুল ব্যবহৃত। XOR গেটের আউটপুটটির পর একটি NOT গেট বসিয়ে XNOR তৈরি করা সম্ভব হলেও গেটের সংখ্যা কমানোর জন্য পাশের ছবিতে দেখানো উপায়ে এই লজিকটি পাওয়া সম্ভব।

x	y	$\overline{x \oplus y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

যেহেতু NAND এবং NOR গেট সর্বজনীন গেট, কাজেই মৌলিক গেট ব্যবহার না করে শুধু NAND অথবা শুধু NOR গেট ব্যবহার করে XOR অথবা XNOR-এর লজিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সর্বজনীন গেট ব্যবহার করে AND অথবা OR গেট বাস্তবায়নের সময় পদ্ধতিটি না দেখিয়ে সরাসরি উত্তরটি দেখানো হয়েছিল। এবারে আমরা NAND এবং NOR গেট ব্যবহারের পদ্ধতিটি দেখিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কিট তৈরি করব।
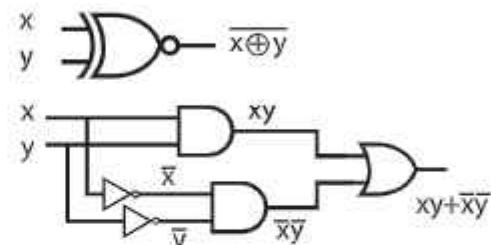
চিত্র 3.13: XNOR গেটের সত্যক সারণি, প্রতীক এবং লজিক

উদাহরণ : শুধু NAND এবং NOR গেট ব্যবহার করে XOR তৈরি কর।

উত্তর : আমরা জানি XOR গেটের লজিক $x\bar{y} + \bar{x}y$ শুধু NAND গেট দিয়ে এই লজিক তৈরি করতে হলে ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে বুলিয়ান যোগ (+) কে বুলিয়ান গুণে (.) পাল্টে নিতে হবে। যেহেতু দুইবার পরিপূরক করা হলে লজিকের পরিবর্তন হয় না তাই আমরা লিখতে পারি :

$x\bar{y} + \bar{x}y = \overline{\overline{(x\bar{y} + \bar{x}y)}}$

[দ্বৈত পরিপূরক]

ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে যোগকে গুণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হলে সেটি হবে

$= \overline{\overline{x\bar{y}}.\overline{\bar{x}y}}$ [ডি মরগান সূত্র]

এবারে আমরা সার্কিটটি এঁকে ফেলি। (চিত্র 3.14)
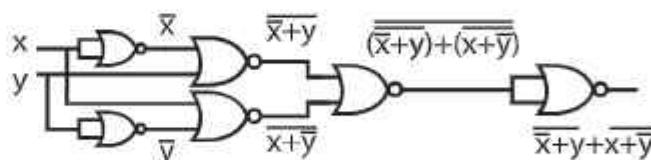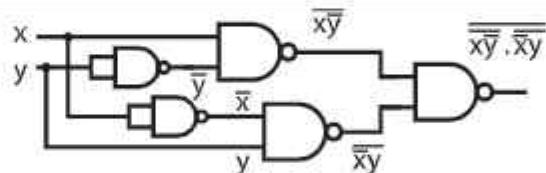
চিত্র 3.14 : শুধু NAND এবং NOR গেট ব্যবহার করে তৈরি XOR কর

একইভাবে শুধু NOR ব্যবহার করে XOR তৈরি করতে হলে $x\bar{y}$ এবং $\bar{x}y$ -এর ভেতরকার বুলিয়ান গুণকে ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে যোগে রূপান্তর করতে হবে।

$x\bar{y} + \bar{x}y = \overline{\overline{(x\bar{y})}} + \overline{\overline{(\bar{x}y)}}$ [দ্বৈত পরিপূরক]

$= \overline{\bar{x} + \bar{\bar{y}}} + \overline{\bar{\bar{x}} + \bar{y}}$ [ডি মরগান সূত্র]

$= \overline{\bar{x} + y} + \overline{x + \bar{y}}$

এবারে সার্কিটটি এঁকে ফেলা যাবে। (চিত্র 3.14)

উদাহরণ : শুধু NAND এবং NOR ব্যবহার করে XNOR তৈরি কর।

উত্তর : আমরা আগের উদাহরণের প্রক্রিয়ায় শুধু NAND ব্যবহার করে XNOR তৈরি করতে পারি। XNOR এর লজিক হচ্ছে : $xy + \bar{x}\bar{y}$ লজিক অপরিবর্তিত রেখে দ্বৈত পরিপূরক করা হলে আমরা পাই :

$xy + \bar{x}\bar{y} = \overline{\overline{xy + \bar{x}\bar{y}}}$
[দ্বৈত পরিপূরক]

এবারে ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে যোগকে গুণে রূপান্তর করতে হবে।

$= \overline{\overline{xy}.\overline{\bar{x}\bar{y}}}$ [ডি মরগান সূত্র]

এখন সার্কিটটা এঁকে ফেলা যাবে। (চিত্র 3.15)

চিত্র 3.15 : শুধু NAND এবং NOR গেট ব্যবহার করে তৈরি XNOR গেট

একইভাবে শুধু NOR ব্যবহার করে XNOR তৈরি করতে হলে xy এবং $\bar{x}\bar{y}$ -এর ভেতরকার বুলিয়ান গুণকে ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে যোগে রূপান্তর করতে হবে। XNOR এর লজিক $xy + \bar{x}\bar{y}$ অপরিবর্তিত রেখে দ্বৈত পরিপূরক করা হলে আমরা পাই :

$xy + \bar{x}\bar{y} = \overline{\overline{xy}} + \overline{\overline{\bar{x}\bar{y}}}$ [দ্বৈত পরিপূরক]

এবারে ডি মরগান সূত্র ব্যবহার করে যোগকে গুণে রূপান্তর করতে হবে :

$= \overline{\bar{x} + \bar{y}} + \overline{\bar{\bar{x}} + \bar{\bar{y}}}$ [ডি মরগান সূত্র]

দ্বৈত পরিপূরক করে আরো সহজে লেখা যায় :

$= \overline{\bar{x} + \bar{y}} + \overline{x + y}$ [দ্বৈত পরিপূরক] এবারে সার্কিটটি এঁকে ফেলা যাবে (চিত্র 3.15)।
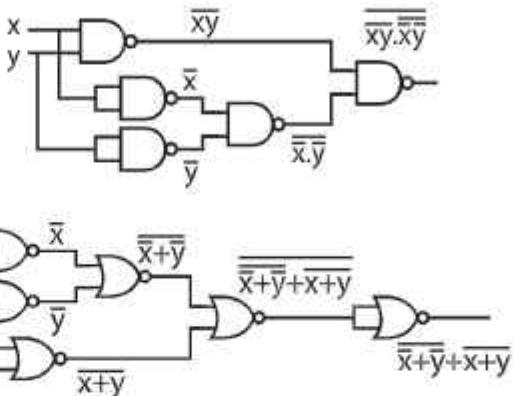
৩.৭.৭ অ্যাডার (Adder)

আমরা এবারে লজিক গেট দিয়ে তৈরি করা আরো একটি ডিজিটাল সার্কিটের কথা বলব যেটি, বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি যে সঠিকভাবে বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারলেই প্রয়োজনে সেই একই সার্কিট ব্যবহার করে বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ করতে পারব।

x	y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

XOR লজিক গেটটি আলোচনা করার সময় আমরা বাইনারি যোগ 1 + 1 = 10 সংখ্যাটিতে বলেছিলাম এর মাঝে ডানপাশের বিটটি যোগফল এবং বাম পাশের (হাতে থাকা) বিটটি ক্যারি (carry)। যোগফলের বিটটি XOR গেট দিয়ে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যারি বিটটি কীভাবে পাওয়া যায় সেটি তখন আলোচনা করা হয়নি। সেটি খুবই সহজ একটি AND গেট দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। কাজেই আমরা একটি বিটের সাথে অন্য একটি বিটের বাইনারি যোগ নিচের সার্কিট দিয়ে পেতে পারি :

চিত্র 3.16 : x এবং y এই দুইটি বিট যোগ করার জন্য হাফ অ্যাডারের সত্যক সারণি এবং এই সত্যক সারণি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সার্কিট

এই ধরনের সার্কিটের নাম হচ্ছে হাফ অ্যাডার, কারণ এটি পূর্ণাঙ্গ বাইনারি যোগের সার্কিট নয়, এটি আংশিকভাবে যোগ করতে পারে। আগের ধাপ থেকে ক্যারি বিট হিসেবে 1 চলে এলে তখন যোগ করতে পারে না। প্রকৃত বাইনারি যোগে দুটি বিট যোগ করতে হলেও মাঝে মাঝেই এর আগের দুটি বিটের যোগ থেকে ক্যারি বিট চলে আসে, তখন দুইটি নয়, তিনটি বিট যোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। নিচে দুটি বাইনারি সংখ্যার যোগফল দেখানো হয়েছে।

```
↓↓  ↓
1001101
1011001
--------
10100110
```

নিজে কর : মৌলিক গেট দিয়ে হাফ অ্যাডার তৈরি কর।

টেবিল 3.6

ইনপুট			আউটপুট	
x	y	C_{IN}	S	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

যদিও দুটি করে বিট যোগ করা হয়েছে কিন্তু তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো বিট দুটির বেলায় আগের ধাপ থেকে 1 বিটটি এসেছে বলে আসলে তিনটি বিট যোগ করা হয়েছে। আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি, প্রতিবারই আমরা তিনটি বিট যোগ করেছি, কিন্তু অন্য ধাপগুলোতে ক্যারি বিটের মান ছিল 0। কাজেই এবারে আমরা x, y এবং C_{IN}, এই তিনটি ইনপুটের জন্য ট্রুথ টেবিলটি লিখে ফেলতে পারি। (টেবিল 3.6) এখানে x, y হচ্ছে বাইনারি যোগের প্রদত্ত সংখ্যার বিট এবং C_{IN} হচ্ছে আগের ধাপ থেকে আসরা ক্যারি বিটের মান। ট্রুথ টেবিলে আউটপুট দুটি, S এবং C_{OUT}। S হচ্ছে দুটি বিটের যোগফল, C_{OUT} হচ্ছে ক্যারি বিট যেটি পরের ধাপে C_{IN} হিসেবে যুক্ত হয়।

ট্রুথ টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি x, y এবং C_{IN} -এর সম্ভাব্য আটটি ভিন্ন ভিন্ন ইনপুটের ভেতর চারটি ক্ষেত্রে যোগফল (S) এবং চারটি ক্ষেত্রে ক্যারি (C_{OUT}) আউটপুটের মান 1 হতে হবে। ডিকোডারের বেলায় আমরা যেভাবে AND গেটের আউটপুট 1 পাওয়ার জন্য NOT গেট দিয়ে ইনপুট পরিবর্তন করেছিলাম, এখানেও আমরা হুবহু একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি। 3.17 চিত্রে সেভাবে সার্কিটটি এঁকে দেখানো হলো। আমাদের আউটপুট দুটি (S এবং C_{OUT}) পাওয়ার জন্য AND গেটগুলোর OR গেট দিয়ে একত্র করে নেয়া হয়েছে। তবে তোমরা একটু অবাক হয়ে ভাবতে পার, S এবং C_{OUT} দুটির লজিক একই ধরনের থাকার পরও C_{OUT} -এর জন্য সার্কিটটি

চিত্র 3.17: টেবিলে দেখানো সত্যক সারণি বাস্তবায়নের জন্য ফুল অ্যাডারের সার্কিট ও ব্লক ডায়াগ্রাম

তুলনামূলকভাবে সহজ কেন? মাত্র তিনটি দুই ইনপুট AND গেট দিয়ে কীভাবে আমরা সঠিক আউটপুট পেয়ে গেলাম?

S এর বেলায় 1 আউটপুটের জন্য INPUT এর মান হতে হবে এরকম :

$$S = \bar{x}y\overline{C_{IN}} + x\bar{y}\overline{C_{IN}} + \bar{x}\bar{y}C_{IN} + xyC_{IN}$$

একইভাবে ক্যারি আউটের জন্য C_{OUT} এর মান হতে হবে এরকম :

$$C_{OUT} = xy\overline{C_{IN}} + \bar{x}yC_{IN} + x\bar{y}C_{IN} + xyC_{IN}$$

কিন্তু এটাকে সহজ করে এভাবে লেখা সম্ভব। কীভাবে সম্ভব তার উত্তরটি নিচের উদাহরণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

$$C_{OUT} = xy + yC_{IN} + xC_{IN}$$

উদাহরণ : S এর জন্য আউটপুটটি মৌলিক গেট দিয়ে আরও সরল করা সম্ভব না। তবে C_{OUT} -এর সমীকরণটি আরও সরল করা সম্ভব। তোমরা কি আরও সরল করে দেখাতে পারবে?

উত্তর : যেহেতু $A + A = A$, তাই আমরা সর্বশেষ টার্ম xyC_{IN}টি অন্য তিনটি টার্মের প্রত্যেকটির সাথে যোগ করতে পারি :

$$C_{OUT} = (xy\overline{C_{IN}} + xyC_{IN}) + (\bar{x}yC_{IN} + xyC_{IN}) + (x\bar{y}C_{IN} + xyC_{IN})$$

এখন আমরা এভাবে সাজাতে পারি

$$C_{OUT} = xy(\overline{C_{IN}} + C_{IN}) + yC_{IN}(\bar{x} + x) + xC_{IN}(\bar{y} + y)$$

যেহেতু $A + \bar{A} = 1$, আমরা লিখতে পারি : $C_{OUT} = xy + yC_{IN} + xC_{IN}$

দেখতে পাচ্ছ পুরো সার্কিটটি অনেক সরল হয়ে গেছে, কিন্তু এটি সঠিক আউটপুট দেবে, ইচ্ছা করলে সেটি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

নিজে কর : দুইটি অর্ধযোগ (হাফ অ্যাডার) বর্তনী দিয়ে একটি পূর্ণযোগ (ফুল অ্যাডার) বর্তনী বানানো সম্ভব কি? উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দেখাও।

দুটি বিট যোগ করার এই সার্কিটটিকে ফুল অ্যাডার বলে। যেকোনো সত্যিকার কাজের সার্কিটে অনেক বিট যোগ করতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিটের জন্য যেন এই পুরো সর্কিটটি আঁকতে না হয় সেজন্য আমরা পুরো সার্কিটটিকে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়েছি, এখানে শুধু ইনপুট এবং আউটপুট লাইনগুলো দেখানো হয়েছে। চার বিটের একটি বাইনারি যোগের জন্য কীভাবে চারটি ফুল অ্যাডার সার্কিট যোগ করতে হবে সেটি ব্লক ডায়াগ্রামগুলো যুক্ত করে দেখানো হলো।

লক্ষ কর, প্রথম ব্লক ডায়াগ্রামে $C_{IN1} = 0$ কারণ প্রথম দুটি বিট যোগ করার সময় আগের কোনো ধাপ থেকে কিছু C_{IN} আসা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, চার বিট যোগ করতে হলে যোগফল ঠিকভাবে দেখাতে হলে কিন্তু সর্বশেষ C_{OUT} -এর জন্য পঞ্চম বিট প্রয়োজন হয়।
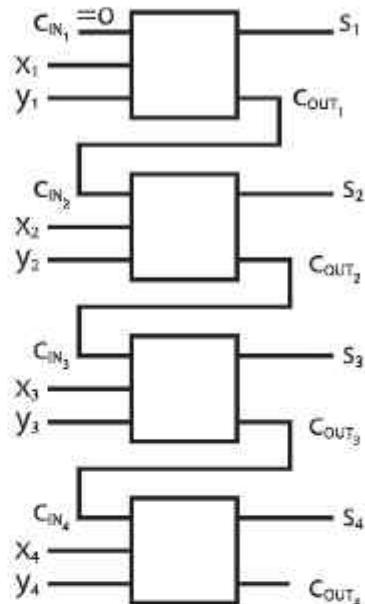
চিত্র 3.18: চার বিট যোগ করার প্রয়োজনীয় সার্কিটের জন্য ব্লক ডায়াগ্রাম

৩.৭.৮ ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)

ফ্লিপ- ফ্লপ লজিক গেট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (0, 1) আছে এবং উহা দুটি স্থায়ী অবস্থার যে কোনো একটিতে থাকতে পারে। ধরা যাক এটি প্রথম অবস্থায় আছে, তাহলে এটি প্রথম অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না এতে বাইরে থেকে একটি তড়িৎপ্রবাহ, যাকে বলে ট্রিগার (Trigger) দেওয়া হয়। ট্রিগার দিলে এটি দ্বিতীয় অবস্থায় যাবে, এটি দ্বিতীয় অবস্থাতেই থাকবে চিরদিন; তবে আবার ট্রিগার দিলে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে। এই ট্রিগারের কাজটি ক্লক সিগন্যাল অথবা ক্লক পালস (Clock plus বা CLK) ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। এই ক্লক সিগন্যাল সাধারণত রেকটেংগুলার পাল্স (Rectanguler Pulse) অথবা স্কয়ার ওয়েবও (Sqaure Wave) হতে পারে।

ফ্লিপ-ফ্লপ ল্যাচ (Latch) ও বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর (Bistable Multibibrator) নামেও পরিচিত তবে ল্যাচ বিশেষ ধরনের ফ্লিপ-ফ্লপের নাম। সাধারণত ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি আউটপুট (0 ও 1) থাকে। একটি আউটপুট অপর আউটপুটের বিপরীত হয়। অর্থাৎ একটি আউটপুট Q হলে অন্যটি $\bar{Q}$ হবে।

ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার

ডিজিটাল কম্পিউটার প্রধানত ফ্লিপ-ফ্লপ ও বিভিন্ন লজিক গেট দ্বারা তৈরি। ফ্লিপ-ফ্লপের কাজ বাইনারি ০ বা ১ কে কম্পিউটার মেমরিতে সঞ্চিত রাখা আর লজিক গেট বিভিন্ন গাণিতিক-লজিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। মেমরি উপাদান হিসেবেই ফ্লিপ-ফ্লপেই বেশি ব্যবহার হয়। তাছাড়া রেজিস্টার ইলেকট্রনিক কাউন্টার সার্কিট তৈরিতে ফ্লিপ ফ্লপ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ফ্লিপ ফ্লপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাডার হিসেবেও কাজ করে।
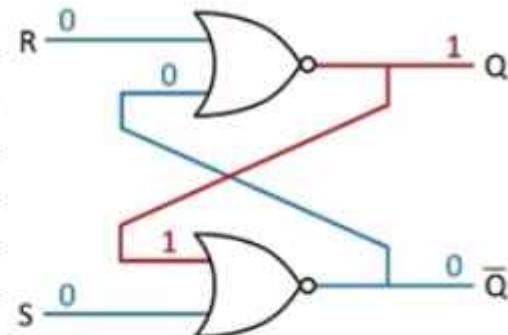
৩.৭.৯ রেজিস্টার (Register)

রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ যার প্রত্যেকটি এক বিট (Bit) তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। একটি *n*-bit রেজিস্টারে *n* সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে যা বাইনারি *n*-bit তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। কাজেই রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ মেমরি উপাদান যা একত্রে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে। ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে কম্বিনেশনাল (Combinational) গেট থাকতে পারে যা কোনো ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করতে পারে। ব্যাপক অর্থে রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এবং গেটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট। রেজিস্টারের ফ্লিপ-ফ্লপ বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করে এবং গেটগুলো এই তথ্যকে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ কখন এবং কীভাবে নতুন তথ্য রেজিস্টারে স্থানান্তর ঘটবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। রেজিস্টারে নতুন তথ্য রাখাকে লোডিং (Loading) বলে।
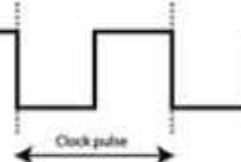
রেজিস্টার হলো CPU-এর অন্তর্গত সঞ্চয় ব্যবস্থা যাতে তথ্য বা নির্দেশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা যায়। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে। রেজিস্টার প্রধান মেমরির অন্তর্গত না হলেও এর গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ হতে পারে। ক্যাশ মেমরি হিসেবে রেজিস্টার বহুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্যালকুলেটর ও ঘড়িতেও রেজিস্টারের ব্যবহার দেখা যায়।

৩.৭.১০ কাউন্টার (Counter)

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা তাতে প্রদত্ত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুনতে পারে। কাউন্টার এক ধরনের রেজিস্টার যা বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাউন্টারের ইনপুট পালস্ (যাকে কাউন্ট পালস্ও বলে) ক্লক পালস্ বা অন্য কোন পালস্ হতে পারে। কাউন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর আসতে পারে বা অনিয়মিতভাবেও আসতে পারে। কাউন্টার বিভিন্ন ধরনের সিকুয়েন্স (Sequence) বা ক্রম অনুসরণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে সরল ও সহজ সিকুয়েন্স হলো বাইনারি সিকুয়েন্স। যে

২০২৪-২০২৫

বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। একটি nবিট বাইনারি কাউন্টার হলো n টি ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট গেট দিয়ে তৈরি করা সার্কিট যা বাইনারি n বিট অর্থাৎ ০ থেকে 2^n -1 পর্যন্ত গণনার সিকুয়েন্সকে অনুসরণ করতে পারে।

কাউন্টার সর্বাধিক যতটি সংখ্যা গুনতে পারে তাকে তার মডিউলাস (Modulus) বা মোড নাম্বার বলে। কোনো কাউন্টারে nটি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকলে তার মডিউলাস 2^n। একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার nটি ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট গেট নিয়ে গঠিত যা বাইনারি n বিট অর্থাৎ ০ থেকে 2^n -1 পর্যন্ত গণনার সিকুয়েন্সকে অনুসরণ করতে পারে। কাজেই এর মোড নাম্বার বা মডিউলাস হলো 2^n। কোনো কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস বৃদ্ধি করা যায় ঐ কাউন্টারে ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ৩ বিটের বাইনারি সংখ্যা কীভাবে কাউন্ট করা হয় তা চিত্রে-৩.২.৯ দেখানো হলো। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে (১) লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটি (LSB) প্রতিবার টোগল করছে। (২) দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কটি প্রতি দুইবার পর পর টোগল করছে এবং (৩) তৃতীয় স্থানের অঙ্কটি প্রতি চারবার পর পর টোগল করছে।

ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে কাউন্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন: ১। ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে, ২। টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের কাজে, ৩। ডিজিটাল ঘড়িতে, ৪। ডিজিটাল কম্পিউটারে ও ৫। অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার কাজে ব্যহার করা হয়।

৩.৮ ডিজিটাল ডিভাইস পরিচিতি

ডিজিটাল ডিভাইস বলতে ঐ সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে বুঝানো হয় যাতে ডিজিটাল সিগন্যাল বা ডিজিটাল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বে সর্বব্যাপী (Ubiquitous) হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন
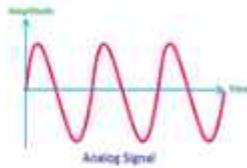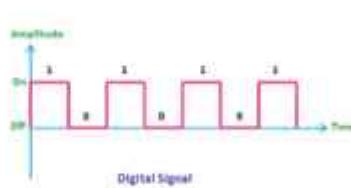
শিল্পের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল ডিভাইসের কার্যক্রম ডিজিটাল সংকেত বা সিগন্যালের সাথে সম্পার্কযুক্ত।

ডিজিটাল ডিভাইসের উদাহরণ-

- ডিজিটাল কম্পিউটার : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ফ্যাবলেট ইত্যাদি।
- কমিউনিকেশন ডিভাইস: স্মার্ট ফোন, ফিচার ফোন, ওয়াকিটকি ইত্যাদি।
- স্টোরেজ ডিভাইস : এসএসডি, ফ্লাশ ড্রাইভ ইত্যাদি।
- ইনপুট ডিভাইস : কিবোর্ড, মাইক, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।
- আউটপুট ডিভাইস : মনিটর (ডিজিটাল), প্রিন্টার, স্পিকার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।
- প্রসেসিং ডিভাইস : বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর, মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি।

ডিজিটাল ডিভাইসের গঠন উপাদান : ডিজিটাল ডিভাইসের ইলেকট্রোনিক সার্কিটগুলো সাধারণত লজিক গেটের বিভিন্ন বৃহৎ সমাবেশ থেকে তৈরি করা হয়। কাজের সুবিধার্থে প্রায়শই এই সুসংহত সার্কিটগুলোকে প্যাকেজিং করা হয় যা আইসি (IC-Integrated circuits) নামে পরিচিত। কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জটিল ডিভাইসগুলিতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, ফ্লিপ-ফ্লপ, রেজিস্টার, কাউন্টার ইত্যাদির বিভিন্ন সমাবেশ থাকতে পারে। এ সকল উপাদান তৈরির মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল অপারেশন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউনিকোডে বিটের সংখ্যা কত?

ক. 4	খ. 8
গ. 16	ঘ. 32

২. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

ক. 2^2	খ. 2^4
গ. 2^8	ঘ. 2^{16}

৩. 4, 8, C অনুক্রমটির পরের মান কত?

ক. D	খ. F
গ. 10	ঘ. 16

৪. দশমিক সংখ্যা -12 এর 2's complement কত?

ক. 00001100	খ. 11111100
গ. 11110011	ঘ. 11110100

৫. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?

ক. E.3	খ. E.8
গ. E.C	ঘ. C.E

৬. যে গেটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-

i. NAND
ii. NOR
iii. OR

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
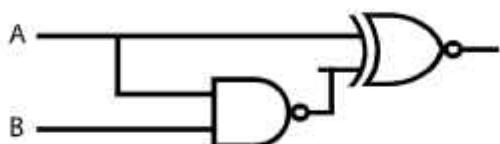
৭. F এর মান কোনটি?

ক. AB   খ. $\overline{A}B$

গ. $A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\,\overline{B}$

৮. XNOR এর স্থলে কোন গেট বসালে আউটপুট 0 হবে?

ক. AND   খ. OR

গ. NAND   ঘ. NOR

৯. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান-

i. $(66)_8$

ii. $(54)_{10}$

iii. $(36)_{16}$

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.
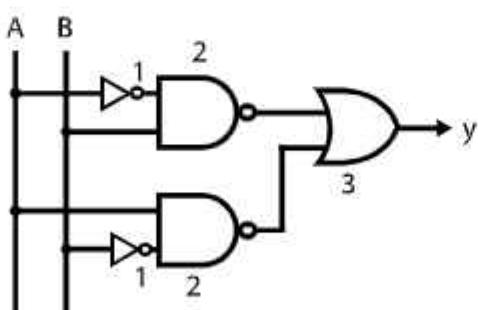
ক. 2 এর পরিপূরক কী?

খ. বাইনারি 1+1 ও বুলিয়ান 1+1 এক নয়- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক অনুসারে y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের 2 ও 3 নম্বর চিহ্নিত গেট দুটির পারস্পরিক পরিবর্তনে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায় তা বাইনারি যোগের বর্তনীতে ব্যবহার উপযোগী–যুক্তি দাও।

২. X, Y ও Z তিন বন্ধু বাজারে গিয়ে যথাক্রমে $(110110)_2$, $(36)_8$ এবং $(A9)_{16}$ টাকার বই কিনল।

২০২৪-২০২৫

ক. কোড কী?

খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকের "Z" এর ক্রয়কৃত বইয়ের মূল্য ডেসিমেল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

ঘ. "Y" এর চেয়ে "X" বেশি মূল্যের বই কিনল। পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩.
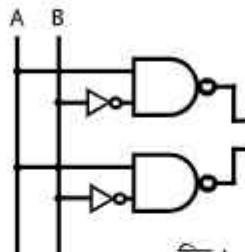
চিত্র-১ চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী?

খ. M (M+M) = M ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্র-১ এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও।

ঘ. চিত্র-২ এর প্রতিনিধিত্বকারী গেট দিয়ে চিত্র-১ এর সমতূল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

Introduction to Web Design and HTML

ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন পুরো পৃথিবী সংযুক্ত হয়ে আছে

আমরা সবাই জানি ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইমেইল, ফাইল-শেয়ারিং, ভয়েস কলিং এরকম বিভিন্ন তথ্য ও সেবা আদান-প্রদান করা যায়। এদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মডেল হচ্ছে ওয়েব। ওয়েব হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়েবের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে দুটি যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমানে ওয়েবকে আমরা বলতে পারি তথ্যভাণ্ডার যেখানে অনেক তথ্য রিসোর্স, ওয়েব ডকুমেন্ট আকারে সঞ্চিত আছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওয়েবের নানা ধরনের তথ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে গেছি। এই অধ্যায়ে কীভাবে একটি কার্যকর ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ওয়েবসাইটের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে;
- এইচটিএমএল-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ব্যাবহারিক

- এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে পারবে;
- ওয়েবসাইট পাবলিশ করতে পারবে।

৪.১ ওয়েব ডিজাইনের ধারণা (Concept of Web Design)

কম্পিউটারের ইতিহাসের প্রথম যুগে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন প্রতিরক্ষা বা সেনাবাহিনীর কাছেই শুধু কম্পিউটার ছিল। এই কম্পিউটারগুলো প্রচুর পরিমাণে হিসাব নিকাশ করা, গবেষণালব্ধ তথ্য যাচাই-বাছাই, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার কাজেই তখন ব্যবহৃত হতো। অচিরেই এক কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় এবং ধাপে ধাপে ইন্টারনেট ব্যবস্থা তৈরি হয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট বা ফাইল এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তরের চাহিদা তৈরি হয়। এই চাহিদা থেকেই টিম বার্নার্স-লি (Tim Berners-Lee) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www: world wide web) বা সংক্ষেপে ওয়েব তৈরি করেন। তিনি তখন সুইজারল্যান্ডের CERN নামক একটি গবেষণাগারে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি এমন একটি ওয়েবের ধারণা প্রস্তাব করেন যার মাধ্যমে আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)* ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বিভিন্ন ডকুমেন্ট পাঠানো যাবে। টিমের ধারণা ছিল ওয়েবের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যেন তাদের নিজ দেশে বসেই CERN–এর কম্পিউটার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি প্রস্তাব করেন, একবারে শত শত পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট ফাইল ডাউনলোড করার ব্যবস্থা না করে সব পৃষ্ঠা আলাদা আলাদাভাবেই যেন ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা যায়। তাতে করে একেকটি পৃষ্ঠায় অন্যান্য দরকারি পৃষ্ঠার লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া যাবে। যার যার যেসব পৃষ্ঠা দরকার হবে তারা শুধু সেই সমস্ত পৃষ্ঠাই ডাউনলোড করবে। তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করে পাঠানো লিখিত তথ্যের নাম দেন হাইপারটেক্সট (Hypertext)। এই হাইপারটেক্সটগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ঠিকানায়, যার নাম হবে হাইপারলিঙ্ক (Hyperlink)। লিখিত তথ্যের বাইরে ছবি, অডিও ও ভিডিও জাতীয় তথ্যকে বলা হবে হাইপারমিডিয়া (Hypermedia)। টিম চিন্তা করেন, এমন একটি উপায় করতে হবে যেন লিঙ্কগুলো মাউস দিয়ে ক্লিক করেই ব্যবহারকারীরা সেই হাইপারলিঙ্ক থেকে হাইপারটেক্সট পেতে পারেন। 1990 সালে তিনি তার সহকর্মীদের সহায়তায় তার ধারণাটিকে আরো সুগঠিত রূপ দিয়ে পুনরায় প্রস্তাব করেন। ওয়েবের এই তথ্যগুলো অন্য কম্পিউটারে দেখার জন্য তিনি একটি সফটওয়্যারও তৈরি করেন, যা হচ্ছে একটি ওয়েব ব্রাউজার।

এই মূল ধারণার ওপরেই তৈরি হয়েছে আজকের ওয়েব। বর্তমানে ইন্টারনেটে অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে। এই ওয়েবসাইটগুলো নিজের কম্পিউটার থেকে দেখা বা ব্রাউজ করার জন্য আমরা সাধারণত বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করি। এই সফটওয়্যারগুলোকে বলা হয় ওয়েব ব্রাউজার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজার রয়েছে। যেমন— মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, সাফারি, ওপেরা, মাইক্রোসফট এজ্ ইত্যাদি।

---

* আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) : ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি যন্ত্র (যেমন— কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি)কে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার জন্য একটি বিশেষ নম্বর ব্যবহার করা হয় যাকে আইপি অ্যাড্রেস বলে। আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ইন্টারনেটে একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের ঠিকানা।

২০২৪-২০২৫

একসময় ওয়েবসাইটগুলো ছিল স্ট্যাটিক (static), অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন তথ্য রাখা হতো এবং ব্যবহারকারী ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সেই তথ্য দেখতে পেতেন। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ ওয়েবসাইট আর স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট নয়, বরং ডায়নামিক (dynamic) ওয়েবসাইট যেখানে ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ইনপুট দেন আর সেই ইনপুট অনুসারে বিভিন্ন আউটপুট তৈরি হয়। এজন্য এগুলোকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনও বলা হয়। এরকম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কিছু উদাহরণ হচ্ছে google.com, services.nidw.gov.bd, passport.gov.bd ইত্যাদি।

একটি ওয়েবসাইটের দুটি অংশ থাকে— সার্ভার ও ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে সার্ভারের কাছে ডেটা পাঠায় যাকে বলা হয় রিকোয়েস্ট (request)। সার্ভার সেই ডেটা অনুসারে ক্লায়েন্টের কাছে জবাব বা রেসপন্স (response) পাঠায়। যেমন— একটি ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে চাইলে ব্রাউজারে বিভিন্ন তথ্য লিখে ব্যবহারকারী একটি বাটনে ক্লিক করেন, তখন সেই ডেটা সার্ভারের কাছে যায় এবং সার্ভার ডেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি কোনো সমস্যা না পায় (যেমন— ইতিমধ্যে এই নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আছে), তখন সার্ভার ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এবং ক্লায়েন্টের কাছে রেসপন্স পাঠায়। আবার কোনো কারণে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা না গেলেও ক্লায়েন্টের কাছে রেসপন্স পাঠায়।

চিত্র 4.1 : ইন্টারনেটে সংযুক্ত সার্ভার ও ক্লায়েন্ট

সার্ভারে যে সফটওয়্যার চলে, সেটি সাধারণত একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয়। এসব কাজের জন্য জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে পিএইচপি, পাইথন, জাভা, রুবি ইত্যাদি।

ব্রাউজারে যে ওয়েবসাইট কিংবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন চলে, সেখানে ব্যবহার করা হয় HTML ও CSS। HTML-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Hyper Text Markup Language। এটি কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয়, বরং একে মার্কআপ ভাষা বলা যায়। এর কাজ হচ্ছে কোনো তথ্য ব্রাউজারে প্রদর্শনের উপযোগী করা। এখানে যেসব ট্যাগ (tag) ব্যবহার করা হয়, ব্রাউজার সেগুলো বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী ওয়েবসাইটে ডেটা প্রদর্শন করে।

শুধু এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েবসাইট তৈরি করা গেলেও, ওয়েবসাইটকে আরো আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করা হয় CSS— যার পূর্ণরূপ হচ্ছে, Cascading Style Sheet। আধুনিক সব ওয়েবসাইটেই HTML-এর সঙ্গে CSS ব্যবহার করা হয়।

২০২৪-২০২৫

ডায়নামিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সবসময়ই যে সার্ভারের কাছে ডেটা পাঠাতে হবে, এমনটি নয়। বরং অনেক কাজ ক্লায়েন্ট অংশেই করে ফেলা সম্ভব। সেজন্য ওয়েবসাইটের ক্লায়েন্ট অংশে প্রোগ্রামিং করা যায়। এই কাজের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট (Javascript)।

৪.১.১ ওয়েবসাইটের কাঠামো (Web Site Structure)

একটি ওয়েবসাইটে এক বা একাধিক ওয়েব পেজ থাকে। সাধারণত একেবারে প্রথমে যে পৃষ্ঠা থাকে তাকে ওয়েবসাইটের হোমপেজ (Homepage) বলা হয়। এছাড়া ওয়েবসাইটের ধরন অনুযায়ী ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেজ থাকে। যেমন— অডিও-ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইটে একেকটি অডিও/ভিডিও'র জন্য একেকটি পেজ থাকতে পারে। আবার, একেকজন ব্যবহারকারীর নিজস্ব একেকটি পেজ থাকতে পারে। আবার ব্লগ জাতীয় ওয়েবসাইটে প্রতিটি ব্লগ পোস্টের জন্য একেকটি পেজ থাকতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কিছু প্রচলিত পেজ থাকে, যেমন— contact us (যোগাযোগ), about us (আমাদের সম্পর্কে), frequently asked questions– FAQ (প্রায়শ-জিজ্ঞাস্য-প্রশ্ন) ইত্যাদি।

৪.২ এইচটিএমএল-এর মৌলিক বিষয়সমূহ (HTML Basics)

এ অধ্যায়ের ৪.২ পাঠ অংশটুকু পুরোপুরি ব্যাবহারিক। প্রোগ্রামিং করার ব্যবস্থা আছে (কম্পিউটারে কিংবা স্মার্টফোনে) শুধু সেরকম পরিবেশে পরের অংশটুকু শিক্ষার্থীর জন্য অর্থপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

HTML নিয়ে কাজ শুরু করতে চাইলে প্রথমেই একটি ফাইল তৈরি করতে হবে। যে কোনো নাম দিলেই চলবে, এক্সটেনশন হবে .html। যেমন— mypage.html। এখন এই ফাইলের মধ্যে HTML কোড লিখতে হবে। ফাইলটি ব্রাউজার দিয়ে খোলা হলো, তাহলে একটি ফাঁকা পেজ দেখা যাবে। কারণ, ফাইলটিতে এখনো কিছু লেখা হয়নি। HTML ফাইল এডিট করার জন্য যে কোনো একটি টেক্সট এডিটর ব্যবহার করলেই চলবে, যেমন— নোটপ্যাড, নোটপ্যাড++, সাবলাইম টেক্সট ইত্যাদি।

HTML উপাদান (HTML Element)

একটি বইয়ে সাধারণত কী কী অংশ থাকে সেটি বিবেচনা করা যাক। বইয়ের একাধিক খন্ড থাকতে পারে, একটি খন্ডে একাধিক অধ্যায় থাকে। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার শিরোনাম বা হেডিং, সাবহেডিং, অনুচ্ছেদ বা

প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে। এছাড়াও বইতে বিভিন্ন ছবি, ছবির ক্যাপশন, সারণি বা টেবিল ইত্যাদি অংশ থাকতে পারে। তেমনি একটি HTML পেজেও বিভিন্ন অংশ বা উপাদান থাকে। এ উপাদানগুলোকে বলা হয় HTML এলিমেন্ট (HTML Elements)।

HTML-এর এলিমেন্ট লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় ট্যাগ। ট্যাগকে অনেকটা ব্র্যাকেট বা বন্ধনীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণত এলিমেন্টের শুরু বোঝাতে একটি ওপেনিং ট্যাগ এবং শেষ বোঝাতে একটি ক্লোজিং ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। ওপেনিং ট্যাগ, দুই ট্যাগের মধ্যবর্তী কনটেন্ট ও ক্লোজিং ট্যাগ মিলে যা হয় তা-ই একটি এলিমেন্ট। তবে কিছু ট্যাগ আছে যাদের মধ্যে কোনো কনটেন্ট থাকে না, তাই এদের ট্যাগও থাকে না। এদেরকে বলা হয় এম্পটি (empty) ট্যাগ।

ওপেনিং ও ক্লোজিং ট্যাগের গঠন হয় এরকম, <tag _name> ও </tag _name>। দুটি অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভেতরে ট্যাগের নাম লিখলে হয় ওপেনিং ট্যাগ, আর ক্লোজিং ট্যাগ হয় এ রকম, </...>। অর্থাৎ, ট্যাগের নামের আগে একটি অতিরিক্ত ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ চিহ্ন (Forward Slash –/) দেওয়া হয়। ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের ভেতরের লেখা, ট্যাগের নাম একই হতে হবে।

নিচে একটি HTML কোড দেখানো হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Hello World!
</body>
</html>
```

কোডটি টাইপ করে ফাইলটি সেভ করে ব্রাউজারে ওপেন করলে স্ক্রিনে Hello World! লেখাটি দেখাবে।
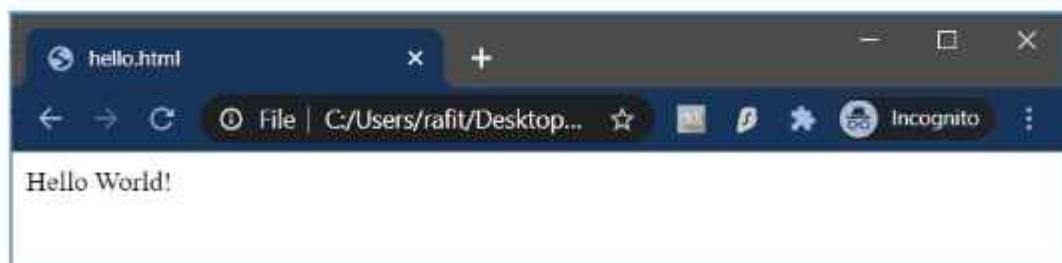
উপরের কোডটি ভালো করে লক্ষ করা যাক। প্রথম লাইনে আছে <!DOCTYPE html>, যাকে বলা হয় ডকুমেন্ট টাইপ ডিক্লারেশন। এর দ্বারা ব্রাউজার বুঝতে পারে যে ডকুমেন্টটি HTML 5 স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে লেখা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী রেন্ডার (প্রদর্শন) করে। এটি আসলে ডকুমেন্টের অংশ নয়, তবে লেখা জরুরি।

HTML যাবতীয় এলিমেন্ট রাখতে হয় একটি মূল এলিমেন্টের ভেতরে, সেটি হচ্ছে html। সেজন্য দ্বিতীয় লাইনে আছে <html> ট্যাগ, ডকুমেন্টের শেষও কিন্তু হয়েছে </html> ট্যাগ দিয়ে। এরপর আছে <body> ট্যাগ। ব্রাউজারে আমরা যা কিছু দেখি তার সবই থাকে body এলিমেন্টের ভেতরে। বডির ভেতরে আমরা লিখেছি Hello World!, এই লেখাটিই ব্রাউজার দেখাবে।

বডি এলিমেন্ট যেমন আছে, তেমনি একটি হেড এলিমেন্টও আছে। ওয়েব পেজের দৃশ্যমান সবকিছু দেওয়া হয় বডির ভেতরে, আর হেডের ভেতরে ওয়েব পেজ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সেটিংস ঠিক করা, স্টাইল, স্ক্রিপ্ট এসব নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি কাজ করা হয়। ব্রাউজারের ট্যাবে ওয়েবপেজের যে শিরোনাম বা টাইটেল (title) দেখা যায় তা লেখা থাকে হেডে। উপরে তৈরি পেজে একটি টাইটেল যুক্ত করে দেওয়া যাক।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My first html doc</title>
</head>
<body>
Hello World!
</body>
</html>
```

এই কোডটি লিখে সেভ করে ব্রাউজারে ওপেন করলে আগের মতোই Hello World! দেখা যাবে। একইসঙ্গে ব্রাউজারের টাইটেল বারে টাইটেলটিও দেখা যাবে। এখানে <title> ... </title> ট্যাগ দিয়ে ওয়েব পেজের টাইটেল দেখানো হয়েছে।

HTML-এর এলিমেন্ট লেখার নিয়ম

একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টে এলিমেন্টগুলো একটির পরে একটি থাকতে পারবে। আবার, একটি এলিমেন্টের ভেতর এক বা একাধিক এলিমেন্ট থাকতে পারে। তবে একটি এলিমেন্ট অন্য একটি এলিমেন্টকে সমাপতিত (overlap) করতে পারবে না। এলিমেন্টগুলোকে অসংখ্য বিভিন্ন আকারের কৌটার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বড় কৌটার ভেতরে ছোট ছোট কয়েকটি কৌটা থাকতে পারে। একটির পাশে

২০২৪-২০২৫

অন্যটি বা একটির উপর অন্য কৌটা থাকতে পারে। কিন্তু কখনোই একটি কৌটা অন্য দুই বা ততোধিক কৌটার ভেতরে থাকতে পারবে না। এখানে কৌটার মুখ ও তলাকে ওপেনিং ও ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে চিন্তা করা যেতে পারে।

```
<p><em>Abracadabra</p></em> ভুল
<p><em>Abracadabra</em></p> সঠিক
```

চিত্র 4.2 : ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়েব পেজের বিভিন্ন অংশ

হেডিং (Heading)

খবরের কাগজ পড়ার সময় বিভিন্ন রকম শিরোনাম বা হেডিং দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান শিরোনাম থাকে অনেক বড় অক্ষরে, তারপর আরো বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন শিরোনাম থাকে। সেরকম এইচটিএমএল পেজেও বিভিন্ন আকারের হেডিং দেওয়া যায়। এইচটিএমএলে ছয়টি হেডিং এলিমেন্ট রয়েছে। এগুলো

যথাক্রমে h1, h2, h3, h4, h5 ও h6 দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে h1-এর আকার সবচেয়ে বড়, h6– এর আকার সবচেয়ে ছোট। কোনটির আকার কেমন তা জানার জন্য একটি কোড দেখানো হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML Heading</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is heading 1</h1>
    <h2>This is heading 2</h2>
    <h3>This is heading 3</h3>
    <h4>This is heading 4</h4>
    <h5>This is heading 5</h5>
    <h6>This is heading 6</h6>
  </body>
</html>
```

কোডটি সেভ করে ব্রাউজারে ওপেন করলে এ রকম দেখা যাবে—
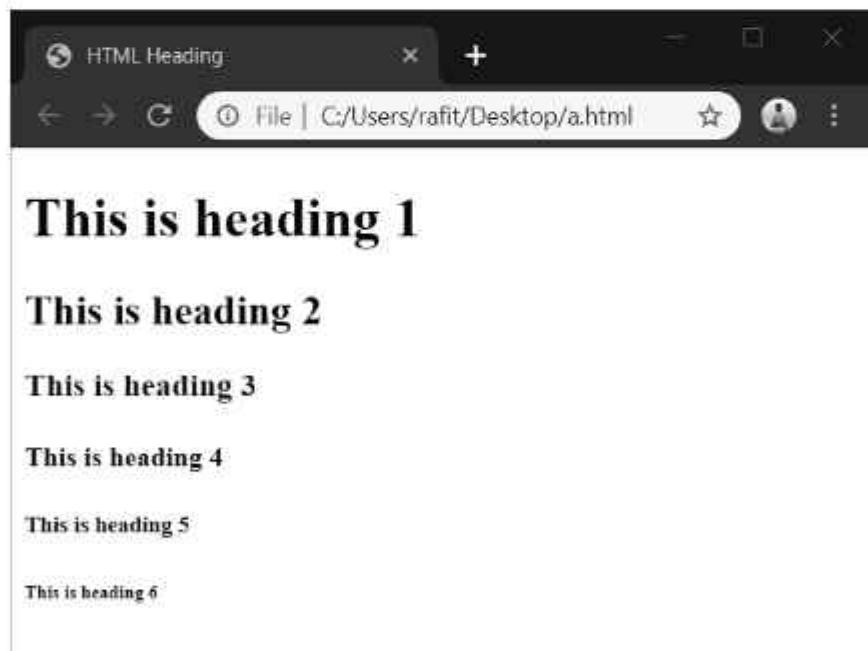
চিত্র 4.3 : বিভিন্ন আকারের এইচটিএমএল হেডিং

প্রয়োজনীয় কিছু এলিমেন্ট

এখন mypage.html ফাইলটিতে আরো কিছু কোড যোগ করা হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>This is my first HTML page</title>
</head>
<body>
Hello World!
This is an html document.
</body>
</html>
```

এখন ফাইলটি সেভ করে ব্রাউজারে পেজটি রিফ্রেশ করতে হবে। ব্রাউজারের রিফ্রেশ বা রিলোড বাটন চেপে কিংবা কিবোর্ডে F5 বাটন চেপে পেজ রিফ্রেশ করা যায়। তাহলে দেখা যাবে উপরের বক্সের ভেতরের দুটি লাইন ব্রাউজারে এক লাইনে দেখাচ্ছে। কোডে যদিও আলাদা আলাদা লাইনে লেখা হয়েছে।

তাহলে লেখাটি দুই লাইনে দেখানোর উপায় কী? সেক্ষেত্রে একটি নতুন এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে যার নাম br। এটি একটি ফাঁকা বা এম্পটি এলিমেন্ট। এর কোনো ক্লোজিং বা শেষ ট্যাগ নেই।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>This is my first HTML page</title>
</head>
<body>
Hello World! <br>
This is an HTML document.
</body>
</html>
```

এখন ফাইলটি সেভ করে ব্রাউজারে পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখা যাবে এবারে দুই লাইনে আলাদা করে লেখাটি দেখাচ্ছে।
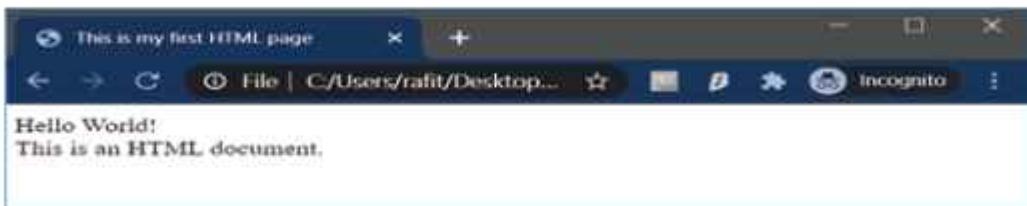
আবার অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) লিখতে হলে p এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>This is my first HTML page</title>
</head>
<body>
  Hello World! <br>
  <p>This is an html page. This is paragraph one.</p> <p>This
  is paragraph two.</p>
</body>
</html>
```

কোডটি সেভ করে ব্রাউজারে ওপেন করলে নিচের মতো দেখাবে—

চিত্র 4.4 : ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফ তৈরি করা

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ-এর মধ্যে কিন্তু আলাদা করে লাইন ব্রেক (<br>) দিতে হয়নি। p এলিমেন্ট নিজেই একটি ফাঁকা জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। তবে চাইলে কোনো প্যারাগ্রাফের মধ্যেও লাইন ব্রেক দেওয়া যায়।

```
<p>This is an html page. This is <br> paragraph one.</p>
<p>This is paragraph two.</p>
```
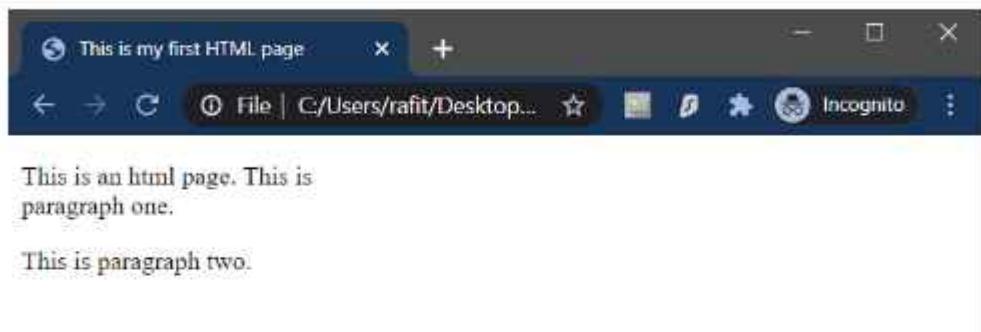
লাইন ব্রেকের তুলনায় প্যারাগ্রাফ ব্রেকে ক্ষেত্রে একটু বেশি পরিমাণে ফাঁকা জায়গা থাকে।

এছাড়া আনুভূমিক রেখা (horizontal line) আঁকার জন্য রয়েছে হরাইজন্টাল রুল এলিমেন্ট। একে hr দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটিও একটি ফাঁকা এলিমেন্ট।

```
<p>This is an html page. This is paragraph one.</p> <hr>
<p>This is paragraph two.</p>
```
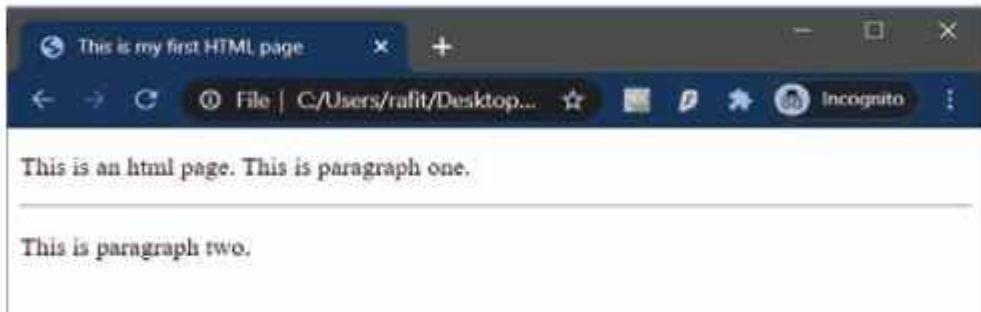
টেক্সট ফরম্যাটিং (Text Formating)

টেক্সটের সাধারণ ফরম্যাটিংয়ের মধ্যে আছে বোল্ড করা, ইটালিক করা, আন্ডারলাইন করা ইত্যাদি। HTML-এ এগুলো করার জন্য যথাক্রমে b, i ও u এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Text Formating</title>
</head>
<body>
  <p>This is normal text</p>
  <p><b>This is bold text</b></p>
  <p><i>This is italic text</i></p>
  <p><u>This is underlined text</u></p>
</body>
</html>
```
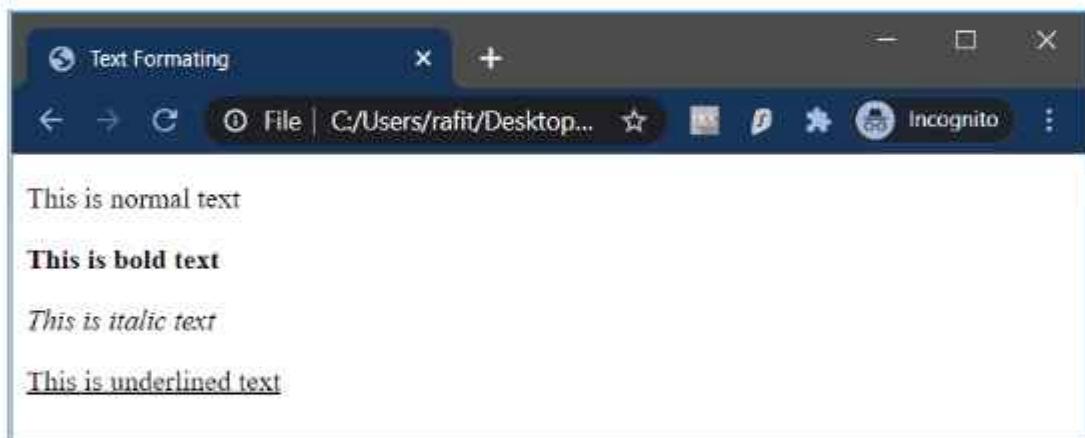
আরো কিছু সাধারণ ফরম্যাটিংয়ের মধ্যে আছে সুপারস্ক্রিপ্ট (লেখাকে উপরে উঠানো), সাবস্ক্রিপ্ট (নিচে নামানো) ইত্যাদি।

```
<p>This line contains a <sup>super</sup>script and a
<sub>sub</sub>script.</p>
<p>(a + b)<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> + 2ab +
b<sup>2</sup></p>
<p>f<sub>n</sub> = f<sub>n-1</sub> + f<sub>n-2</sub></p>
```
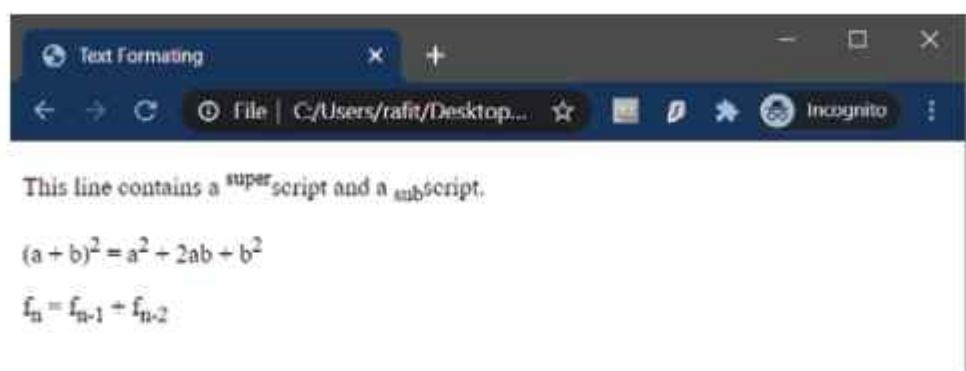
এছাড়াও কোনো টেক্সটকে সাধারণের চেয়ে বড় বা ছোট করার জন্য big ও small নামের দুটি এলিমেন্ট আছে।

কখনো কখনো পেজের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর (emphasize) করানোর প্রয়োজন হয়। আবার কখনো কখনো বক্তব্যের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে বিশেষ জোর দিয়ে বলার (লেখার) প্রয়োজন হয়। এই দুটি কাজের জন্য রয়েছে em ও strong নামের দুটি এলিমেন্ট।

```
<p>The word <em>Emphasize</em> means giving special value to
something.
The word <strong>Strong</strong> is something stronger than
emphasizing.</p>
```
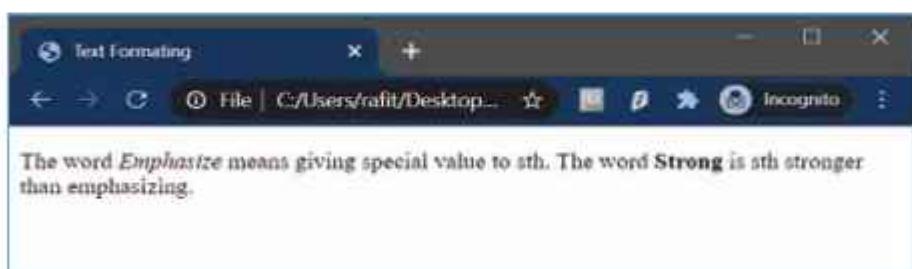
তালিকা বা লিস্ট (List)

এইচটিএমএল-এ তালিকা তৈরির জন্য আছে ul, ol এবং li ট্যাগ।

নিচে বাংলাদেশের বিভাগগুলোর তালিকা তৈরির কোড দেখানো হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List Demo</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Dhaka</li>
    <li>Rajshahi</li>
    <li>Chattogram</li>
    <li>Khulna</li>
    <li>Rangpur</li>
    <li>Barishal</li>
    <li>Sylhet</li>
    <li>Mymensingh</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

উপরের কোডের আউটপুট দেখাবে নিচের মতো।
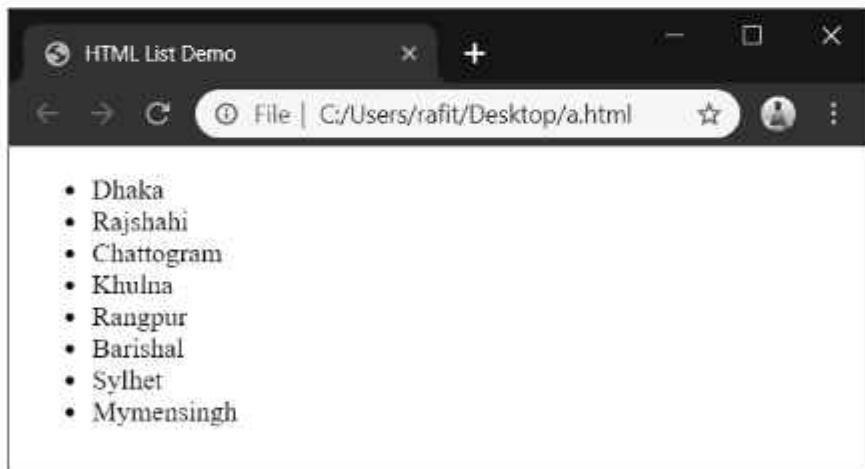
চিত্র 4.5 : তালিকা বা লিস্ট আকারে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের নাম

এখানে লিস্টের জন্য দুটি এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, ul এবং li। ul মানে আনঅর্ডারড লিস্ট (unordered list) এবং li মানে লিস্ট আইটেম (list item)। ক্রমবিহীন তালিকা তৈরি করতে ul এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। li এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয় তালিকার উপাদানগুলো রাখতে।

আর ক্রমসহ তালিকা তৈরি করতে ul-এর পরিবর্তে ol ব্যবহার করতে হবে। এখানে ol মানে অর্ডারড লিস্ট (ordered list)।

২০২৪-২০২৫

HTML-এ তালিকার ভেতরেও তালিকা তৈরি করা যায়। যেমন— সিলেট বিভাগের জেলাগুলো যদি তালিকায় থাকে,

- Barishal
- Sylhet
    - Sunamganj
    - Sylhet
    - Habiganj
    - Moulvibazar
- Mymensingh

এরকম তালিকার ভেতরে তালিকা বা নেস্টেড তালিকা (nested list) তৈরি করার জন্য লিস্টের ভেতরে আরেকটি লিস্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে।

```
<body>
  <ul>
    <li>Dhaka</li>
    <li>Rajshahi</li>
    <li>Chattogram</li>
    <li>Khulna</li>
    <li>Rangpur</li>
    <li>Barishal</li>
    <li>Sylhet</li>
    <ul>
      <li>Sunamganj</li>
      <li>Sylhet</li>
      <li>Habiganj</li>
      <li>Moulvibazar</li>
    </ul>
    <li>Mymensingh</li>
  </ul>
</body>
```

উপরের কোডটি একটি HTML ডকুমেন্টে রাখলে নিচের ছবির মতো আউটপুট দেখা যাবে।
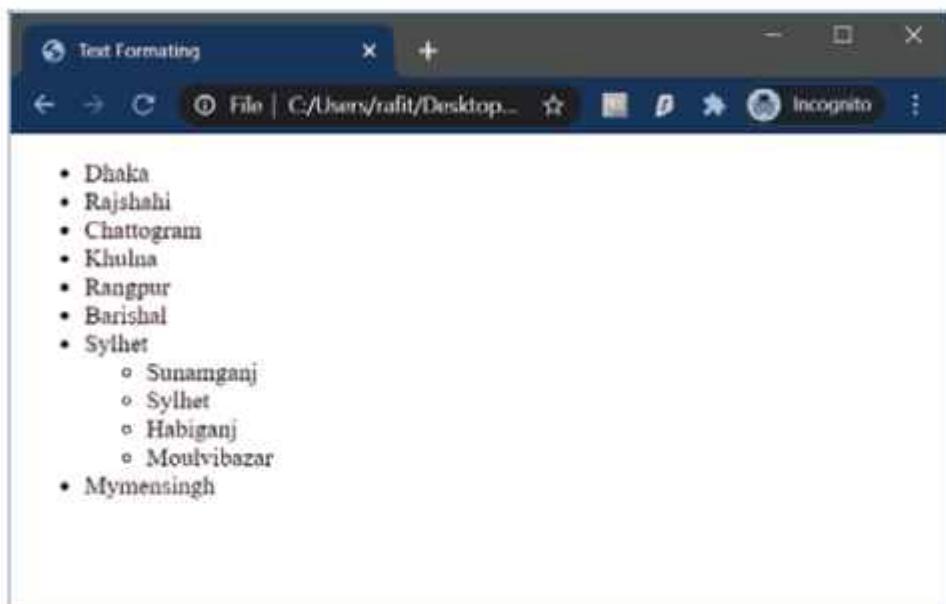
চাইলে এভাবে জেলার ভেতরে উপজেলারও আরেকটি লিস্ট তৈরি করা যায়।

যখন ক্রমবিহীন (unordered) কোনো তালিকা তৈরি করা হয়, তখন তালিকার উপাদানের আগে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। HTML-এ একটি গোল কালো ফোঁটা (ডিস্ক— disc) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তবে চাইলে এখানে সার্কেল (circle) বা স্কয়ার (square)-ও ব্যবহার করা যায়। সেজন্য এইচটিএমএল উপাদানের ভেতরে অ্যাট্রিবিউট (attribute) ব্যবহার করতে হবে। অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এলিমেন্টের একটি অংশ, যা এলিমেন্টের কার্যক্ষমতা বা ফাংশনালিটি বৃদ্ধি করে। একটি এলিমেন্টের একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম নিচের মতো—

< tag_name attribute_name = "value">

অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউটের নামের পর একটি সমান চিহ্ন দিয়ে ডাবল কোটেশনের ভেতরে এর মান লিখতে হয়। তালিকায় স্কয়ার বা সার্কেল চিহ্ন ব্যবহার করতে চাইলে type নামের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।

```
<ul type="square">
  <li>item 1</li>
  <li>item 2</li>
</ul>
```

পূর্বের কোডটি লিখলে লিস্ট আইটেমে বর্গাকৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। একইভাবে <ul type="circle"> বসালে বৃত্তাকৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হবে।

এইচটিএমএল কোড	আউটপুট
<ul type="square"> - Item 1 - Item 2 	▪ Item 1 ▪ Item 2
<ul type="circle"> - Item 1 - Item 2 	o Item 1 o Item 2
<ul type="disc"> - Item 1 - Item 2 	• Item 1 • Item 2

অর্ডারড লিস্টের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যেমন— ছোট হাতের বা বড় হাতের রোমান হরফ (i, ii, iii বা I, II, III) অথবা ইংরেজি হরফ (a, b, c; A, B, C) ইত্যাদি। এখানেও type অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।

এইচটিএমএল কোড	আউটপুট
<ol type="i"> - Item 1 - Item 2 	i. Item 1 ii. Item 2
<ol type="I"> - Item 1 - Item 2 	I. Item 1 II. Item 2
<ol type="a"> - Item 1 - Item 2 	a. Item 1 b. Item 2
<ol type="A"> - Item 1 - Item 2 	A. Item 1 B. Item 2
<ol type="1"> - Item 1 - Item 2 	1. Item 1 2. Item 2

অর্ডারড লিস্টে আবার কখনো কখনো কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে শুরু করতে হতে পারে। যেমন— কোনো ক্লাসের 21 থেকে 30 রোলধারী শিক্ষার্থীর তালিকা দেখাতে হতে পারে। এক্ষেত্রে start অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। টাইপ a, A, i যাই হোক না কেন, start অ্যাট্রিবিউটের মান সব সময় সংখ্যা (numeric) হবে।

```
<ol type="1" start="21">
  <li>Nayeem Sheikh</li>
  <li>Robiul Hasan</li>
  … … …
</ol>
```

হাইপারলিংক (Hyperlink)

ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময় বিভিন্ন লিংকে ক্লিক করা যায়। লিংকে ক্লিক করলে এক পেজ থেকে অন্য পেজে বা একই পেজের বিভিন্ন অংশে যাওয়া যায়। লিংক মানে সংযোগ। এক পেজের সঙ্গে অন্য পেজের বা একই পেজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সংযোগ করার পদ্ধতি, তাকে লিংক বলে। এই লিংক যখন হাইপারটেক্সটে HTML-এ থাকে তখন তাকে হাইপারলিংক বলে।

একটু আগে বাংলাদেশের বিভাগগুলোর যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেই তালিকায় এখন হাইপারলিংক যুক্ত করা হবে যেন Dhaka লেখাটিতে ক্লিক করলে ঢাকা বিভাগের ওয়েবসাইটে যাওয়া যায়। সেজন্য যে এলিমেন্টটি ব্যবহার করতে হবে তার নাম অ্যাংকর (anchor)। এর প্রথম অক্ষর a নিয়ে এই এলিমেন্টের ট্যাগ গঠিত।

```
<li><a href="http://www.dhakadiv.gov.bd">Dhaka</a></li>
```

ব্রাউজারে গিয়ে পেজটি রিফ্রেশ করলে দেখা যাবে যে Dhaka লেখাটি নীল রঙের এবং আন্ডারলাইন করা হয়ে গিয়েছে। ওতে ক্লিক করলেই ঢাকা বিভাগের ওয়েবসাইটে যাওয়া যাবে। ঢাকা বিভাগের ওয়েবসাইটের address বা URL (URL: Uniform Resource Locator) বসানো হয়েছে href অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে।

নিজে করি ১ : এখন উপরের কোডটি সম্পূর্ণ করতে হবে, যেন প্রত্যেকটি বিভাগের নামে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওয়েবসাইট খুলে যায়।

আবার যদি এমন প্রয়োজন হয় যে, লিংকে ক্লিক করলে সেটি ওয়েব ব্রাউজারের নতুন একটি ট্যাবে খুলুক, তাহলে আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা যায়, সেটি হলো target অ্যাট্রিবিউট। target অ্যাট্রিবিউটের মান হিসেবে _self ব্যবহার করলে লিংকটি একই ট্যাবে খুলবে, আর _blank ব্যবহার করলে একটি নতুন ট্যাবে খুলবে।

২০২৪-২০২৫

```
<li><a href="http://www.dhakadiv.gov.bd"
target="_blank">Dhaka</a></li>
```

ছবি বা ইমেজ (Image)

ওয়েবপেজে ছবি যোগ করতে img এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। এটি একটি এম্পটি এলিমেন্ট, অর্থাৎ এর কোনো ক্লোজিং বা শেষ ট্যাগ নেই।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Image in html</title>
</head>
<body>
  <img src="image.jpg">
</body>
</html>
```

কোডটি যে ফোল্ডারে আছে, সেই ফোল্ডারে পছন্দমতো একটি ছবি এনে image.jpg নাম দিয়ে দিতে হবে। এবার ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন করলে ছবিটি ওয়েবপেজে দেখা যাবে।

এখানে src (source-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) নামের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে ছবিটির URL বলে দেওয়া হয়েছে। এই URL কোনো ওয়েবসাইটের কোনো ছবির ঠিকানাও হতে পারে। অন্য কোনো ফোল্ডারের ছবি দেখাতে হলে এর মান হিসেবে ছবির পুরো পাথ (path) বসাতে হবে। যেমন— D:\ ড্রাইভের My Pictures ফোল্ডারে image.jpg নামের একটি ছবি দেখাতে হবে এভাবে—

```
<img src="D:/My Pictures/image.jpg">
```

ছবিটি যদি আকারে বেশ বড় হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে ব্রাউজারে পুরো ছবিটির অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে মাত্র। ছবিটি ঠিকমতো দেখার জন্য তখন ছবির আকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ছবির আকার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য width ও height নামে দুটি অ্যাট্রিবিউট রয়েছে। ছবিটিকে 300 × 200 পিক্সেল আকারে দেখাতে চাইলে, নিচের মতো কোড লিখতে হবে।

```
<img src="image.jpg" width="300px" height="200px">
```

কখনো কখনো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কোনো ছবিতে ক্লিক করলে নতুন পেজ ওপেন হয়। অর্থাৎ, ছবিটি হাইপারলিংক করা থাকে।

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">
  <img src="image.jpg">
</a>
```

অর্থাৎ `<a> ... </a>` ট্যাগের মধ্যে কিছু না লিখে একটি ছবি ব্যবহার করা হলো।

সারণি বা টেবিল (Table)

এইচটিএমএল ব্যবহার করে সারণি বা টেবিল তৈরি করা যায়। টেবিলের আনুভূমিক ঘরগুলোকে বলা হয় সারি বা রো (row), আর উল্লম্ব ঘরগুলোকে বলা হয় স্তম্ভ বা কলাম (column)। টেবিলের একেকটি ঘরকে বলা হয় সেল (cell)। টেবিলের একেবারে উপরের সারিকে বলা হয় হেডার সারি (header) আর একেবারে নিচের সারিকে বলা হয় ফুটার (footer) সারি। তবে হেডার ও ফুটার সারি টেবিলের ঐচ্ছিক উপাদান, অর্থাৎ, সব টেবিলে এ দুটি অংশ নাও থাকতে পারে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>HTML Table Example</title>
</head>
<body>
  <table>
    <thead>
      <tr> <th>Serial</th> <th>Subject</th> <th>GPA</th>
</tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr> <td>01</td> <td>Bangla</td> <td>5.00</td> </tr>
      <tr> <td>02</td> <td>English</td> <td>5.00</td> </tr>
      <tr> <td>03</td> <td>Science</td> <td>5.00</td> </tr>
      <tr> <td>04</td> <td>Math</td> <td>5.00</td> </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr> <td></td> <td>CGPA</td> <td>5.00</td> </tr>
    </tfoot>
  </table>
</body>
</html>
```

কোডটি সেভ করে ব্রাউজারে খুললে নিচের ছবির মতো আউটপুট দেখা যাবে।

Serial	Subject	GPA
01	Bangla	5.00
02	English	5.00
03	Science	5.00
04	Math	5.00
	CGPA	5.00

প্রতিটি টেবিল বর্ণনা করা হয় একটি table এলিমেন্ট দিয়ে। এই এলিমেন্টের ভেতরে আবার তিন ধরনের এলিমেন্ট থাকতে পারে। এগুলো হচ্ছে টেবিলের তিনটি অংশ, যথাক্রমে হেডার (header), বডি (body) ও ফুটার (footer)। এগুলো যথাক্রমে thead, tbody ও tfoot এলিমেন্ট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। টেবিল নিয়ে কাজ করতে হলে একেকটি রো বা সারি নিয়ে কাজ করতে হয়। সেজন্য আছে tr বা table row এলিমেন্ট। এর কাজ হচ্ছে টেবিলের একটি সারি তৈরি করা। দশটি সারি দরকার হলে দশটি tr এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। হেডার অংশে টেবিলের হেডিং বসাতে th এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। ব্রাউজারে গেলে দেখা যাবে, হেডিং অংশটি বোল্ড করা আছে। যে কয়টি হেডিং লাগবে সে কয়টি th এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

টেবিলের বডিতে tr এলিমেন্ট দিয়ে সারি তৈরি করা হয়। এরপর তথ্য (data) রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় td (অর্থ, table data) এলিমেন্ট।

এই টেবিলে কোনোরকম বর্ডার ব্যবহার করা হয়নি। তবে চাইলে এভাবে table এলিমেন্টে বর্ডারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া যায়, border অ্যাট্রিবিউট যোগ করে।

```
<table border="1">
```

কিন্তু এভাবে বর্ডার ব্যবহার করলে প্রতিটি সেল বা ঘরের আশেপাশে দুটি করে বর্ডার দেখা যাবে।

Serial	Subject	GPA
01	Bangla	5.00
02	English	5.00
03	Science	5.00
04	Math	5.00
	CGPA	5.00

এটি দূর করতে চাইলে ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা না রেখে একটির সঙ্গে অন্যটি একেবারে লাগিয়ে রাখতে হবে। এজন্য, ব্যবহার করতে হবে cellspacing অ্যাট্রিবিউট এবং মান দিতে হবে 0। এর মান যত দেওয়া হবে, টেবিলের সেলগুলো একে অপরের থেকে তত পিক্সেল দূরে হবে।

```
<table border="1" cellspacing="0">
```

টেবিলের সেলগুলোতে অবস্থিত লেখা সেল থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। প্রয়োজনবোধে সেই দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য ব্যবহার করতে হবে cellpadding অ্যাট্রিবিউট।

```
<table border="1" cellpadding="20">
```

উপরের টেবিলটিতে বর্ডার দেওয়ার পর এর ফুটারে যে একটি ফাঁকা ঘর আছে তা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে।

এখন এইচটিএমএল দিয়ে টেবিল তৈরির আরেকটি উদাহরণ দেখানো হবে।

Month	Bills		
	Electricity	Water	Gas
January	809	600	850
February	955	720	700
March	1123	812	775

চিত্র 4.6 : এরকম একটি টেবিল কীভাবে তৈরি করবে?

উপরের টেবিলে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে :

- টেবিলের উপরে একটি ক্যাপশন রয়েছে।
- Month সেলটি দুটি রো জুড়ে রয়েছে।
- Bills সেলটি তিনটি কলাম জুড়ে রয়েছে।
- বাকি সেলগুলো সাধারণভাবে আছে।

টেবিলের ক্যাপশন দিতে caption নামে একটি এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। কয়েকটি রো জুড়ে একটি সেল তৈরি করতে ব্যবহার করতে হয় rowspan অ্যাট্রিবিউট, আর কয়েকটি কলাম জুড়ে একটি সেল তৈরি করতে ব্যবহার করতে হয় colspan অ্যাট্রিবিউট। ছবির টেবিলটির এইচটিএমএল কোড নিচে দেওয়া হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Table Example</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
    <caption>Bill Summery</caption>
    <thead>
      <!--
        The first th element will span two rows. Second th
        Element will span three columns.
      -->
```

২০২৪-২০২৫

```
      <tr>
        <th rowspan="2">Month</th><th colspan="3">Bills</th>
      </tr>

<tr><th>Electricity</th><th>Water</th><th>Gas</th></tr>
      <!--
        On the second row, the first th element will go to
        Second column. Because second row of first column is
        spanned by first row.
      -->
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>January</td><td>513</td><td>53</td><td>217</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>February</td><td>522</td><td>59</td><td>202</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>March</td><td>578</td><td>62</td><td>224</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```
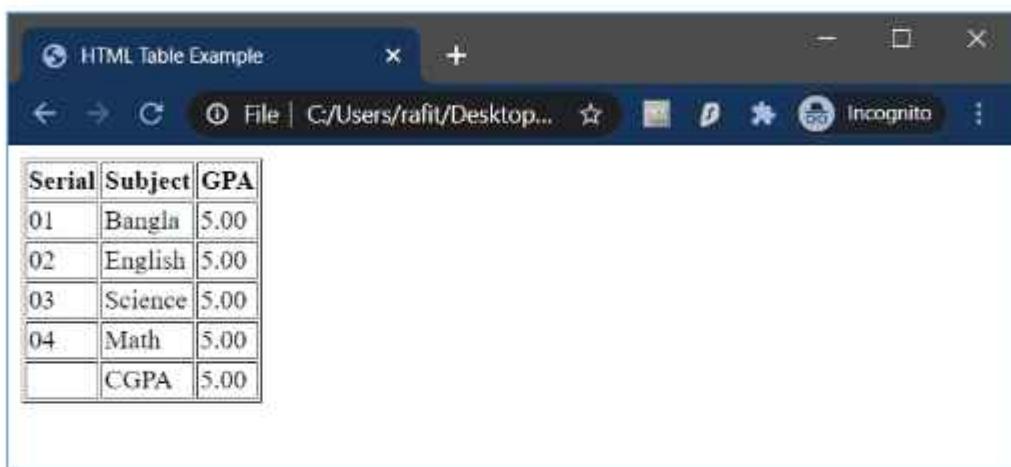
উপরের কোডে দুই জায়গায় <!-- ও --> চিহ্নের মধ্যে কিছু কথা লেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কোডের thead অংশের কাজ কী। একে বলা হয় কমেন্ট (comment)। ব্রাউজারে যখন ডকুমেন্টটি প্রদর্শিত হবে তখন এই কমেন্ট করা অংশটুকু দেখা যাবে না। ডেভেলপাররা নিজেদের সুবিধার জন্য কমেন্ট করে থাকেন। একজনের লেখা কোড যখন অন্যজন পড়েন, তখন এই কমেন্ট দেখে তিনি সহজেই বুঝতে পারেন কোডের কোন অংশের কাজ কী এবং উদ্দেশ্য কী।

টেবিলের কোনো সেলে হাইপারলিংক যোগ করার প্রয়োজন হলে সাধারণ নিয়মে td বা th এলিমেন্টের ভেতরে a এলিমেন্ট বসাতে হবে। একইভাবে টেবিলের সেলে ছবিও যোগ করা যায়। তবে ছবির ক্ষেত্রে তার আকার নিয়ন্ত্রণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, না হলে টেবিলটি দেখতে দৃষ্টিনন্দন হবে না।

```
<td><a href="https://www.google.com">Google</a></td>
```

ওয়েব পেজে বাংলা দেখানো

নিচের কোডে ওয়েব পেজে কীভাবে বাংলা লেখা যায় তা দেখানো হলো।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bangla Text in Webpage</title>
</head>
<body>
  <p>এইচটিএমএল একটি মার্কআপ ভাষা। এটি শেখা খুবই সহজ।</p>
</body>
</html>
```

তবে কিছু কিছু কম্পিউটারে সরাসরি বাংলা লেখা না-ও দেখা যেতে পারে। সব কম্পিউটারে বাংলা লেখা ঠিকভাবে দেখানোর জন্য meta নামের একটি ফাঁকা এলিমেন্ট এবং charset নামের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। meta এলিমেন্টটি head এলিমেন্টের ভেতরে থাকবে, কারণ এটি পেজের একটি সেটিংস পরিবর্তন বা ঠিক করছে।

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="bn">
<head>
  <title>Bangla Text in Webpage</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <p>এইচটিএমএল একটি মার্কআপ ভাষা। এটি শেখা খুবই সহজ।</p>
</body>
</html>
```

এখানে charset="utf-8" দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে লেখাগুলো দেখানোর জন্য UTF-8 ক্যারেক্টার সেট বা অক্ষরসমষ্টি ব্যবহার করতে হবে। UTF-8 হচ্ছে জনপ্রিয় একটি ইউনিকোড ক্যারেক্টার সেট। এটি বাংলা লেখা সমর্থন করে।

এর পাশাপাশি কোডটিতে html এলিমেন্টেও নতুন একটি অ্যাট্রিবিউট যোগ করা হয়েছে, যেটি হচ্ছে lang অ্যাট্রিবিউট। lang অ্যাট্রিবিউটের কাজ হচ্ছে ডকুমেন্টটি কোন ভাষায় লেখা হয়েছে তা ওয়েব ব্রাউজারকে জানানো। কোনো ভাষার যদি একাধিক উপভাষা থাকে, তাহলে ভাষার পাশাপাশি দুই অক্ষরের অঞ্চল কোড (রিজিওন কোড— region code) বসাতে হয়। যেমন— আমেরিকান ইংরেজির জন্য en-US, বাংলাদেশি বাংলার জন্য bn-BD ইত্যাদি।

div ও span এলিমেন্ট

একটি ডকুমেন্টে বিভিন্ন অংশ থাকে। এসব অংশের কাজ একেক রকম হয়। তাই এদের গঠন ও চেহারাও ভিন্ন হয়। এই অংশগুলোকে আলাদা করতে ব্যবহার করা হয় div এলিমেন্ট।

span এলিমেন্টের কাজ হচ্ছে একটি এলিমেন্টের নির্দিষ্ট একটি অংশ নির্বাচন করা। ধরা যাক, একটি প্যারাগ্রাফ কালো রঙে দেখানো আছে। মধ্যে তিনটি শব্দ লাল রং করতে হবে। তখন ওই তিনটি শব্দের দুই পাশে span এলিমেন্টের ট্যাগ বসিয়ে style অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে রং নির্ধারিত করে দেওয়া যায়।

```
<p>This is a black text. But <span style="color:red;">This
is red</span></p>
```

স্টাইল অ্যাট্রিবিউট (style attribute)

স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেজের বিভিন্ন এলিমেন্টের রং, ফন্টসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা প্রোপার্টি (property) উল্লেখ করে দেওয়া যায়। স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের ভেতরে বিভিন্ন স্টাইলিং নির্দেশনা দেওয়া যায়। যেমন— এর আগের অংশে দেখানো হয়েছে কীভাবে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে লাল রঙে লেখা যায়। এজন্য color প্রোপার্টি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন এইচটিএমএল এলিমেন্টের বিভিন্ন প্রোপার্টি আছে। একাধিক প্রোপার্টির মান বলে দিতে চাইলে তাদের মধ্যে সেমিকোলন চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Style Attribute Experiment</title>
</head>
<body>

  <div style="width:100px; height:100px; background-color:
pink; color: darkred; float: left; margin: 5px; padding:
5px;">Hello There!</div>

  <div style="width:100px; height:100px; background-color:
paleturquoise; color: forestgreen; float: left; margin: 5px;
padding: 5px;">How are you!</div>

  <div style="width:100px; height:100px; background-color:
lightskyblue; color: royalblue; float: left; margin: 5px;
padding: 5px;">Nice to meet you!</div>

</body>
</html>
```

উপরের কোডটি ছবির মতো আউটপুট তৈরি করবে।
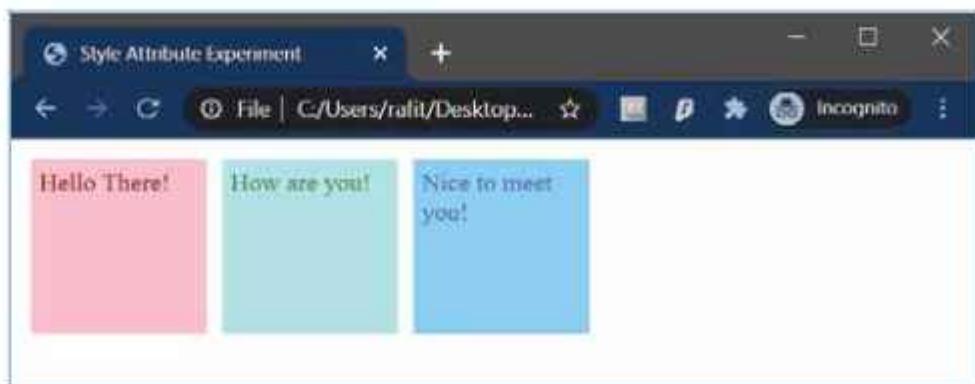
আবার একই স্টাইল একাধিক এলিমেন্টে ব্যবহার করতে চাইলে, <head>...</head> অংশের ভিতরে আলাদাভাবে style ট্যাগ দিয়ে সেগুলো বলে দেওয়া যায়। নিচের উদাহরণটিতে সেটি দেখানো হলো—

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Style Attribute Experiment</title>
  <style type="text/css">
    div {
      width:100px;
      height:100px;
      float: left;
      margin: 10px;
      padding: 10px;
      font-family: sans-serif;
      font-size: large;
      border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
      border-radius: 5px;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div style="background-color: pink; color: darkred;">Hello
There!</div>
  <div style="background-color: paleturquoise; color:
forestgreen;">How are you!</div>
  <div style="background-color: lightskyblue; color:
royalblue;">Nice to meet you!</div>
</body>
</html>
```

একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট কেমন হওয়া উচিত তা একটি ওয়েব ব্রাউজার-কে জানানোর জন্য CSC (Cascading Style Sheet) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি ওয়েবপেজকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখানে style ট্যাগে বলে দেওয়া হয়েছে যাবতীয় div এলিমেন্টের স্টাইল কেমন হবে, অর্থাৎ, width হবে 100 পিক্সেল, height হবে 100 পিক্সেল ইত্যাদি। আর প্রতিটি আলাদা div এলিমেন্টে তাদের নিজস্ব রং (color) ও পেছনের পর্দার রং (background-color) বলে দেওয়া হয়েছে। এভাবে স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করে বিভিন্ন এলিমেন্টের রূপ পরিবর্তন করা যায়।
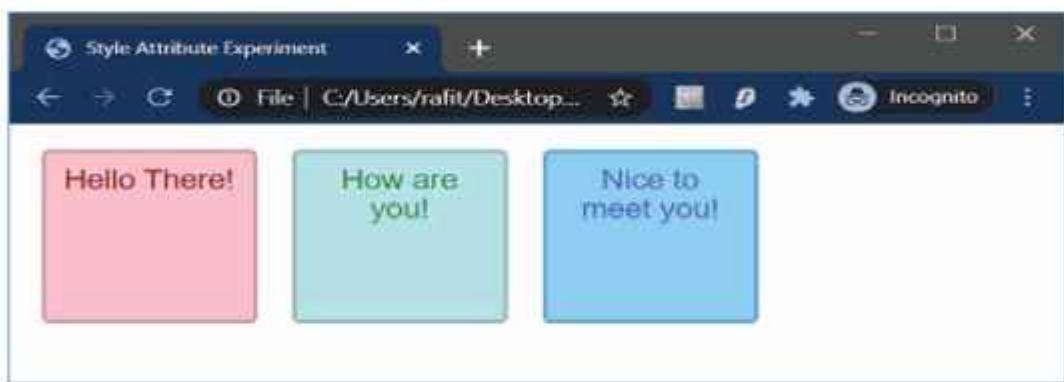
এখানে কিছু প্রোপার্টির নাম ও তাদের ব্যবহার দেখানো হলো—

প্রোপার্টির নাম	ব্যবহার
width	উপাদানের প্রস্থ নির্ধারণ করা
height	উপাদানের উচ্চতা নির্ধারণ করা
font-family	ফন্ট নির্ধারণ করা
font-size	ফন্টের আকার নির্ধারণ করা
margin	অন্যান্য উপাদান থেকে দূরত্ব নির্ধারণ করা
padding	উপাদানের সীমানা থেকে এর ভেতরের উপাদানগুলোর দূরত্ব নির্ধারণ করা
border	উপাদান সীমানা দেখতে কেমন হবে তা নির্ধারণ করা
text-align	উপাদানের ভেতরের লেখা কীভাবে বিন্যস্ত করা হবে তা নির্ধারণ করা। (যেমন— left, right, center ইত্যাদি)
color	উপাদানের রং নির্ধারণ করা
background-color	উপাদানের পেছনের পর্দার রং নির্ধারণ করা

ফন্ট ফ্যামিলির কাজ হলো ফন্ট নির্ধারণ করা। Sans serif ফন্ট হলো simple typer font যেগুলোর প্রতিটি অক্ষরের প্রান্তে কোনো stroke ব্যবহার করা হয় না। পূর্বের কোডে rgba উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে rgba মানে red, green, blue, alpha। এখানে আলফা প্যারামিটারের সংকর মান 0.0 হতে 1.0 এর মধ্যে হবে সবসময়। এক্ষেত্রে যেহেতু red, green, blue এই তিনটিতে ভেল্যু 0 দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে 0, 0, 0 এর জন্য আসবে full white এবং 0.2 এর জন্য হালকা black, এই মান যতো বাড়বে রঙ ততো গাঢ় হতে থাকবে। আমরা এখানে তিনটি সেনটেন্সকে div এলিমেন্ট দ্বারা আলাদা করে এদের জন্য বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফন্ট কালার নির্বাচন করেছি।

৪.৩ ওয়েব পেজ ডিজাইনিং (Designing Web Page)

একটি ভালো ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে প্রথমে সুন্দর একটি ডিজাইন তৈরি করে নিতে হয়। এই ডিজাইন প্রক্রিয়ার সময় নানাবিধ বিষয় মাথায় রাখতে হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো, ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীদের কাছে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন লাগছে কি না এবং ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ফিচার ব্যবহারকারীরা সহজে খুঁজে পাচ্ছে কি না এবং ব্যবহার করতে পারছে কি না।

ওয়েবসাইটের ধরন অনুযায়ী তার ডিজাইন নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রশ্নোত্তরের ওয়েবসাইট তৈরি করার কথা ভাবা যাক, যেখানে বিভিন্ন ব্যবহারকারী প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। এজন্য প্রথমে নির্ধারণ করে নিতে হবে ওয়েবসাইটে কী কী ফিচার থাকবে। যেমন ওয়েবসাইটে নিচের ফিচারগুলো থাকতে পারে।

- ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন ও লগইন করতে পারবে
- ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারী প্রশ্ন পোস্ট করতে পারবে
- ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারী প্রশ্নের উত্তর পোস্ট করতে পারবে
- প্রশ্নকর্তা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তরটি সঠিক বলে চিহ্নিত করতে পারবে
- ব্যবহারকারীরা অন্যের করা প্রশ্ন বা উত্তর গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে তাতে ভোট দিয়ে পারবে
- ভালো প্রশ্ন বা ভালো উত্তর (যেগুলোতে বেশি ভোট পড়েছে)-এর জন্য প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা পয়েন্ট পাবে।

এরপরে চিন্তা করতে হবে ওয়েবসাইটে কী কী পেজ থাকবে। প্রতিটি পেজের জন্য একটি লেআউট ডিজাইন করতে হবে। লে-আউট বলতে বোঝানো হচ্ছে পেইজের কোন স্থানে কী দেখানো হবে। এই ডিজাইনটি প্রাথমিকভাবে কাগজে-কলমে করা যেতে পারে। এ জাতীয় কাগজ-কলমে আঁকা ডিজাইনকে বলা হয় ওয়ারফ্রেম (wireframe)। ধরা যাক, একটি প্রশ্ন ও তার সংশ্লিষ্ট উত্তরগুলোর পেজটি এরকম (পরের ছবি দ্রষ্টব্য) হতে পারে। আবার চাইলে কোনো গ্রাফিক্স ডিজাইন সফটওয়্যার, যেমন— অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator) বা গিম্প (Gimp) ইত্যাদি ব্যবহার করেও এ জাতীয় ডিজাইন তৈরি করা যায়।

২০২৪-২০২৫
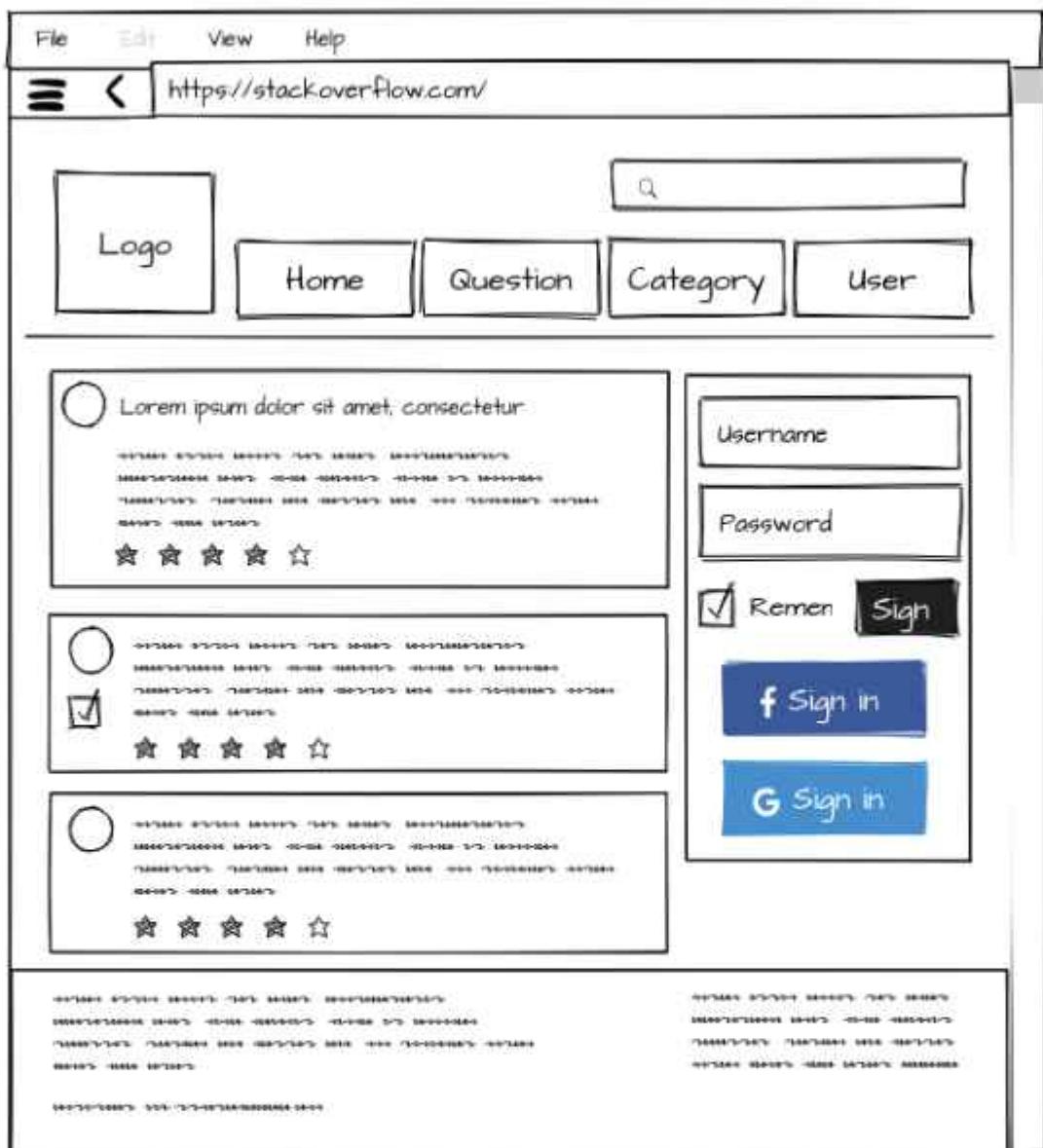
চিত্র 4.7 : প্রশ্নোত্তর ওয়েবসাইটের একটি পেজের ডিজাইন

এভাবে বিভিন্ন পেজের ডিজাইন হয়ে গেলে এরপরে এর ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে হবে। বিভিন্ন পেজের ডিজাইন অনুযায়ী HTML ও CSS ব্যবহার করে পেজগুলো তৈরি করতে হবে। একে বলে ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট (Front-end development)। বাস্তবে ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্টে HTML, CSS-এর পাশাপাশি আরো অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা, সফটওয়্যার ও লাইব্রেরি ব্যবহার করা হয়, যেগুলো এই বইতে আলোচনা করা হয়নি।

পাশাপাশি কোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ফিচার ইমপ্লিমেন্টেশন, ডেটাবেজ সার্ভারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি করতে হবে। একে বলে ওয়েবসাইটের ব্যাক-এন্ড ডেভেলপমেন্ট (Back-end development)। যেসব ডেভেলপার ফ্রন্ট-এন্ড ও ব্যাক-এন্ড উভয়ের কাজই জানেন তাদেরকে সাধারণত ফুলস্ট্যাক ডেভেলপার (Full-stack developer) বলা হয়।

ডেভেলপমেন্ট চলাকালীন প্রয়োজনবোধে ডিজাইনে বিভিন্ন পরিবর্তন করার দরকার হতে পারে। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে কোড লিখতে হবে। ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আবার নিয়মিত টেস্টিং ও ডিবাগিং করতে হবে। অর্থাৎ, ওয়েবসাইটের সব ফিচার ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা যাচাই করতে হবে, এবং সমস্যা ধরা পড়লে সেগুলো সমাধান করতে হবে।

৪.৪ ওয়েবসাইট পাবলিশিং (Publishing a Website)

একটি ওয়েবসাইট যেন সবাই ব্রাউজ করতে পারে, সেজন্য ওয়েবসাইটটি পাবলিশ করতে হয়। আসলে ওয়েবসাইট এমন একটি কম্পিউটারে রাখতে হয়, যেন সেই কম্পিউটারটি সর্বক্ষণ সচল থাকে এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেই সঙ্গে আরেকটি জিনিস থাকতে হয়, যাকে বলে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)। এটি হচ্ছে ইন্টারনেটে ওই কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা। ব্যক্তিগত কাজে যেসব কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়, সেখানে অবশ্য ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও নির্দিষ্ট পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস থাকে না। ইন্টারনেট সংযোগদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস সংগ্রহ করা যায়। তবে কেউই তার ব্যক্তিগত কম্পিউটার ২৪ ঘণ্টা চালু রাখবে না, তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ওয়েব হোস্টিং সেবা প্রদান করে, যেখানে ওয়েবসাইট রাখা ও পাবলিশ করা যায়। একটি ওয়েবসাইটকে পাবলিশ করার জন্য যখন কোনো ওয়েব সার্ভারে ওয়েবসাইটটিকে আপলোড করা হয় সেই পদ্ধতিকে হোস্টিং বলে।

আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা গেলেও কেউ বাস্তবে আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখে না। তাই ওয়েবসাইটের ডোমেইন নাম (domain name) বলে একটি জিনিস থাকে। bangladesh.gov.bd, wikipedia.org ইত্যাদি হচ্ছে ডোমেইন নাম। ইন্টারনেটে ডোমেইন নাম কিনতে পাওয়া যায়। তবে যে ডোমেইন নাম এখনো কেউ কিনে ফেলেনি, সেগুলোই কেবল কেনা যাবে। তারপর ডোমেইন নামের সঙ্গে ওয়েব হোস্টিং সার্ভারের একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তাহলে কেউ ওয়েব ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে ওই ডোমেইন নাম লিখে এন্টার কী চাপলে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবে।

আবার সার্চ ইঞ্জিন (google, yahoo, bing, pipilika ইত্যাদি) ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটিকে অনুসন্ধান করে ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করা যায়। এই জন্য যখন কোনো নতুন ওয়েবসাইট পাবলিশ করা হয়, তখন ওয়েবসাইটটিকে আরও বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করতে হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.ওয়েবপেজের মধ্যে লিংক করার ট্যাগ কোনটি?

ক. <a> খ. <i>
গ. <href> ঘ.

২. হাইপারলিংক ব্যবহার করার ফলে ওয়েবপেজ–

i. তথ্যবহুল হয়ে ওঠে
ii. শ্রম সাশ্রয়ী হয়
iii. আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন হয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. কোনটির ক্ষেত্রে ডোমেইন নেম ব্যবহার করা হয়?

ক. ওয়েবসাইট খ. সার্ভার
গ. ওয়েব ফাইল ঘ. ফোল্ডার

৪.
```
<html>
<body>
<p><b>First program</b></p>
<a href= "test,html">Test Website</a>
</body>
</html>
```

কোডটিতে ব্যবহৃত ট্যাগগুলো হলো–

i. ফরমেটিং
ii. হাইপারলিংক
iii. ইমেজ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. এইচটিএমএল কোড <p>H²O</p> এর ফলাফল কোনটি?

ক. H2O খ. H_2O
গ. H^2O ঘ. HO^2

৬. ওয়েবপেজে 640×480 পিক্সেলের map.jpg ইমেজটি যুক্ত করার জন্য <img src= "map.jpg"> এর সাথে কোন নির্দেশনা যুক্ত হবে?

ক. width="640" height="480" খ. Pixelw="640" pixelh="480"
গ. w="640" h="480" ঘ. Pixwidth="640" pixheight="480"

৭. সারিকা তৈরিকৃত ওয়েবপেজে একটি নতুন ছবি সংযুক্ত করল। এর ফলে তার ওয়েবপেজটি আরও দৃষ্টিনন্দন হলো।

নিচের কোন ট্যাগের সাথে সারিকার তৈরিকৃত ট্যাগের মিল রয়েছে?

ক.<html> খ.

গ.<body> ঘ.<pre>

৮. নতুন উইন্ডোতে ওয়েবপেজ ওপেন করতে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি?

ক. href খ. target

গ. src ঘ. title

৯. border অ্যাট্রিবিউটে কোন ভ্যালু লিখলে বর্ডার প্রদর্শিত হবে না?

ক. border="1" খ. border="alt"

গ. border="0" ঘ. border="null"

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিমি ওয়েবপেজ ডিজাইনার হওয়ার জন্য HTML শিখছে, বর্তমানে সে ওয়েবপেজ-এ হাইপারলিংক কীভাবে ব্যবহার করে তা শিখছে?

১০. মিমি কোন ট্যাগ ব্যবহার করে হাইপারলিংক করবে?

ক. <caption> খ. <a>

গ. <head> ঘ. <html>

১১. মিমি হাইপারলিংক ব্যবহার করে ওয়েবপেজ

i. সমৃদ্ধ করতে পারবে

ii. তথ্যবহুল করতে পারবে

iii. আকর্ষণীয় করতে পারবে

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শুধু এইচটিএমএল ব্যবহার করে X ডিগ্রি কলেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হলো। সাইটটির হোম পেজে ict.jpg নামের 200x300 px আকারের একটি ছবি আছে। ছবিটির নিচে notice.html নামের notice পেজের একটি লিংক আছে। ছবির উপর "Welcome to X Degree College" লেখাটি নীল রঙে প্রদর্শিত হয়। সাইটটিতে ভিজিটরদের মতামত প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।

ক. HTML এর এলিমেন্ট কী?

খ. ওয়েবসাইট পাবলিশ করার জন্য কোনটি প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হোম পেজ তৈরির জন্য HTML কোড লিখ।

ঘ. X ডিগ্রি কলেজের ওয়েবসাইটটিকে ডায়নামিক ওয়েবসাইট বলা যায় কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. শিক্ষক ক্লাসে 'ওয়েব ডিজাইন ও HTML' অধ্যায় পড়ানোর শেষে ফাহিমকে নিচের চিত্রের মতো একটি ওয়েবপেজ তৈরি করতে বললেন, সেখানে টাইটেলে XYZ লেখাটি প্রদর্শিত হবে। ফাহিম ঐ পেজটি তৈরি করে হোস্টিং করল কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর ওয়েবসাইটটি কোনো স্থান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

<table>
<tr><td colspan="2">1. Google
2. Yahoo</td><td colspan="2">map.jpg</td></tr>
<tr><td colspan="4">ICT</td></tr>
<tr><td>$a^2 - b^2$</td><td>~~ab~~</td><td>H_2O</td><td></td></tr>
</table>

২০১৪-২০১৫

শর্ত: Google এবং Yahoo লিস্ট আকারে এবং Hyperlik করা থাকবে। map.jpg একটি ছবির ফাইল, যার সাইজ 100x80 এবং Bangladesh.html এর সাথে হাইপারলিংক করা থাকবে। ICT লেখাটি মাঝখানে হবে এবং হেডিং-2 থাকবে।

ক. HTML ট্যাগ কী?

খ. আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেইন নেম এক নয়- ব্যাখ্যা কর।

গ. ফাহিম HTML ফাইলটি কীভাবে তৈরি করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তিন মাস পর ওয়েবপেজটি দেখা না যাওয়ার সমস্যাটি সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

৩. ABC College, Dhaka

Available subjects:

1. Bangla
2. English
3. Mathematics
4. Accounting

ক. ওয়েবপেজ কী?

খ. ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি ABC কলেজের ওয়েবসাইট প্রদর্শনের জন্য HTML কোড লিখ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের নামের তালিকা নিয়ে Serial No এবং Subject Name এই দুটি টেবিল হেডিং দিয়ে দুই কলামের একটি টেবিল তৈরির HTML কোড লিখে এর গুরুত্ব বিশ্লেষন কর।

৪.

```
<html>
<head> <title> ICT </title> </head>
<body>
<h3> COLLEGE RESULT </h3>
<table>
<tr>
<th> Roll </th> Name </th> <th> Result </th>
</tr>
<tr>
<td> 501 </td> Sumaiya </td>
<td> <a href = "Exam Result.html"> My Test Result </a> </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ক. ব্রাউজার কী?

খ. 'IP Address এর চেয়ে Domain Name ব্যবহার সুবিধাজনক কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের মৌলিক কাঠামোটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের কাঠামোটি ইন্টারনেটে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে তোমার মতামত দাও।

৫.

1. Ball
2. Bat
3. Wicket

abc.jpg

চিত্র-১

- Ball
- Bat
- Wicket

abc.jpg

চিত্র-২

ক. ওয়েব ব্রাউজার কী?

খ. এই ভাষাটির ব্যবহারে সহজেই ওয়েবপেজ তৈরি করা যায়–ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্র-১ এর মতো ওয়েবপেজ তৈরির জন্য HTML কোডিং লিখ।

ঘ. চিত্র-১ কে চিত্র-২–এর মতো করে উপস্থাপন করা যায়, বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রোগ্রামিং ভাষা

Programming Language

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি কোনো না কোনোভাবে পুরো পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এই অসাধারণ যন্ত্রটি কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে সেটি শুধু মানুষের সৃজনশীলতা দিয়ে সীমাবদ্ধ। তবে এককভাবে কম্পিউটার নামের এই যন্ত্রটির সাথে অন্য আরেকটি যন্ত্রের কোনো পার্থক্য নেই। কম্পিউটার আলাদাভাবে একটি বিশেষ কিছু হয়ে ওঠে। কারণ এটিকে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার জন্য প্রোগ্রাম করা সম্ভব। কম্পিউটার যেহেতু একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেটি 1 এবং 0 ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না, তাই তাকে প্রোগ্রাম করার জন্য এই 1 এবং 0 দিয়েই মেশিন কোডে কিছু দুর্বোধ্য নির্দেশনা দিতে হয়। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা উদ্ভাবন করা হয়েছে, এই ভাষাগুলোতে একজন প্রয়োজনীয় কোড লিখতে পারে যেটি পরবর্তীকালে মেশিন কোডে রূপান্তরিত করে কম্পিউটারের কাছে নির্দেশনা হিসেবে পাঠানো হয়। এরকম একটি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা হচ্ছে সি (C)। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রোগ্রামিংয়ের খুঁটিনাটির সাথে সাথে C ভাষায় প্রোগ্রামিং করার প্রাথমিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবে।

ব্যাবহারিক

- প্রোগ্রামের সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবে;
- প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লো চার্ট প্রস্তুত করতে পারবে;
- 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারবে।

৫.১ প্রোগ্রামের ভাষা (Language of Programming)

কম্পিউটারকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে হয়। কম্পিউটারের প্রসেসর কেবল একটি নির্দিষ্ট সেটের কমান্ড এক্সিকিউট করতে পারে, যাকে বলে ইনস্ট্রাকশন সেট। কিন্তু প্রোগ্রামাররা সাধারণত সেই ভাষায় প্রোগ্রাম লেখেন না, বরং প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য শত শত প্রোগ্রামিং ভাষা চালু আছে।

বিভিন্ন দশকে উদ্ভাবিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামিং ভাষা

প্রোগ্রামিং ভাষার নাম	আবিষ্কারের সাল
ফোরট্রান (Fortran)	1954-57
লিসপ (Lisp)	1956-59
কোবল (Cobol)	1959-60
বেসিক (Basic)	1964
প্যাসকেল (Pascal)	1970
সি (C)	1972
সি++ (C++)	1983
পার্ল (Perl)	1987
পাইথন (Python)	1989

প্রোগ্রামিং ভাষার নাম	আবিষ্কারের সাল
ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)	1991
পিএইচপি (PHP)	1995
জাভা (Java)	1995
জাভাস্ক্রিপ্ট (Javascript)	1995
স্কালা (Scala)	2003
গো (Go)	2009
রাস্ট (Rust)	2010
কটলিন (Kotlin)	2011

৫.১.১ মেশিন ভাষা (Machine Language)

কম্পিউটারের প্রসেসর বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন হিসেব করে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কেবল দুটি অঙ্ক রয়েছে— 1 ও 0। এই দুটি অঙ্ক ব্যবহার করেই প্রসেসরের জন্য বিশেষ সংকেত তৈরি করা হয়। 0 ও 1 দিয়ে তৈরি যে প্রোগ্রাম, তাকে বলে মেশিন কোড (machine code), আর এই ভাষাটিকে বলা হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। কম্পিউটারের জন্য মেশিন কোড খুব সহজবোধ্য হলেও মানুষের জন্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের কোড পড়া দুঃসাধ্য

চিত্র 5.1: পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রামার অ্যাডা লাভলেস (1815-1852)

ব্যাপার। কারণ কোডে কেবল 0 আর 1 থাকে। তাই মানুষের পক্ষে এই ভাষায় বড় প্রোগ্রাম তৈরি করা অসম্ভব বলা চলে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংকে সহজ করার জন্য বিভিন্ন প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রসেসরের সঙ্গে তৈরি করেন একটি ইনস্ট্রাকশন সেট। ইনস্ট্রাকশন সেটে কিছু সহজ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হলো যেগুলো ব্যবহার করে প্রসেসরকে নির্দেশ দেওয়া যায় বা প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। কেবল 0 আর 1 ব্যবহার করার চেয়ে ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

৫.১.২ অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

প্রোগ্রামারদের জন্য প্রোগ্রাম লেখা সহজতর করার জন্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের পর তৈরি হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। এটি একটি প্রোগ্রামিং ভাষা। মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে এই ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা ও পড়া প্রোগ্রামারদের জন্য সহজ। কম্পিউটারের প্রসেসর কিন্তু সরাসরি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি প্রোগ্রাম রান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা কোডকে আগে মেশিন কোডে রূপান্তর করতে হয়, তারপর প্রসেসর সেটিকে এক্সিকিউট করতে পারে। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তর করার কাজটি করে যে প্রোগ্রাম, তার নাম অ্যাসেম্বলার (assembler)।

৫.১.৩ মধ্যম স্তরের ভাষা (Mid-Level Language)

অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং উচ্চস্তরের ভাষার মধ্যবর্তী ভাষাকে মধ্যম স্তরের ভাষা বলে। এটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং প্রোগ্রামিংয়ের মাঝে একটি সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয়। সি ল্যাঙ্গুয়েজ মধ্যম স্তরের ভাষার একটি চমৎকার উদাহরণ। কারণ এটি দিয়ে যেমন একদিকে অপারেটিং সিস্টেমের মতো সিস্টেম প্রোগ্রামিং করা যায়, অন্যদিকে তেমনি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও তৈরি করা যায়।

৫.১.৪ উচ্চ স্তরের ভাষা (High Level Language)

মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ও অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ভাষা। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামারদের জন্য আগের চেয়ে সহজে প্রোগ্রাম লেখার ব্যবস্থা করলেও এ ভাষায় বড় বড় প্রোগ্রাম লেখাটা অনেক কঠিন এবং সময়-সাপেক্ষ। প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে মানুষ যখন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে লাগল, তখন প্রয়োজন হলো এমন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষার, যে সব ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা ও পড়া মানুষের জন্য অনেক বেশি সহজ হবে। তখন তৈরি হলো উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। কোবল (Cobol), ফোরট্রান (Fortran), সি (C) ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষার আবিষ্কারের ফলে প্রোগ্রামিং ভাষা অনেকখানি বদলে গেল। এসব ভাষা ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যা আগের চেয়ে অনেক দ্রুত প্রোগ্রাম লিখে সমাধান করা যেত। তাই এসব ভাষাকে উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হতো। তবে সময়ের সঙ্গে আরো নতুন নতুন প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি হলো, যেগুলো প্রোগ্রামিং ভাষাকে আরো সহজবোধ্য করল এবং এসব ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম ডিজাইন করাও সহজ হলো। যেমন— সি প্লাস প্লাস (C++), জাভা (Java), সি শার্প (C#), পিএইচপি (PHP), পাইথন (Python) ইত্যাদি। বর্তমানে এগুলোকে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সি (C) : সি একটি সাধারণভাবে ব্যবহারের উপযোগী অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। 1972 সালে ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie) বেল ল্যাবে এই ভাষাটি তৈরি করেন। বলা হয়ে থাকে এই ভাষাটি জানা থাকলে কম্পিউটারের অন্য যে কোনো ভাষা শেখা খুব সহজ। সি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অপারেটিং সিস্টেম থেকে জটিল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট ব্রাউজার কিংবা ইন্টারপ্রেটার পর্যন্ত সবকিছু তৈরি করা যায়। এটি একটি চমৎকার স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ভাষা, এখানে ছোট ছোট অসংখ্য অংশকে সমন্বয় করে একটি জটিল প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।

সি প্লাস প্লাস (C++) : প্রোগ্রামিংয়ের জগতে ক্লাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। একই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেরকম কিছুকে ক্লাস বলে অভিহিত করা হয়। সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ক্লাস সংযুক্ত করে এবং পরে আরো নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে C++ ল্যাঙ্গুয়েজের সূচনা হয়। 1980 সালে বেল ল্যাবে কর্মরত জর্ন স্ট্রাউস্ট্রপ (Bjarne Stroustrop) এই ভাষাটি উদ্ভাবন করেন। একজন প্রোগ্রামারকে পুরোপুরি নিজের মতো প্রোগ্রামিং করার স্বাধীনতা দেওয়া এই ভাষাটির একটি মূল নীতি।

জাভা (Java) : 1991 সালে সান মাইক্রো সিস্টেম জাভা প্রোগ্রামিং ভাষার সূচনা করে। এটি বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ভাষা। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি প্ল্যাটফর্মে কম্পাইল করে নিলে জাভা ব্যবহার করে সেরকম অন্য যে কোনো প্ল্যাটফর্মে সরাসরি ব্যবহার করা যায় (WORA: Write Once, Run Anywhere)। গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব ব্রাউজারগুলো ওয়েব পেজের ভেতর জাভা অ্যাপলেট চালু করার সক্ষমতা দেওয়ার কারণে এটি খুবই দ্রুত সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পাইথন (Python) : গিডো ভান রসাম (Gido van Rossum) 1991 সালে পাইথন উদ্ভাবন করেন। এটি বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষাগুলোর একটি এবং 2018 সালে এটি IEEE কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পাইথনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অত্যন্ত সহজ এবং পাঠযোগ্য সিনট্যাক্স। এটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে চলে এবং ক্লাউডভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, ডেটা অ্যানালাইসিস ও মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৫.১.৫ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4th Generation Language– 4GL)

প্রোগ্রামিংকে মানুষের জন্য আরো সহজ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং যার ফলে এমন প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি হয়, যেগুলো মানুষের ভাষার কিছুটা কাছাকাছি। এসব প্রোগ্রামিং ভাষাকে বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বা 4GL। ডেটাবেজ অধ্যায়ে যে SQL ভাষা দেখানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে 4GL ভাষা। এ ছাড়াও যখন নানা ধরনের সফটওয়্যার টুলে গ্রাফিকেল ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়, একটি মেন্যু কিংবা বাটনে চাপ দিয়ে কিছু করে ফেলা যায়, তার পিছনেও চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার অবদান আছে বলে বিবেচনা করা হয়।

৫.২ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator Program)

বর্তমানে হাজার খানেক প্রোগ্রামিং ভাষা প্রচলিত। যদিও সব ভাষা সমানভাবে জনপ্রিয় নয়। ভাষা যে রকমই হোক না কেন, কম্পিউটারের প্রসেসর 1 আর 0 ছাড়া কিছু বোঝে না। তাই বিভিন্ন ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে মেশিন কোডে রূপান্তর করতে হয়। এই কাজটি করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, যাকে বলে অনুবাদক প্রোগ্রাম। নিচে তিন ধরনের অনুবাদকের কথা বলা হলো :

২০২৪-২০২৫

অ্যাসেম্বলার (Assembler) : অ্যাসেম্বলি ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে মেশিন কোডে অনুবাদ করে অ্যাসেম্বলার নামক একটি প্রোগ্রাম।

উচ্চ স্তরের যেসব প্রোগ্রামিং ভাষা, সেগুলোকে মেশিন কোডে অনুবাদ করার কাজটি করার জন্য দু ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে— কম্পাইলার (Compiler) ও ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)। প্রতিটি উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষারই পৃথক কম্পাইলার অথবা ইন্টারপ্রেটার রয়েছে। এই দুই ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য এক হলেও কাজের ধরনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

কম্পাইলার (Compiler) : কম্পাইলার প্রথমে পুরো প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করে দেখে যে এর ভাষার নিয়মকানুন (যাকে ইংরেজিতে বলে সিনট্যাক্স Syntax) ঠিক আছে কি না। যদি ঠিক থাকে, তখন সে পুরো প্রোগ্রামটি কম্পাইল করে মেশিন কোডে রূপান্তর করে। যেহেতু পুরো প্রোগামটি একবারে কম্পাইল করা হয় তাই প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে সব একসাথে দেখানো হয়। সে কারণে ভুলগুলো শুদ্ধ করা একটু জটিল। তবে কম্পাইল করার পর এই প্রোগ্রামগুলো অনেক দ্রুতগতিতে কাজ করে।

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) : ইন্টারপ্রেটার পুরো প্রোগ্রাম পরীক্ষা না করে প্রোগ্রামের প্রতিটি স্টেটমেন্ট (statement বা নির্দেশ) মেশিন কোডে রূপান্তর করে সেটিকে এক্সিকিউট করে। অর্থাৎ কোনো প্রোগ্রামে যদি দশটি স্টেটমেন্ট থাকে, তাহলে প্রথম স্টেটমেন্ট আগে মেশিন কোডে রূপান্তর হয়ে চলবে, তারপর দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট, তারপর তৃতীয় স্টেটমেন্ট, এভাবে একে একে সব স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে। এ কারণে ভুল শুদ্ধ করা অনেক সহজ। কিন্তু একটি একটি করে স্টেটমেন্ট মেশিন কোডে রূপান্তর হয় বলে সময় তুলনামূলকভাবে বেশি লাগে।

৫.৩ প্রোগ্রামের সংগঠন (Program Structure)

একটি প্রোগ্রামের পুরোটির গঠন, বিশেষ করে তার ভেতরকার ছোট ছোট অংশগুলোর গঠন এবং একটির সঙ্গে অন্যটির পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রোগ্রামের সংগঠন বা স্ট্রাকচার বলে। মাঝে মাঝেই কোনো কোনো প্রোগ্রামের সংগঠনকে ভালো এবং কোনো কোনো প্রোগ্রামের সংগঠনকে দুর্বল বলা হয়। ভালো সংগঠনের প্রোগ্রাম কিছু প্রচলিত নিয়ম মেনে চলে এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভেতরকার সম্পর্কগুলো হয় সহজ, এবং সেগুলো অনেক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। সেখানে সঠিক ডেটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় এবং প্রোগ্রামের গতি প্রবাহ (Flow Control) হয় সুনির্দিষ্ট। দুর্বল সংগঠনের প্রোগ্রামে প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন অংশের ভেতরকার সম্পর্ক হয় অনিয়মিত এবং অস্পষ্ট। শুধু তাই নয় সেখানে সঠিক ডেটা স্ট্রাকচারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং প্রোগ্রামের গতি প্রবাহ হয় এলোমেলো।

৫.৪ প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ (Steps of Developing a Program)

প্রোগ্রাম তৈরি করার সময় শুরুতেই প্রোগ্রামাররা কোড লিখতে বসে যান না। বরং প্রথমে চিন্তা করতে হয় যে, প্রোগ্রাম লিখে যে সমস্যাটি সমাধান করা হবে, সেটি কীভাবে করা হবে। যে কাজগুলো করা হবে, সেগুলোর প্রতিটি ধাপ লিখে ফেলা হয়। এই ধাপগুলোকেই বলে অ্যালগরিদম (algorithm)। আর অনেক সময় লেখার চেয়ে ছবি এঁকে বোঝা সহজ। সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোকে যে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট (flowchart)।

৫.৪.১ অ্যালগরিদম

ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী প্রতিদিন সকালে তার বাইসাইকেল চালিয়ে কলেজে যায়। তবে বাইসাইকেল যদি কোনো কারণে নষ্ট থাকে, তাহলে সে রিকশায় চড়ে কলেজে যায়। কলেজে যাওয়ার ধাপগুলোকে এভাবে লেখা যায়—

১) সাইকেল ঠিকঠাক আছে? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ৪নং ধাপে যাও, উত্তর 'না' হলে পরের ধাপে যাও।
২) অভিভাবকের কাছ থেকে রিকশাভাড়ার টাকা নাও।
৩) রিকশা ভাড়া করে কলেজে যাও, এরপরে পাঁচ নম্বর ধাপে যাও।
৪) সাইকেল চালিয়ে কলেজে যাও।
৫) কলেজে পৌঁছে গিয়েছ।

উপরের ধাপগুলোকে আমরা বলতে পারি ওই শিক্ষার্থীর কলেজে যাওয়ার অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদম লেখার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই। ধাপগুলোর ক্রম সঠিক হতে হবে যেন ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে সমস্যার সমাধান হয়। একটি ধাপের কাজ শেষ হলে তার পরের ধাপের কাজটি করতে হবে। তবে, কোনো কারণে যদি ঠিক পরের ধাপটি বাদ দিয়ে একটি বিশেষ ধাপের কাজ করতে চাই, সেক্ষেত্রে সেটি উল্লেখ করে দিতে হবে। যেমন— উপরের উদাহরণে আমরা তৃতীয় ধাপের শেষে বলে দিয়েছি, পাঁচ নম্বর ধাপে যেতে। এক্ষেত্রে চার নম্বর ধাপের কাজটি আর করা হবে না। আবার, এক নম্বর ধাপে সাইকেল যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে সরাসরি চার নম্বর ধাপে চলে গিয়েছি, এক্ষেত্রে দুই এবং তিন নম্বর ধাপের কাজ আর করা হবে না।

৫.৪.২ ফ্লোচার্ট

ফ্লোচার্ট তৈরির কিছু নিয়ম আছে। বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এরকম কিছু প্রাথমিক চিহ্ন 5.5 চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র 5.2 : ফ্লোচার্টের বিভিন্ন চিহ্ন

উপরের অ্যালগরিদমটি ফ্লোচার্ট আকারে প্রকাশ করা যাবে এভাবে—

চিত্র ৫.৩ : কলেজে যাওয়ার ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরির পরে নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষায় কোড লেখা হয়। কোড লেখার পরে সেই কোড বিভিন্ন টেস্ট-কেস (test case) দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ইনপুটের জন্য প্রোগ্রামটি প্রত্যাশিত আউটপুট দিচ্ছে কি না সেটি যাচাই করে দেখা হয়। যদি কোনো টেস্ট কেসের জন্য প্রত্যাশিত আউটপুট না আসে, তখন বুঝতে হবে প্রোগ্রামটি সঠিক নয়। প্রোগ্রামটি ভুল আউটপুট দেওয়ার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সমস্যাটি সমাধানের জন্য যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়েছে সেটি সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, অ্যালগরিদম ঠিক হলেও, অ্যালগরিদম অনুসরণ করে প্রোগ্রাম লেখার সময় কোনো ভুল হয়েছে। কোডে এ ধরনের ভুল থাকলে তাকে বাগ (bug) বলা হয়। এ পর্যায়ে প্রোগ্রামের যাবতীয় বাগ খুঁজে বের করে সমাধান করা হয়, অর্থাৎ, প্রোগ্রামটি ত্রুটিমুক্ত করা হয়। এই ধাপটিকে বলা হয় ডিবাগিং (debugging)।

সব টেস্ট কেসের জন্য প্রোগ্রাম যখন ঠিকঠাক কাজ করে, তখন সেটি রিলিজ (release) করা হয়। বড় বড় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে রিলিজ করার সময় ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা বা ইউজার ম্যানুয়াল (User manual) তৈরি করা হয়।

প্রোগ্রাম তৈরির মূল ধাপগুলো হচ্ছে :

- যে সমস্যাটি সমাধান করা হবে, সেটিকে ঠিকভাবে বর্ণনা করা
- সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করা
- কোড লেখা
- প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা ও ভুল থাকলে ডিবাগ করে প্রোগ্রাম সংশোধন করা
- প্রোগ্রাম রিলিজ করা

৫.৫ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল (Program Design Model)

বাস্তব জীবনে কম্পিউটার প্রোগ্রাম কার্যকর করা যথেষ্ট সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এর পুরো প্রক্রিয়াটি কার্যকর করার একটি গুরুত্বপুর্ণ মডেল হচ্ছে ওয়াটারফল বা জলপ্রপাত মডেল। এখানে পুরো প্রজেক্টটিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট এবং ধারাবাহিক অংশে ভাগ করে নেয়া হয়। এর একটি অংশ শেষ হলেই মাত্র অন্য অংশটি শুরু করা যায়। পুরো প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়াটি যেহেতু জলপ্রপাতের মতো একদিকে প্রবাহিত হয় সেজন্য এটিকে ওয়াটারফল বা জলপ্রপাত মডেল বলা হয়।

এই মডেল অনুযায়ী প্রোগ্রামিংয়ের ধারাবাহিক অংশগুলো হচ্ছে প্রয়োজনের বিশ্লেষণ, ডিজাইন, কোডিং, নিরীক্ষণ, কার্যক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। এই মডেলে প্রয়োজনের বিশ্লেষণে 20-40% এবং ডিজাইন ও কোডিংয়ে 30-40% সময় ব্যয় করা হয়। বাকি সময়টুকুতে নিরীক্ষণ এবং কার্যকর করার কাজে শেষ করতে হয়। এভাবে সময়ের বণ্টন যথেষ্ট যৌক্তিক, কারণ দেখা গিয়েছে প্রোগ্রামিংয়ের শুরুর দিকে একটি সমস্যার সমাধান যত সহজ, শেষের দিকে ঠিক ততটাই কঠিন। এই মডেলে ঠিকভাবে প্রোগ্রামিংয়ের তথ্য সংরক্ষণের উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে কারণে একজন বা একটি টিম প্রোগ্রামিংয়ের মাঝখানে চলে গেলেও প্রোগ্রামটি সহজভাবে শেষ করা সম্ভব হয়।

৫.৬ 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Language C)

এর পরের অংশটুকু পুরোপুরি ব্যবহারিক। প্রোগ্রামিং করার ব্যবস্থা আছে (কম্পিউটারে কিংবা স্মার্টফোনে) শুধু সেরকম পরিবেশে পরের অংশটুকু শিক্ষার্থীর জন্য অর্থপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

সি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রোগ্রামিং ভাষা। সি ভাষা ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। যেমন—

- সিস্টেম লেভেলের প্রোগ্রাম, যা দিয়ে সরাসরি হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন— কি-বোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাইভার সফটওয়্যার সি ভাষা ব্যবহার করে লেখা যায়। এছাড়া যেসব ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে মাইক্রোপ্রসেসর বা মাইক্রোকন্ট্রোলার থাকে, (যেমন— টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি) তাতে যেসব প্রোগ্রাম তৈরি করে দেওয়া থাকে, সেখানে সি ভাষা ব্যবহার করা হয়।
- অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, যেগুলো ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে পারে। যেমন— ছবি সম্পাদনার জনপ্রিয় সফটওয়্যার অ্যাডোবি ফটোশপ (Adobe Photoshop)।

২০২৪-২০২৫

- বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষার কম্পাইলার তৈরিতে সি ভাষা ব্যবহার করা হয়।
- কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম, যেমন— লিনাক্স (Linux) সি দিয়ে তৈরি।
- বিভিন্ন রকম ডেটাবেজ প্রোগ্রাম। ডেটাবেজ অধ্যায়ে এসকিউলাইট (SQLite) নামক যে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দেখানো হয়েছে, সেটিও সি দিয়ে তৈরি।

সি ভাষার কম্পাইলার

কম্পিউটারে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখে চালাতে হলে প্রথমে ইন্টারনেট থেকে একটি কম্পাইলার সফটওয়্যার ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে নিতে হবে। প্রথমে একটি টেক্সট ফাইলে প্রোগ্রাম লিখে সেভ করতে হবে। এই ফাইলের এক্সটেনশন হবে .c (অর্থাৎ, ফাইলটির নামের শেষে .c কথাটি থাকবে, যেমন— program1.c)। এরপরে ফাইলটি কম্পাইলার ব্যবহার করে কম্পাইল করতে হবে। কম্পাইল করার পরে একটি এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরি হবে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে এই এক্সিকিউটেবল ফাইলের এক্সটেনশন হয় .exe (যেমন— program1.exe)।

প্রোগ্রাম কম্পাইলারগুলো সাধারণত কমান্ড লাইনভিত্তিক হয়। অর্থাৎ, কমান্ড লাইন অ্যাপ্লিকেশনে নির্দেশ টাইপ করে প্রোগ্রাম কম্পাইল করতে হয়। তবে বর্তমানে প্রোগ্রামারদের কাজ সহজ করার জন্য কিছু আইডিই সফটওয়্যার পাওয়া যায়, যেখানে, একই সঙ্গে কোড লেখা, কম্পাইল করাসহ বিভিন্ন কাজ করা যায়।

ইন্টারনেটে এরকম বিভিন্ন আইডিই (IDE) সফটওয়্যার বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সি ভাষার জন্য ব্যবহৃত একটি আইডিই হচ্ছে কোডব্লকস (Code::blocks)। এছাড়া নেটবিনস, একলিপ্স, মাইক্রোসফট ভিজ্যুয়াল স্টুডিওসহ বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়েও সি ভাষায় প্রোগ্রামিং করা যায়। এসব সফটওয়্যারের পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালিত মোবাইল ফোনের জন্যও বিভিন্ন কম্পাইলার অ্যাপ পাওয়া যায়।

হ্যালো ওয়ার্ল্ড (Hello World)

এখন আমরা একটি সি প্রোগ্রাম দেখব।

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Hello World!");
6
7      return 0;
8  }
```

প্রোগ্রাম 5.1

কোড লেখার পরে প্রোগ্রামটি সেভ করতে হবে। সেভ করার সময় ফাইলের এক্সটেনশন দিতে হবে .c। এরপর প্রোগ্রামটি কম্পাইল এবং রান করতে হবে। প্রোগ্রামটি রান করলে আউটপুট আসবে এরকম—

```
Hello World!
```

সি ভাষায় তৈরি প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য একটি ফাংশন তৈরি করা হয়। ফাংশনের ভেতরে ওই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কোড লেখা থাকে।

উপরের প্রোগ্রামের তৃতীয় লাইনে রয়েছে, int main()। একে বলা হয় main() ফাংশন। চতুর্থ এবং অষ্টম লাইনে দুটি ব্র্যাকেট (দ্বিতীয় বন্ধনী) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে main() ফাংশনটি চতুর্থ লাইনে শুরু হয়েছে এবং অষ্টম লাইনে শেষ হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম লাইনে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ষষ্ঠ লাইনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে।

সি ভাষায় লেখা যে কোনো প্রোগ্রাম চলা শুরু হয় main() ফাংশন থেকে। যেমন— উপরের কোডে তৃতীয় লাইনে main() ফাংশন থেকে এই প্রোগ্রামটি চলতে আরম্ভ করবে। একটি প্রোগ্রামে কেবল একটি main() ফাংশনই লেখা হয়।

এর পরে পঞ্চম লাইনে রয়েছে printf ("Hello World!") স্টেটমেন্ট। printf() একটি ফাংশন, যার কাজ হচ্ছে স্ক্রিনে কোনো কিছু প্রিন্ট করা। যেমন— এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এই স্টেটমেন্টটি স্ক্রিনে Hello World! কথাটি প্রিন্ট করছে। printf() ফাংশনটি কীভাবে প্রিন্ট করার কাজটি করবে, সেটি এই প্রোগ্রামে কোথাও বলা নেই, তবে stdio.h নামক একটি ফাইলে বলা আছে। একে বলে হেডার (header) ফাইল। হেডার ফাইলে বিভিন্ন ফাংশন তৈরি করে দেওয়া থাকে। এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করার জন্য হেডার ফাইলটি প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

প্রথম লাইনে #include <stdio.h> লেখার কারণে stdio.h ফাইলে যে সব ফাংশন দেওয়া আছে, সেগুলো এই প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যাবে। stdio.h হেডার ফাইলে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া ও আউটপুট প্রিন্ট করা সংক্রান্ত বেশ কিছু ফাংশন লেখা আছে।

প্রোগ্রামের সপ্তম লাইনে লেখা আছে, return 0। এটি মেইন ফাংশনের শেষ লাইন। এই লাইনটি কী কাজ করে তা নিয়ে এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এই লাইনটি চলার পরে এই প্রোগ্রামটি চলা শেষ হবে।

নিজে করি ১ : একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যেটি স্ক্রিনে I love Bangladesh. কথাটি প্রিন্ট করবে।

ডেটা টাইপ (Types of Data)

আমরা জানি কম্পিউটার প্রসেসর বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ করে। এই হিসাব-নিকাশগুলো বিভিন্ন ডেটার উপরে করা হয়। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় বেশ কিছু ডেটা টাইপ রয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— char, int, float ও double। নিচে ডেটা টাইপগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো—

char

এটি হচ্ছে character-এর প্রথম চারটি অক্ষর। এ ধরনের ডেটা টাইপ একটিমাত্র অক্ষর (বর্ণ, অঙ্ক, যতিচিহ্ন ইত্যাদি) ধারণ করতে পারে, যেমন— 'a', 'D', '5', '!' ইত্যাদি। এটি কম্পিউটারের মেমোরিতে সাধারণত এক বাইট (অর্থাৎ, আট বিট) জায়গা দখল করে। তাহলে এ ধরনের ডেটা টাইপে 2^8 বা 256টি পৃথক ডেটা রাখা যায়। 256টি জিনিস কিন্তু একটি ভ্যারিয়েবলে একসঙ্গে রাখা যায় না, একটি ভ্যারিয়েবলে একই সময়ে কেবল একটি ডেটা রাখা যায়, আর char টাইপের ডেটার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য 256টি মানের যে কোনো একটি রাখা যায়।

একটি বিটে যে কোনো সময়ে রাখা যায় 0 অথবা, 1। অর্থাৎ, একটি বিট দিয়ে দুটি ভিন্ন জিনিস প্রকাশ করা যায়। আবার দুইটি বিট দিয়ে প্রকাশ করা যায় চারটি ভিন্ন জিনিস— 00, 01, 10, এবং 11। একইভাবে তিনটি বিট দিয়ে প্রকাশ করা যায় আটটি ভিন্ন জিনিস— 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, এবং 111। তাহলে n-সংখ্যক বিট দিয়ে প্রকাশ করা যায়, 2^n-সংখ্যক ভিন্ন জিনিস।

int

Integer শব্দের অর্থ পূর্ণসংখ্যা। এই শব্দের প্রথম তিনটি অক্ষর নিয়ে int ডেটা টাইপের নামকরণ করা হয়েছে। এ ধরনের ডেটা টাইপে পূর্ণসংখ্যা রাখা যায়। একটি int টাইপের ডেটা সাধারণত কম্পিউটারের মেমোরিতে চার বাইট (অর্থাৎ, 32 বিট) জায়গা দখল করে। যেহেতু এর সাইজ 32 বিট, তাই এতে সম্ভাব্য 2^{32} বা 4294967296 রকমের সংখ্যা রাখা যায়। আর সংখ্যা যেহেতু ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় জাতীয় হতে পারে, তাই −2147483648 থেকে 2147483647 সীমার মধ্যে যে কোনো সংখ্যা int টাইপের ডেটাতে ধারণ করা যায়।

float

দশমিকযুক্ত সংখ্যা অর্থাৎ, floating point number রাখার জন্য float ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। এটি মেমোরিতে সাধারণত চার বাইট জায়গা দখল করে।

double

এটিও দশমিক যুক্ত সংখ্যা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে এটি সাধারণত কম্পিউটারের মেমোরিতে আট বাইট জায়গা নেয়।

কয়েকটি প্রোগ্রাম লিখে উল্লিখিত ডেটা টাইপের ব্যবহার দেখানো হলো—

উদাহরণ ১

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch;
    ch = 'X';
    printf("The character is %c", ch);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.2

প্রোগ্রামটি কম্পাইল ও রান করলে আউটপুট আসবে The character is X।

এই প্রোগ্রামে char ch লিখে char টাইপের একটি ভ্যারিয়েবল (variable) তৈরি করা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ch। এখানে ch-এর বদলে অন্য নামও ব্যবহার করা যেত। একে ভ্যারিয়েবল বলা হয়। ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা প্রিন্ট করার জন্য %c ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় ফরম্যাট স্পেসিফায়ার (format specifier)। নিচের টেবিলে বিভিন্ন ডেটা টাইপের ফরম্যাট স্পেসিফায়ার দেখানো হলো—

ডেটা টাইপ	ফরম্যাট স্পেসিফায়ার
char	%c
int	%d
float	%f
double	%lf (এখানে l হচ্ছে ছোট হাতের ইংরেজি L অক্ষর)

সি প্রোগ্রামে ভ্যারিয়েবলের নাম লেখার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। ভ্যারিয়েবলের নামে কেবল বর্ণ, অঙ্ক এবং বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। তবে নামের প্রথম অক্ষরটি কোনো অঙ্ক হতে পারবে না। Variable এ underscore (_) এবং doller সাইন ($) ছাড়া অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার (@, !, %, +, - ...ইত্যাদি) এবং punctuation character (,.: ইত্যাদি) বা কোনো ধরনের অপারেটর ব্যবহার করা যাবে না। Variable নামে কোনো স্পেস দেয়া যাবে না। C তে uppercase and lowercase character–এর মধ্যে পার্থক্য আছে, যার কারণে C কে case sensitive programming language বলা হয়। তাই aaa, AAA, Aaa ba Net, net, NeT ইত্যাদি variable–এর মান এক নয়। স্পেশালি কোনো কি-ওয়ার্ডকে variable এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ঠিক ভ্যারিয়েবল নামের উদাহরণ	ভুল ভ্যারিয়েবল নামের উদাহরণ
age final_result student_1_marks student0 __current_date	0student final result greetings! my,name

উদাহরণ ২

একটি ক্যারেক্টার টাইপের ভ্যারিয়েবল char টাইপের যে কোনো ডেটা ধারণ করতে পারে। বিষয়টি একটি প্রোগ্রাম লিখে দেখা যাক।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch;
    ch = 'x';
    printf("Value stored in ch is %c\n", ch);
    ch = 'y';
    printf("Value stored in ch is %c\n", ch);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.3

উপরের প্রোগ্রামটি কম্পাইল করে রান করলে নিচের মতো আউটপুট পাওয়া যাবে।

```
Value stored in ch is x
Value stored in ch is y
```

আউটপুট দেখে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে প্রোগ্রামটিতে কী কাজ হচ্ছে। এখানে printf() ফাংশনের ভেতরে \n ব্যবহার করা হয়েছে। \n-এর মানে হচ্ছে নিউ লাইন (new line), অর্থাৎ এটি প্রিন্ট করলে আউটপুটের পরবর্তী অংশ স্ক্রিনে নতুন লাইনে চলে যাবে। যদি printf() ফাংশনের ভেতরে \n ব্যবহার করা না হতো, তবে আউটপুট হতো এরকম—

```
Value stored in ch is x Value stored in ch is y
```

একটি ভ্যারিয়েবলে যখন কোনো মান রাখা হয় (যেমন— ch = 'x';), একে বলা হয় ch-এর মধ্যে 'x' অ্যাসাইন করা এবং অপারেশনটির নাম হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশন। একটি ভ্যারিয়েবলে একই সময়ে কেবল একটি মান অ্যাসাইন করা যায়।

নিজে করি ২ : প্রোগ্রাম 5.3-এ ch-এর বদলে বিভিন্ন নামের ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। প্রতিবার প্রোগ্রাম সেভ করে কম্পাইল ও রান করতে হবে।

উদাহরণ ৩

এখন একটি প্রোগ্রাম দেখানো হবে, যার কাজ হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল ও ভাগফল প্রকাশ করা—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int number1, number2;
    number1 = 12;
    number2 = 4;
    printf("number1 + number2 = %d\n", number1 + number2);
    printf("number1 - number2 = %d\n", number1 - number2);
    printf("number1 * number2 = %d\n", number1 * number2);
    printf("number1 / number2 = %d\n", number1 / number2);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.4

আউটপুট

```
number1 + number2 = 16
number1 - number2 = 8
number1 * number2 = 48
number1 / number2 = 3
```

ইন্টিজার টাইপের ডেটা প্রিন্ট করার জন্য %d ব্যবহার করা হয়। আর গুণচিহ্ন ও ভাগচিহ্ন হচ্ছে, যথাক্রমে * ও /। উপরের প্রোগ্রামটিতে চাইলে আরেকটি ভ্যারিয়েবল তৈরি করা যায়, যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক অপারেশনের ফলাফল রাখা হবে।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int number1, number2, result;
    number1 = 12;
    number2 = 4;
    result = number1 + number2;
    printf("number1 + number2 = %d\n", result);
    result = number1 - number2;
    printf("number1 - number2 = %d\n", result);
    result = number1 * number2;
    printf("number1 * number2 = %d\n", result);
    result = number1 / number2;
    printf("number1 / number2 = %d\n", result);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.5

উল্লেখ্য যে, number1 + number2 হচ্ছে একটি এক্সপ্রেশন (expression)। সি প্রোগ্রামিংয়ে এক্সপ্রেশন বলতে বোঝানো হয় কিছু কোড যা একটি মান প্রকাশ করে। আবার number2 = 4; হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট (statement)। একটি স্টেটমেন্ট দিয়ে একটি কাজ বোঝানো হয়। এখানে কাজটি হচ্ছে number2 নামক ভ্যারিয়েবলে 4 রাখা। আবার, result = number1 + number2; একটি স্টেটমেন্ট। এটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে number1 + number2 এক্সপ্রেশনটি এক্সিকিউট করে যে মান পাওয়া যাবে, সেটি result নামক ভ্যারিয়েবলে রাখা। printf("number1 / number2 = %d\n", result); - এটিও একটি স্টেটমেন্ট। প্রতিটি স্টেটমেন্টের শেষে একটি সেমিকোলন চিহ্ন দেওয়া হয়।

কি-ওয়ার্ড (Keyword)

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় বেশ কিছু সংরক্ষিত শব্দ আছে, যেগুলো হচ্ছে সি ভাষার অংশ। তাই এসব শব্দকে ভ্যারিয়েবলের নাম কিংবা ফাংশনের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এসব শব্দকে বলা হয় কি-ওয়ার্ড। নিচের টেবিলে C ভাষার ANSI (ANSI: American National Standard Institute) কি-ওয়ার্ডের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while

এ সমস্ত কি-ওয়ার্ড মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কেবল খেয়াল রাখতে হবে, এই নামগুলো ভ্যারিয়েবল কিংবা ফাংশনের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট (Input Output Statements)

ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে স্ক্রিনে প্রিন্ট করতে হয়, অর্থাৎ, আউটপুট দিতে হয়। এবারে ইনপুট নেওয়ার পালা। নিচের প্রোগ্রামটি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নেবে এবং তাদের যোগফল আউটপুটে দেখাবে।

উদাহরণ ৪

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1, n2;
    scanf("%d %d", &n1, &n2);
    printf("%d\n", n1+n2);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.6

প্রোগ্রামটি কম্পাইল করে রান করলে সেটি ব্যবহারকারীর ইনপুটের জন্য অপেক্ষা করবে (চিত্র 5.7), দুটি সংখ্যা লিখে কি-বোর্ডের এন্টার কি (key) চাপলে তখন আউটপুট দেখাবে (চিত্র 5.8)।

২০২৪-২০২৫

চিত্র 5.4 : কমান্ড লাইনে কিছু প্রিন্ট না করে ব্যবহারকারীর ইনপুটের জন্য অপেক্ষা করছে

চিত্র 5.5 : দুটি সংখ্যা টাইপ করে কি-বোর্ডের Enter কি চাপার পরে ফলাফল পাওয়া গেল

তাহলে দেখা যাচ্ছে, scanf() ফাংশনটি দিয়ে ইনপুট নেওয়া হয়। আর যেসব ভ্যারিয়েবলের মান ইনপুট নেওয়া হচ্ছে, তাদের আগে অ্যামপারসেন্ড (&) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আর ফাংশনটির ভেতরে printf() ফাংশনের মতো একই ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ৫

একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যা কোনো তাপমাত্রাকে সেলসিয়াস এককে ইনপুট নেবে এবং ফারেনহাইট এককে আউটপুট দেবে। প্রোগ্রাম লেখার আগে প্রোগ্রামটির ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।

সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইটে রূপান্তর করার সূত্র হচ্ছে, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$ সুতরাং $F = 9/5 \times C + 32$

ফ্লোচার্টটি চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র 5.6 : সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট রূপান্তরের ফ্লোচার্ট

আর প্রোগ্রামটি হবে এরকম—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double C, F;
    scanf("%lf", &C);
    F = 9/5 * C + 32;
    printf("%lf\n", F);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.7

নিজে করি ৩ : একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যা কোনো তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট এককে ইনপুট নেবে এবং সেলসিয়াস এককে আউটপুট দেবে।

২০২৪-২০২৫

কনডিশনাল স্টেটমেন্ট (Conditional Statements)

কম্পিউটার প্রোগ্রাম এমনভাবে লেখা যায়, যেন প্রোগ্রামটি বিভিন্ন শর্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই শর্তকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় বলে কন্ডিশন (condition), আর যে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে শর্ত তৈরি করা হয়, তাকে বলে কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন (conditional expression)। কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন যখন এক্সিকিউট হয়, তখন তার ফলাফল হবে হয় সত্য (True), নয়তো মিথ্যা (False)।

রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)

সি প্রোগ্রামিং ভাষায়, দুটি সংখ্যা তুলনা করার জন্য ছয়টি অপারেটর আছে, এগুলোকে বলা হয় রিলেশনাল অপারেটর। নিচের টেবিলে সেগুলো দেখানো হলো—

অপারেটর	ব্যাখ্যা
==	দুটি সংখ্যা সমান কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়। সমান হলে ফলাফল সত্য আর সমান না হলে ফলাফল মিথ্যা হয়।
!=	দুটি সংখ্যা অসমান কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়। অসমান হলে ফলাফল সত্য আর সমান হলে ফলাফল মিথ্যা হয়।
>	দুটি সংখ্যার মধ্যে বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে বড় কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়, বামপক্ষ যদি বড় হয় তাহলে ফলাফল সত্য, আর তা না হলে ফলাফল মিথ্যা।
>=	দুটি সংখ্যার মধ্যে বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে বড় অথবা সমান কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়, বামপক্ষ যদি বড় হয়, অথবা ডানপক্ষের সমান হয় তাহলে ফলাফল সত্য, আর তা না হলে ফলাফল মিথ্যা।
<	দুটি সংখ্যার মধ্যে বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে ছোট কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়, বামপক্ষ যদি ছোট হয় তাহলে ফলাফল সত্য, আর তা না হলে ফলাফল মিথ্যা।
<=	দুটি সংখ্যার মধ্যে বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে ছোট অথবা সমান কি না সেটি পরীক্ষা করা হয়, বামপক্ষ যদি ছোট হয়, অথবা ডানপক্ষের সমান হয়, তাহলে ফলাফল সত্য, আর তা না হলে ফলাফল মিথ্যা।

টেবিল **5.1**

if স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় বিভিন্ন শর্ত পরীক্ষার জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

```
if (conditional expression)
{
    statement 1;
    ....
}
```

প্রথম বন্ধনীর ভেতরের conditional expression যদি সত্য হয়, তাহলে if ব্লকের ভেতরের কাজ হবে। কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশনের পরে দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে ব্লকটি আবদ্ধ থাকে। ব্লকের ভেতরে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট থাকতে পারে।

২০২৪-২০২৫

উদাহরণ ৬

এখন একটি প্রোগ্রাম লেখা হবে, যেটি দুটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে বের করবে তারা সমান কি না।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1 = 5, n2 = 7;
    if (n1 == n2)
    {
        printf("Numbers are equal.");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.8

প্রোগ্রামটি রান করলে আমরা আউটপুটে কিছুই দেখতে পাব না। কেননা, if-এর ভেতরে ব্যবহৃত কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশনটির মান মিথ্যা। তাই if-ব্লকের ভেতরের কোড এক্সিকিউট হয়নি।

if-else স্টেটমেন্ট : Conditional expression সঠিক হলে এক ধরনের কাজ এবং conditional expression সঠিক না হলে অন্য ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয় সেক্ষেত্রে if else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

```
if (conditinal expression)
{
   statement, if condition is true;
   }
   else
   {
   statement, if condition is false;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1 = 5, n2 = 7;
    if (n1 == n2)
    {
        printf("Numbers are equal.");
    }
    else
    {
        printf("Numbers are not equal.");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.9

এই প্রোগ্রামটি রান করলে আমরা এরকম আউটপুট দেখতে পাব—

```
Numbers are not equal.
```

if-এর সঙ্গে ব্যবহৃত কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশনটি (n1 == n2) মিথ্যা হওয়ায় if ব্লকের কোড এক্সিকিউট হয়নি, else ব্লকের কোডগুলো এক্সিকিউট হয়েছে। আবার যদি, n1, এবং n2 দুটি ভ্যারিয়েবলের মান সমান হতো, তাহলে if ব্লকের কোড এক্সিকিউট হতো, কিন্তু else ব্লকের কোড এক্সিকিউট হতো না। তখন আমরা আউটপুট দেখতাম—

```
Numbers are equal.
```

আবার আরেকটি ব্লক আছে, else if. কখনো যদি এমন প্রোগ্রাম লেখা হয় যে একটি শর্তের পরে অন্য একটি শর্ত পরীক্ষা করা হবে, তখন if-এর সঙ্গে এক বা একাধিক else if ব্লক ব্যবহার করা হয়। যেমন—

else if chain স্টেটমেন্ট : conditional expression যদি একাধিক হয় তাহলে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

```
if (conditional  expression 1)
{
    statement, if conditional expression-1 is true ;
    }
     else if (conditional expression-2)
    {
    statement, if conditional expression-2 is true,
    }
. . . . . .
. . . . . .
    else
    {
    statement, if both conditions are false ;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1 = 5, n2 = 7;
    if (n1 == n2)
    {
        printf("Numbers are equal.");
    }
    else if (n1 > n2)
    {
        printf("n1 is greater than n2.");
    }
    else
    {
        printf("n1 is smaller than n2.");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.10

এক্ষেত্রে যে ব্লকের কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশনটি সত্য শুধু সেই ব্লকটির কোড এক্সিকিউট হবে, অন্য কোনো ব্লকের

কোড এক্সিকিউট হবে না। আর যদি কোনো ব্লকের শর্তই সত্য না হয়, তাহলে, সবশেষের else ব্লকের কোড এক্সিকিউট হবে।

উপরের প্রোগ্রামটির যদি ফ্লোচার্ট তৈরি করা হয়, সেটি হবে চিত্র 5.7 এর মতো।

চিত্র 5.7: দুটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করার ফ্লোচার্ট

এখন আরেকটি উদাহরণ দেখানো হবে।

উদাহরণ ৭

ধরা যাক, কোনো পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ইনপুট নেওয়া হবে। এই নম্বরের উপর ভিত্তি করে এই বিষয়ের লেটার গ্রেড আউটপুট দেখানো হবে।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int marks;
    scanf("%d", &marks);
    if (marks >= 80){
        printf("Your grade is A+\n");
    }
    else if (marks >= 70){
        printf("Your grade is A\n");
```

```
    }
    else if (marks >= 60){
        printf("Your grade is A-\n");
    }
    else if (marks >= 50){
        printf("Your grade is B\n");
    }
    else if (marks >= 40){
        printf("Your grade is C\n");
    }
    else if (marks >= 33){
        printf("Your grade is D\n");
    }
    else{
        printf("Your grade is F\n");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.11**

এভাবে অসংখ্য if, else if যখন পরপর থাকে, তখন কোনো একটি শর্ত যদি সত্য হয়, তখন বাকি else if গুলোর শর্ত আর পরীক্ষা করা হয় না। যেমন— ইনপুট যদি হয় 75, তখন প্রথমে marks >= 80 শর্তটি পরীক্ষা করা হবে। শর্তটি মিথ্যা, তাই পরবর্তী শর্ত (marks >= 70) পরীক্ষা করা হবে। এটি সত্য। তাই এই ব্লকের ভেতরের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে printf() স্টেটমেন্টটি এক্সিকিউট হবে। তারপরে কিন্তু আর কোনো else if ব্লকের শর্ত পরীক্ষা করা হবে না।

নিজে করি ৪ : উপরের প্রোগ্রামে নিচের সংখ্যা ইনপুট দেওয়া হলে কী আউটপুট পাওয়া যাবে তা নির্ণয় করি :

ক) 98
খ) 80
গ) 79
ঘ) 64
ঙ) 37
চ) 23
ছ) -20

লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)

একাধিক শর্ত মিলিয়ে নতুন শর্ত তৈরি করার জন্য গাণিতিক এক্সপ্রেশনের মতো, লজিক্যাল এক্সপ্রেশন লেখা যায়। বিভিন্ন শর্ত লজিক্যাল অপারেটর দিয়ে যুক্ত করে লজিক্যাল এক্সপ্রেশন তৈরি করা হয়।

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় তিন ধরনের লজিক্যাল অপারেটর আছে— && (and), || (or) এবং ! (not) অপারেটর।

অ্যান্ড (&&) অপারেটরের ক্ষেত্রে, বাম পক্ষে একটি শর্ত ও ডান পক্ষে একটি শর্ত থাকবে। যদি দুটি শর্তই সত্য হয়, তাহলে পুরো এক্সপ্রেশনটি সত্য হবে। যে কোনো একটি বা দুটি শর্তই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে পুরো শর্তটি মিথ্যা হবে।

A	B	A && B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

টেবিল **5.2**

অর (||) অপারেটরের ক্ষেত্রে, বাম পক্ষে একটি শর্ত ও ডান পক্ষে একটি শর্ত থাকবে। যদি দুটি শর্তের কমপক্ষে একটি সত্য হয়, তাহলে || সহ পুরো শর্তটি সত্য হবে। দুটি শর্তই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে পুরো শর্তটি মিথ্যা হবে।

A	B	A || B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

টেবিল **5.3**

নট (!) অপারেটরের বেলায়, অপারেটরের পরে কেবল একটি শর্ত থাকবে। শর্তটি সত্যি হলে পুরো শর্তটি মিথ্যা, আর শর্তটি মিথ্যা হলে পুরো শর্তটি সত্য হবে।

A	!A
True	False
False	True

টেবিল **5.4**

উদাহরণ ৮

ধরা যাক, কোনো একটি চাকরির আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হলো 18 থেকে 35। এখন একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যেটি আবেদনকারীর বয়স ইনপুট নেবে এবং বয়সের হিসেবে যে আবেদন করার যোগ্য কি না, সেটি প্রিন্ট করবে।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int age;
    scanf("%d", &age);
```

```
    if (age >= 18 && age <= 35)
    {
        printf("Yes, you are eligible.\n");
    }
    else
    {
        printf("Sorry, you are not eligible.\n");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.12

উপরের প্রোগ্রামটিতে if ব্লকের ভেতরে দুটি শর্ত ব্যবহার করা হয়েছে এবং শর্ত দুটি && অপারেটর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে age >= 18 এবং age <= 35 দুটি শর্তই যদি সত্য হয়, তাহলে পুরো শর্তটি সত্য হবে। প্রোগ্রামটিতে যদি !(age < 18 || age > 35) শর্ত ব্যবহার করা হতো, তাহলেও প্রোগ্রামটি একই কাজ করত।

উদাহরণ ৯

একটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হবে। সংখ্যাটি 3 দ্বারা বিভাজ্য হলে Fizz প্রিন্ট করতে হবে, 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে Buzz প্রিন্ট করতে হবে, আর সংখ্যাটি যদি 3 ও 5 উভয় সংখ্যা দ্বারাই বিভাজ্য হয়, তাহলে প্রিন্ট করতে হবে FizzBuzz.

কোনো সংখ্যা a যদি b দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহলে ভাগশেষ থাকবে 0। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় ভাগশেষ বের করার অপারেটর হচ্ছে % (একে বলে মডুলাস modulus অপারেটর)। a % b-এর মান 0 হলে b দ্বারা a বিভাজ্য।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num;
    scanf("%d", &num);
    if (num % 3 == 0 && num % 5 == 0)
    {
        printf("FizzBuzz\n");
    }
    else if (num % 3 == 0)
    {
        printf("Fizz\n");
    }
    else if (num % 5 == 0)
    {
        printf("Buzz\n");
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.13

২০২৪-২০২৫

নিজে করি ৫ : উপরের প্রোগ্রামটির ফ্লোচার্ট তৈরি করি।

লুপ স্টেটমেন্ট (Loop Statements)

একই কাজ বারবার করার জন্য প্রোগ্রামিং ভাষায় লুপ স্টেটমেন্ট থাকে। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় তিন ধরনের লুপ আছে, while লুপ, do-while লুপ এবং for লুপ।

while লুপ

while লুপের সিনট্যাক্স হচ্ছে—

```
while (condition)
{
    statement;
    ...
}
```

এখানে condition সত্য হলে, while-এর ব্লকের ভেতরের কাজ করা হবে। কাজ শেষে আবার condition পরীক্ষা করা হবে। এবারেও condition সত্য হলে আবারো while-এর ব্লকের ভেতরের কাজ করা হবে। এভাবে চক্রাকারে কাজটি বারবার চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত condition সত্য থাকে। যেমন— ধরা যাক, একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যেটি I Love Bangladesh কথাটি পাঁচবার প্রিন্ট করবে।

উদাহরণ ১০

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    i = 0;
    while (i < 5) {
        printf("I Love Bangladesh.\n");
        i = i + 1;
  }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.14**

i = 0; স্টেটমেন্টে i তে 0 রাখা হয়েছে। তারপর while-এর ভেতরের শর্ত পরীক্ষা করা হবে। i < 5 শর্তটি সত্য, কারণ i-এর মান এখন 0। তারপর printf() স্টেটমেন্টের কাজ হবে। তারপর i = i + 1; স্টেটমেন্টটি এক্সিকিউট হবে। এই স্টেটমেন্টে i-এর মানের সঙ্গে 1 যোগ করে সেটি আবার i-তে রাখা হয়েছে (বা অ্যাসাইন করা হয়েছে)।

i-এর মান এখন 1। তারপরে আবার i < 5 শর্তটি পরীক্ষা করা হবে এবং এবারো শর্তটি সত্য (i-এর মান এখন 1)। তাই printf() ফাংশনটি এক্সিকিউট হবে। তারপরে আবার i-এর মান 1 বাড়বে। এভাবে চলতে থাকবে এবং যখন i-এর মান বেড়ে 5 হবে, তখন i < 5 শর্তটি মিথ্যা হয়ে যাবে এবং প্রোগ্রামটি while লুপের বাইরে চলে আসবে। i-এর পাঁচটি মান (0, 1, 2, 3, 4)-এর জন্য printf() ফাংশনটি পাঁচবার এক্সিকিউট হবে এবং পাঁচবার I Love Bangladesh কথাটি প্রিন্ট হবে।

নিজে করি ৬ : কথাটি একশবার প্রিন্ট করতে চাইলে কী করতে হবে?

উদাহরণ ১১

এখন আরেকটি প্রোগ্রাম লেখা হবে, যার কাজ হবে 1 থেকে 100 পর্যন্ত সব সংখ্যা প্রিন্ট করা।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    n = 1;
    while (n <= 100) {
        printf("%d\n", n);
        n = n + 1;
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.15

1 থেকে 100 পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা প্রিন্ট করার প্রোগ্রামের ফ্লোচার্ট চিত্রে দেখানো হল।

চিত্র 5.৪ : 1 থেকে 100 পর্যন্ত প্রিন্ট করার ফ্লোচার্ট

উদাহরণ ১২

এখন, 1 থেকে 100 পর্যন্ত সব জোড় সংখ্যা প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম লেখা হবে। এটি আগের প্রোগ্রামের মতোই হবে, তবে প্রতিটি সংখ্যা প্রিন্ট করার আগে সেটি জোড় কি না, তা পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য যে, কোনো সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ যদি 0 হয়, তাহলে সেটি জোড় সংখ্যা।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    n = 1;
    while (n <= 100) {
        if (n % 2 == 0){
            printf("%d\n", n);
        }
        n = n + 1;
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রামটি চাইলে এভাবেও লেখা যায়—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n = 2;
    while (n <= 100) {
        printf("%d\n", n);
        n = n + 2;
    }
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.16

উপরের প্রোগ্রামটিতে n-এর মান 2 থেকে শুরু হয়েছে এবং লুপের ভেতরে প্রতিবার n-এর মান 2 করে বাড়ানো হচ্ছে। তাই প্রোগ্রামটি 2 থেকে শুরু করে প্রতিটি জোড় সংখ্যা প্রিন্ট করবে এবং n-এর মান 100-এর চেয়ে বেশি হলে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে।

উদাহরণ ১৩

এখন 1 থেকে 100 পর্যন্ত সব পূর্ণসংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখা হবে। যদিও ধারার সূত্র ব্যবহার করে এক লাইনেই এটি করে ফেলা যায়, কিন্তু এখানে লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি তৈরি করা হবে। শুরুতে ধরা হবে যোগফল শূন্য। তারপর যোগফলের সঙ্গে প্রথমে 1 যোগ করা হবে, তারপর 2 যোগ করা হবে, এভাবে 100 পর্যন্ত সব সংখ্যা ওই যোগফলের সঙ্গে যোগ করা হবে।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, sum;
    sum = 0;
    n = 1;
    while (n <= 100)
    {
        sum = sum + n;
        n = n + 1;
    }
    printf("Result: %d\n", sum);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.17**

do-while loop: এ ক্ষেত্রে শর্ত এর মান লুপ স্টেটমেন্ট কার্যকর হওয়ার পর নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ লুপ শর্ত পূরণ হোক বা না হোক ১টি বারের জন্য কার্যকর হয়। এ ধরনের লুপকে exit controlled loop বলে।

do-while loop– এর সিনট্যাক্স হচ্ছে :

```
do
{
    statement;
}   while (condition );
```

উদাহরণ ১১ প্রোগ্রামটিকে do-while লুপ ব্যবহার করে লেখা যায়।

```
#include <studio.h>
int main ()
{
         int n;
          n=1;
           do
        {
         printf ("%d\n",  n);
         n= n+1;

        } while(n<-100),
return   0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.18**

নিজে করি ৭ : লুপ ব্যবহার করে 1 থেকে 500 পর্যন্ত সব বিজোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার ফ্লোচার্ট তৈরি করি এবং প্রোগ্রাম লিখি।

for লুপ

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় for লুপের সিনট্যাক্স হচ্ছে এরকম—

```
for (initialization; condition; increment)
{
    statement;
    ...
}
```

1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করার প্রোগ্রামটি যদি for লুপ ব্যবহার করে লেখা হয়, সেটি দাঁড়াবে এমন—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, sum;
    sum = 0;
    for(n = 1; n <= 100; n = n + 1) {
        sum = sum + n;
    }
    printf("Result: %d\n", sum);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.19**

নিজে করি ৮ : এখন পর্যন্ত while লুপ ব্যবহার করে বইতে যেসব প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো for লুপ ব্যবহার করে করতে হবে।

Continue স্টেটমেন্ট

Continue স্টেটমেন্ট লুপের ভিতরে ব্যবহৃত হয়। যখন Continue স্টেটমেন্ট এর সাথে ব্যবহৃত শর্তটি সঠিক হয় তখন কন্ট্রোলটি লুপের প্রথমে চলে যায় অন্যথায় পরবর্তী স্টেটমেন্ট কার্যকর হয়।

উদাহরণ:

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
      int i;
      for (i=1,  i <=5;   i=i+1)
      {
      if (i--)
      continue;
      printf ("%d", i);
      }
return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.20**

ফলাফল হবে : 2345 কারণ যখন i এর মান 1 হবে তখন সংখ্যার মানটি প্রদর্শিত না হয়ে লুপের প্রথমে কন্ট্রোলটি চলে যাবে। ফলে 1 লেখাটি প্রদর্শিত হবে না।

উদাহরণ ১৪

এখন for লুপ ব্যবহার করে নামতা লেখার প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। প্রথমে ফ্লোচার্ট তৈরি করে দেখানো হবে, তারপর প্রোগ্রাম লেখা হবে।

চিত্র 5.9: n-এর নামতার ফ্লোচার্ট

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, n;
    scanf("%d", &n);
    for(i = 1; i <= 10; i = i + 1) {
        printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
    }
    return 0;
}
```

প্রয়োজন হলে একটি লুপের ভেতরে আরো লুপ ব্যবহার করা যায়। একে বলে নেস্টেড লুপ (nested loop)।

অ্যারে (Array)

একটি ভ্যারিয়েবলে একই সময়ে কেবল একটি মান রাখা যায়। কিন্তু অনেক সময় একই ধরনের অসংখ্য ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে হয়। যেমন— একটি ক্লাসের একশজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর আউটপুট দেওয়া।

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় এজন্য একটি বিশেষ ডেটা স্ট্রাকচার (data structure) আছে, যার নাম অ্যারে। অ্যারেতে একই ধরনের একাধিক ডেটা রাখা যায়। অ্যারে তৈরি করার সিনট্যাক্স হচ্ছে—

```
data_type name[number of elements];
```

উদাহরণ ১৫

নিচের প্রোগ্রামটিতে একটি অ্যারে তৈরি করা হবে, যেখানে পাঁচজন শিক্ষার্থীর একটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর রাখা হবে।

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int marks[5];

    // assign marks to array
    marks[0] = 87;
    marks[1] = 82;
    marks[2] = 76;
    marks[3] = 85;
    marks[4] = 88;

    /* now print the marks */
    printf("%d\n", marks[0]);
    printf("%d\n", marks[1]);
    printf("%d\n", marks[2]);
    printf("%d\n", marks[3]);
    printf("%d\n", marks[4]);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.21

উল্লেখ্য যে, প্রোগ্রামটিতে এক জায়গায় // চিহ্নের পরে, আরেক জায়গায় /* ... */ চিহ্নের ভেতরে কিছু কথা লেখা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় মন্তব্য বা কমেন্ট (comment)। প্রোগ্রাম কম্পাইল ও রান করার সময় এই কমেন্টগুলো কোডের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। প্রোগ্রামারদের নিজেদের সুবিধার্থে কমেন্ট ব্যবহার করা হয়। তাই কোনো লাইনে // থাকলে সেই লাইনে তার পরের অংশগুলো আর প্রোগ্রামের অংশ বলে ধরা হয় না। একাধিক লাইনজুড়ে কমেন্ট লিখতে চাইলে /* দিয়ে শুরু এবং */ দিয়ে শেষ করতে হয়।

প্রোগ্রাম 5.21-এ marks নামের যে অ্যারেটি তৈরি করা হয়েছে (int marks[5];), সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অ্যারেটি ইন্টিজার টাইপের অর্থাৎ অ্যারের সব উপাদান হবে ইন্টিজার আর অ্যারেতে মোট 5টি উপাদান থাকবে। অ্যারের প্রথম উপাদান থাকে 0-তম ঘরে, দ্বিতীয় উপাদান থাকে 1-তম ঘরে, তৃতীয় উপাদান থাকে 2-তম ঘরে, এরকমভাবে n-তম উপাদান থাকে $(n-1)$-তম ঘরে। এই ঘরগুলোকে বলা হয় অ্যারের ইনডেক্স (index)। মনে রাখতে হবে যে, সি প্রোগ্রামিং ভাষায় অ্যারের ইনডেক্স 0 থেকে শুরু হয়, 1 থেকে নয়। তাহলে marks অ্যারেটিতে বিভিন্ন মান থাকবে নিচের চিত্রের মতো,

Value	87	82	76	85	88
Index	0	1	2	3	4

ইনডেক্স থাকার একটি সুবিধা হচ্ছে যে, এখানে লুপ ব্যবহার করা যায়। যেমন— পাঁচবার printf() স্টেটমেন্ট না লিখে এভাবেও লেখা যেত—

```
for (i = 0; i < 5; i = i + 1)
{
    printf("%d\n", marks[i]);
}
```

আবার অ্যারেতে বিভিন্ন মান অ্যাসাইন করার কাজটিও সংক্ষেপে করা যায় এভাবে—

```
int marks[] = {87, 82, 76, 85, 88};
```

এখানে marks-এ বলে দেওয়া নেই কয়টি উপাদান থাকবে, তবে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভেতরের উপাদানগুলোর সংখ্যা থেকেই কম্পাইলার বুঝে নেয় যে অ্যারেতে কয়টি উপাদান থাকবে।

আবার ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নিতে চাইলে সেটিও সহজে করা যায় এভাবে—

```
for (i = 0; i < 5; i = i + 1)
{
    scanf("%d", &marks[i]);
}
```

মনে রাখতে হবে, অ্যারের ইনডেক্স সব সময় হবে একটি পূর্ণসংখ্যা, যেটি 0 থেকে শুরু হবে। আর অ্যারেতে n সংখ্যক উপাদান থাকলে অ্যারের ইনডেক্স-এর সর্বোচ্চ মান হবে $n - 1$।

উদাহরণ ১৬

একটি অ্যারেতে দশটি সংখ্যা রাখা আছে। সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করতে হবে—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int numbers[10] = {9, 76, 2, 45, 3, 81, 25, 33, 71, 10};
    int i, sum;
    sum = 0;
    for (i = 0; i < 10; i = i + 1) {
        sum = sum + numbers[i];
    }
    printf("Sum: %d\n", sum);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.22**

একটি ফাংশনে যখন কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় (যেমন int sum), তখন সেই ভ্যারিয়েবলের ভেতরে কোনো মান দেওয়া থাকে না। সেই ভ্যারিয়েবলটির ভেতরে যে কোনো মান থাকতে পারে, যাকে গারবেজ (garbage) মান বলা হয়। তাই ভ্যারিয়েবলটির ভেতর যদি 0 রাখার প্রয়োজন হয়, তখন এর মধ্যে 0 অ্যাসাইন করতে হবে (যেমন sum = 0)। আর যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রামটিতে এমনটি করতে হয়েছে কারণ sum = sum + numbers[i] স্টেটমেন্ট চলার আগে sum-এর মান 0 করে দেওয়ার ফলে 0 +9 অর্থাৎ 9 সংখ্যাটি sum-এর মধ্যে আবার রাখা যাচ্ছে।

a = a + b; এই স্টেটমেন্টটি সি ভাষায় আরেকভাবে লেখা যায় : a += b; তাহলে প্রোগ্রাম 5.22-এ for লুপটি এভাবে লেখা যায়,

```
for (i = 0; i < 10; i += 1)
{
    sum += numbers[i];
}
```

আবার i += 1 (বা, i = i + 1)-কে i++ লেখা যায়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। যে কোনো একভাবে লিখলেই চলে।

উদাহরণ ১৭

একটি অ্যারেতে পাঁচটি সংখ্যা আছে। একটি প্রোগ্রাম লিখে সংখ্যাগুলোর ক্রম উল্টে দিতে হবে। অর্থাৎ অ্যারেতে যদি 1, 2, 3, 4, 5 থাকে, তাহলে প্রোগ্রামটি অ্যারেতে 5, 4, 3, 2, 1 নিয়ে আসবে।

প্রোগ্রামটি লেখার আগে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ প্রোগ্রাম করে দেখতে হবে। ধরা যাক, দুটি ভ্যারিয়েবল আছে, a ও b। এখন একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে যেন, a-এর মান b-তে চলে আসে আর b-এর মান a-তে চলে আসে। কাজটি করার উপায় কী? একটি সহজ উপায় হচ্ছে, অতিরিক্ত একটি ভ্যারিয়েবল c ব্যবহার করা। তারপরে c-এর ভেতরে a-এর মান অ্যাসাইন করা। তাহলে এখন c ও a-তে একই মান থাকবে। এখন b-এর মান a-তে অ্যাসাইন করা হবে। তাহলে c-তে থাকবে a-এর আসল মান, a ও b-তে থাকবে b-এর মান। তার মানে b-এর মান কিন্তু a-তে চলে এলো। এখন, a-এর আসল মান b-তে আনতে পারলেই কাজ শেষ। c-এর মধ্যে a-এর আসল মান আছে। তাই b = c: লিখলেই কাজ হয়ে যাবে। বিষয়টি অনেকটা নিচের ছবির মতো।

চিত্র 5.10: ছবিতে a পাত্রে হলুদ রঙের আইসক্রিম এবং b পাত্রে গোলাপি রঙের আইসক্রিম রয়েছে। আমরা চাই, a পাত্রের আইসক্রিম b পাত্রে নিয়ে আসতে এবং b পাত্রের আইসক্রিম a পাত্রে নিয়ে আসতে

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 15, b = 9;
    int c;
```

```
    c = a;
    a = b;
    b = c;
    printf("Value of a is %d, value of b is %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.23

নিজে করি ৯ : উপরের প্রোগ্রামটির অ্যালগরিদম লিখতে হবে এবং ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।

এখন আসল সমস্যাটির সমাধান করা হবে। অ্যারের প্রথম উপাদনের সঙ্গে শেষ উপাদানের মানের অদলবদল করা হবে, তারপর অ্যারের দ্বিতীয় উপাদানের সঙ্গে অ্যারের শেষ উপাদানের আগের উপাদানের মানের অদলবদল করা হবে।

প্রোগ্রামটি লেখা যায় এভাবে—

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int ara[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int n = 5,i;
    int temp;

    for (i = 0; i < n / 2; i += 1)
    {
        // exchange value of ara[i] and ara[n-1-i]
        temp = ara[i];
        ara[i] = ara[n-1-i];
        ara[n-1-i] = temp;
    }

    for (i = 0; i < n; i += 1)
    {
        printf("%d\n", ara[i]);
    }

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.24

২০২৪-২০২৫

উপরের প্রোগ্রামটি কম্পাইল ও রান করে দেখতে হবে।

নিজে করি ১০ : প্রথম for লুপে শর্ত ব্যবহার করা হয়েছে i < n / 2, এর বদলে i < n ব্যবহার করলে কী হতো সেটি চিন্তা করে বের করতে হবে।

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় ক্যারেক্টার টাইপের ভ্যারিয়েবলে একটি অক্ষর রাখা যায়। যদি একাধিক অক্ষর রাখতে হয়, তখন ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় স্ট্রিং (string)। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় স্ট্রিংয়ের জন্য পৃথক ডেটা টাইপ থাকলেও সি-তে আলাদা কোনো ডেটা টাইপ নেই।

উদাহরণ ১৮

নিচের প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখানো হবে সি-তে কীভাবে স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া যায় ও আউটপুট দেওয়া যায়,

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char name[80];

    scanf("%s", name);

    printf("%s\n", name);

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.25

যেই স্ট্রিং ইনপুট দেওয়া হবে, প্রোগ্রামটি সেই স্ট্রিং আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট করবে। একটি স্ট্রিংয়ের শেষ অক্ষরটি হবে নাল ক্যারেক্টার ('\0')। তাই কোনো স্ট্রিংয়ে যদি বলে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ 80টি ঘর থাকবে (name[80]), তাহলে এখানে আসলে সর্বোচ্চ 79টি অক্ষর রাখা যাবে। শেষ ঘরটি নাল ক্যারেক্টারের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

সাধারণ ইন্টিজার অ্যারেতে ইনপুট নিতে হলে যেমন একটি লুপ ব্যবহার করে একটি একটি করে সংখ্যা ইনপুট নিতে হয়, ক্যারেক্টার অ্যারে বা স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। scanf() ফাংশনের ভেতরে %s ব্যবহার করে সম্পূর্ণ স্ট্রিংটি একবারে ইনপুট নেওয়া যায়। তবে স্ট্রিংয়ের ভেতরে কোনো স্পেস (space) ক্যারেক্টার থাকতে পারবে না।

নিচের ছবিতে একটি স্ট্রিং "Bangla" কীভাবে অ্যারেতে থাকে, সেটি দেখানো হয়েছে—

Value	'B'	'a'	'n'	'g'	'l'	'a'	'\0'
Index	0	1	2	3	4	5	6

উদাহরণ ১৯

এখন একটি প্রোগ্রাম লেখা হবে, যেটি একটি স্ট্রিংয়ে কতগুলো অক্ষর বা ক্যারেক্টার আছে, সেটি বের করবে—

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char name[80];
    int i, length;
    scanf("%s", name);
    i = 0;
    while (name[i] != '\0')
    {
        i = i + 1;
    }

    length = i;
    printf("%s has %d characters.\n", name, length);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.26

এখানে i-তে 0 অ্যাসাইন করা হয়েছে। তারপর while লুপের ভেতরে শর্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, name[i]-এর মান নাল ক্যারেক্টার কি না। যদি না হয়, তাহলে লুপের ভেতরে i-এর মান এক বাড়ানো হয়েছে। যখন name[i]-এর মান নাল ক্যারেক্টারের সমান হবে, তখন প্রোগ্রামটি লুপ থেকে বের হয়ে যাবে। আর i-এর মানই হবে স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য, যেটি length নামক ভ্যারিয়েবলে অ্যাসাইন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, একটি স্ট্রিংয়ে মোট অক্ষরের সংখ্যাকে সেই স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বলা হয়।

উদাহরণ ২০

একটি অ্যারেতে অনেকগুলো সংখ্যা আছে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ইনপুট দেওয়া হবে এবং সংখ্যাটি ওই অ্যারেতে আছে কি না, সেটি বের করতে হবে। প্রথমে ফ্লোচার্ট আঁকতে হবে, তারপরে কোড লিখতে হবে।

চিত্র 5.11 : অ্যারেতে সংখ্যা খোঁজার ফ্লোচার্ট

কোড—

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int ara[] = {1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55};
    int key, i, n;

    n = 9;

    scanf("%d", &key);

    for (i = 0; i < n; i += 1)
    {
        if (ara[i] == key)
        {
            printf("%d is found in the array.\n", key);
            break;
```

```
        }
    }

    if (i == n)
    {
        printf("%d is not found in the array.\n", key);
    }

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.27

উপরের প্রোগ্রামে break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হলে লুপের ভেতর থেকে প্রোগ্রামটি বের হয়ে যাবে। key যদি অ্যারেতে পাওয়া যায়, তাহলে আর খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই লুপ থেকে বের হয়ে যেতে হবে। লুপ থেকে বের হওয়ার তাহলে দুটি উপায়, এক হচ্ছে break; এক্সিকিউট হওয়া, আর নইলে সব সংখ্যা পরীক্ষা করা হয়ে গেলে i-এর মান n-এর সমান হয়ে যাবে, তখন i < n শর্তটি মিথ্যা হয়ে যাবে আর প্রোগ্রামটি লুপ থেকে বের হয়ে যাবে। তাই for লুপের ব্লকের বাইরে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, i আর n-এর মান সমান কি না। যদি সমান হয়, তাহলে বুঝতে হবে break স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হয়নি, অর্থাৎ সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই পদ্ধতিতে বলা হয় লিনিয়ার সার্চ (linear search)।

নিজে করি ১১ : একটি অ্যারেতে ছয়টি সংখ্যা আছে, সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে 5, 8, 1, 9, 4, 10। এখান থেকে 4 সংখ্যাটি লিনিয়ার সার্চ পদ্ধতিতে খুঁজে বের করার ধাপগুলো দেখাই (কোড না লিখে)।

ফাংশন (Function)

প্রোগ্রামাররা বিভিন্ন সময় যখন প্রোগ্রাম লেখে, তখন দেখা যায়, একই কাজ একাধিকবার করতে হচ্ছে। এ কাজগুলো একসঙ্গে একটি ফাংশনের মধ্যে লেখা যায়। তখন কেবল সেই ফাংশনটি কল করলেই চলে, ভেতরের কাজগুলো আবার নতুন করে লিখতে হয় না। এমনকি, ফাংশনটি ভেতরে কীভাবে কাজ করছে, সেটি না জানলেও ফাংশনটি ব্যবহার করতে সমস্যা হয় না।

ইতোমধ্যে বইতে printf() ও scanf() ফাংশনের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এখন স্ক্রিনে প্রিন্ট করার জন্য অনেক কাজ করতে হয় বা কোড লিখতে হয়। সেগুলো printf() ফাংশনের ভেতরে বলা আছে। কিন্তু সি প্রোগ্রামাররা সরাসরি printf() ফাংশন ব্যবহার করে, printf()-এর ভেতরে যে কোড লেখা আছে, সেটি যদি বারবার লিখতে হতো, তাহলে প্রোগ্রামারদের কষ্টও বেড়ে যেত, কোডের আকারও বেড়ে যেত। তেমনি scanf() ফাংশনের বেলাতেও ব্যাপারটি সত্য। ফাংশনটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সি প্রোগ্রামারদের এটুকু জানাই যথেষ্ট। এই ফাংশন দুটো ব্যবহার করার জন্য stdio.h নামক হেডার ফাইলটি ইনক্লুড করতে হয়। একটি হেডার ফাইল ইনক্লুড করলে ওই হেডার ফাইলের ভেতরে যেসব ফাংশন তৈরি করে দেওয়া

থাকে, সেগুলো ব্যবহার করা যায়। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় এরকম অনেক হেডার ফাইল তৈরি করে দেওয়া আছে। এগুলোকে লাইব্রেরিও বলে। এছাড়া প্রয়োজন হলে প্রোগ্রামার নতুন হেডার ফাইল তৈরি করে নেয়।

একটি ফাংশন ব্যবহার করতে হলে তিনটি জিনিস জানতে হয়। ফাংশনটি কী কাজ করে, ফাংশনের ভেতরে কী কী ডেটা পাঠাতে হবে, আর ফাংশনটি কি ডেটা রিটার্ন করে। যেমন— math.h হেডার ফাইলে একটি ফাংশন আছে যার কাজ হচ্ছে বর্গমূল বের করা। ফাংশনটির প্রোটোটাইপ হচ্ছে - double sqrt(double arg); এখানে প্রথম double হচ্ছে ফাংশনটির রিটার্ন টাইপ, অর্থাৎ ফাংশনটি কি টাইপের ডেটা রিটার্ন করে। ফাংশন যদি কোনো ডেটা রিটার্ন না করে, তখন রিটার্ন টাইপ হয় void। তারপরে sqrt হচ্ছে— ফাংশনের নাম। এরপর প্রথম বন্ধনীর ভেতরে double arg লেখা, যার অর্থ হচ্ছে ফাংশনটি ইনপুট হিসেবে একটি double টাইপের ডেটা গ্রহণ করে— একে বলা হয় ফাংশনের প্যারামিটার (parameter)। আর ফাংশনটি যখন ব্যবহার করা হয়, তখন প্যারামিটারের জায়গায় যে ডেটা পাঠানো হয়, তাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট (argument)। নিচের উদাহরণে ফাংশনটির ব্যবহার দেখানো হলো।

উদাহরণ ২১

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    double num, root;

    scanf("%lf", &num);

    root = sqrt(num);

    printf("Square root of %lf is %lf\n", num, root);

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম **5.28**

main() ফাংশনের শেষে কেন return 0; স্টেটমেন্টটি লেখা হয়?

সি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা সব প্রোগ্রাম রান করলে কোডের ভেতরে main() ফাংশন থেকে প্রোগ্রামটি চলা শুরু হয়। main() ফাংশন যদি এভাবে ডিক্লেয়ার করা হয়– int main() তাহলে কম্পাইলার ধরে নেয় যে ফাংশনটি যখন এক্সিকিউশন শেষ হবে তখন সে একটি ইন্টিজার রিটার্ন করবে। তাই ফাংশনের শেষে কোনো একটি ইন্টিজার রিটার্ন করতে হবে। প্রচলিত নিয়মে 0 রিটার্ন করা হয়, প্রোগ্রামটি ঠিকভাবে কোনো সমস্যা ছাড়াই চলেছে সেটা বোঝানোর জন্য। তবে 0-ই যে রিটার্ন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চাইলে যেকোনো ইন্টিজার-ই রিটার্ন করা যায়।

math.h হেডার ফাইলে আরেকটি ফাংশন হচ্ছে pow (double x, double y);। এই ফাংশনটি প্যারামিটার হিসেবে দুটি double টাইপের সংখ্যা গ্রহণ করে এবং x^y-এর মান হিসেব করে রিটার্ন করে। যেমন— x-এর মান 3 আর y-এর মান 2 পাঠালে ফাংশনটি 9 রিটার্ন করবে।

উদাহরণ ২২

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    double p, x, y;

    scanf("%lf %lf", &x, &y);

    p = pow(x, y);

    printf("%lf to the power %lf is: %lf\n", x, y, p);

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.29

math.h হেডার ফাইলে এরকম অনেক গাণিতিক ফাংশন তৈরি করে দেওয়া আছে।

একটি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ স্ট্রিংয়ে মোট কয়টি ক্যারেক্টার আছে, সেটি বের করার জন্য ইতিমধ্যে বইতে একটি প্রোগ্রাম লিখে দেখানো হয়েছে। কাজটি চাইলে একটি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করে করা যায়, যার নাম হচ্ছে strlen। ফাংশনটি ইনপুট হিসেবে একটি স্ট্রিং নিবে এবং তার দৈর্ঘ্য রিটার্ন করবে। এই ফাংশনটি রয়েছে string.h হেডার ফাইলে।

উদাহরণ ২৩

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char name[80];
    int length;

    scanf("%s", name);

    length = strlen(name);
```

```
    printf("%s has %d characters.\n", name, length);

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.30

দুটি স্ট্রিং সমান নাকি বড়-ছোট, সেটি বের করার জন্য strcmp নামক একটি লাইব্রেরি ফাংশন আছে। যার কাজ হচ্ছে দুটি স্ট্রিং তুলনা করে সমান হলে 0 রিটার্ন করা, প্রথমটি বড় হলে 1 রিটার্ন করা আর প্রথমটি ছোট হলে −1 রিটার্ন করা।

উল্লেখ্য, এখানে বড়-ছোট মানে দৈর্ঘ্যে বড়-ছোট নয়, বরং লেক্সিকোগ্রাফিক্যালি (lexicographically) বড়-ছোট কি না তা বোঝানো হয়েছে। এর মানে হচ্ছে ডিকশনারি বা আভিধানিক ক্রমে সাজালে যে স্ট্রিংটি আগে আসবে তাকে ছোট আর যেটি পরে আসবে তাকে বড় বলে বিবেচনা করা হবে।

উদাহরণ ২৪

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char s1[80], s2[80];
    int value;

    scanf("%s %s", s1, s2);

    value = strcmp(s1, s2);

    if (value == 0)
    {
        printf("%s and %s are equal.\n", s1, s2);
    }
    else if (value > 0)
    {
        printf("%s is greater than %s.\n", s1, s2);
    }
    else
    {
        printf("%s is smaller than %s.\n", s1, s2);
    }

    return 0;
}
```

প্রোগ্রাম 5.31

নিজে করি ১৩ : একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে যেটি একটি স্ট্রিং ইনপুট দিলে সেই স্ট্রিংটি প্রিন্ট করবে, তবে quit ইনপুট দিলে প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে quit ইনপুট দেওয়ার আগ পর্যন্ত যা ইনপুট দেওয়া হচ্ছে, তা-ই প্রিন্ট হচ্ছে।

```
hi
hi
hello
hello
good
good
bad
bad
quit
```

এতক্ষণ বিভিন্ন লাইব্রেরি ফাংশনের ব্যবহার দেখানো হলো। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় এরকম শত শত লাইব্রেরি ফাংশন আছে। কম্পাইলারের সঙ্গে দেওয়া ডকুমেন্টেশন কিংবা ইন্টারনেট ঘেঁটে সেই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো সম্পর্কে জানা যাবে।

এখন দেখানো হবে কীভাবে নতুন ফাংশন তৈরি করতে হয়।

উদাহরণ ২৫

```
#include <stdio.h>

float celsius_to_fahrenheit(float celsius);

int main()
{
    float celsius, fahrenheit;

    scanf("%f",&celsius);

    fahrenheit = celsius_to_fahrenheit(celsius);

    printf("Fahrenheit = %f\n", fahrenheit);

    return 0;
}

float celsius_to_fahrenheit(float celsius)
{
    return (celsius * 9 / 5) + 32;
}
```

প্রোগ্রাম 5.32

উপরের প্রোগ্রামে celsius_to_fahrenheit() নামে একটি ফাংশন তৈরি করা হয়েছে। ফাংশনটি একটি সংখ্যা প্যারামিটার হিসেবে নেয় যেটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এককে একটি তাপমাত্রা নির্দেশ করে এবং সংখ্যাটি ডিগ্রি ফারেনহাইট এককে রূপান্তর করে রিটার্ন করে। main() ফাংশন লেখার আগে ফাংশনটির প্রোটোটাইপ লেখা হয়েছে—

```
float celsius_to_fahrenheit(float celsius);
```

তারপর main() ফাংশনের পরে ফাংশনটি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। main() ফাংশন থেকে যখন celsius_to_fahrenheit() ফাংশনটি কল (call) করা হচ্ছে, তখন প্রোগ্রাম এই ফাংশনের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং ফাংশন থেকে যখন রিটার্ন করা হচ্ছে, তখন আবার main() ফাংশনের ভেতরে ফেরত আসছে।

নিজে করি ১৩ : ফাংশন ব্যবহার করে যে কোনো সংখ্যা ইনপুট প্রদান করলে ঐ সংখ্যার নামতা প্রদর্শনের জন্যে প্রোগ্রাম লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সি-ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ফাংশন খ. পয়েন্টার গ. স্ট্রাকচার ঘ. অ্যারে

২. অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরির পরবর্তী ধাপটা কোনটি?
ক. প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা খ. কোড লিখা
গ. সমস্যা সমাধান বর্ণনা ঘ. প্রোগ্রাম রিলিজ করা

৩. সি-ভাষার চলক হলো–
i. student_name
ii. student name
iii. studentname

নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

```
# include<stdio.h>
main(){
        int a = 3, b;
        b = 2*a;
}
```

৪. উদ্দীপকের প্রোগ্রাম রান করলে b এর মান কত হবে?
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6

৫. প্রোগ্রাম রান করলে আউটপুট মান 3 হবে যখন-
i. b = a^{++};
ii. b = a^{-};
iii. b+ = a;

নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. ফরমেট স্পেসিফায়ার হলো-
i. %d
ii/ %if
iii. %c

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. 'কম্পাইলার' ও 'ইন্টারপ্রিটার' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে–

i. প্রোগ্রাম অনুবাদ করার ক্ষেত্রে
ii. মেমোরি স্পেস হ্রাস-বৃদ্ধি
iii. ভুল প্রদর্শনের জন্য

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ প্রশ্নের উত্তর দাও :

```
#include<stdio.h>
main( ){
   int a, s = o;
   for (a = 1; a < = 5; (a= a+1)
   s = s + a;
   printf ("%d", s);
}
```

৮. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক. 0 খ. 1

গ. 5 ঘ. 15

৯. "a" এর মানের কোন কোন পরিবর্তনে আউটপুট 6 হবে?

ক. a = 1, a = a + 2 খ. a = 2, a = a + 1
গ. a = 2, a = a + 2 ঘ. a = 0, a = a + 1

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ডান পাশের প্রোগ্রামটির জন্য–

ক. সংরক্ষিত শব্দ কী?
খ. K + + ও + + K এর মধ্যকার--- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির জন্য একটি প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর।
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি while লুপ ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উদ্দীপক

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
 int a, s;
 s = 0;
 for (a = 1; a < = 30; a + = 2) {
  s = s + a;
 }
 printf("sum = % d, s);
 getch();
}
```

২০১৪-২০১৫

উদ্দীপক

```
#include <stdio.h>
int main() {
 int i, d;
 int n = 123456789;
 char digits[10];
 i = 0;
 while (n) {
   d = n % 10;
   n = n / 10;
   digits[i] = d + '0';
   i += 1;
 }
 printf("%s\n", digits);
 return 0;
}
```

২. উপরের প্রোগ্রামটি রান করলে আউটপুট হবে 987654321 অর্থাৎ digits ক্যারেক্টার অ্যারেতে n-এর অংকগুলো বিপরীত ক্রমে এসেছে।

ক. ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারেকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় কী বলা হয়?

খ. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলে সর্বোচ্চ কত অঙ্কের সংখ্যা রাখা যায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির ফ্লোচার্ট তৈরি কর।

ঘ. প্রোগ্রামটি কীভাবে পরিবর্তন করলে n-এর অংকগুলো ঠিক ক্রমে আসবে যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

উদ্দীপক

৩.

ক. কম্পাইলার কী?

খ. অ্যালগরিদম কোডিংয়ের পূর্বশর্ত- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সমস্যাটির 'সি' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম তৈরি কর।

ঘ. উদ্দীপকটি প্রোগ্রাম তৈরির একটি ধাপ – বিশ্লেষণ কর।

৪. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের A, B ও C দলে বিভক্ত করা হয়। রোল নম্বর 1 থেকে 30 পর্যন্ত A দলে, 31 থেকে 60 পর্যন্ত B দলে, এবং 61 থেকে 100 পর্যন্ত C দলে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক. প্রোগ্রাম কী?

খ. 'সি' একটি কেস-সেনসিটিভ ভাষা — ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দল গঠনের জন্য অ্যালগরিদম লিখ।

ঘ. সি-ভাষায় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে দল গঠনের জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখে এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৫. মাইশা দেখল, তার বাবার প্রচণ্ড জ্বর। সে থার্মোমিটারে মেপে দেখল 103^0F, কিন্তু রুমের তাপমাত্রা 30^0C।

ক. ডেটা টাইপ কী?

খ. কম্পাইলারের তুলনায় ইন্টারপ্রিটার কোন ক্ষেত্রে ভালো— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত থার্মোমিটারের তাপমাত্রাকে সেলসিয়াসে রূপান্তরের জন্য সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেলসিয়াসে রূপান্তরের জন্য এলগরিদম নয় ফ্লোচার্টই উত্তম– ব্যাখ্যা কর।

৬. আদনান দুটি সংখ্যা L, S (L<S) এর গ.সা.গু নির্ণয়ের জন্য 'সি' ভাষা প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছে। কিন্তু সে প্রোগ্রামটির লজিক কিছুই বুঝতে পারছে না। অবশেষে সে তার আইসিটি শিক্ষকের শ্মরণাপন্ন হলেন। তার শিক্ষক তাকে সমস্যাটি কয়েকটি ধাপে ভেঙে প্রত্যেকটি ধাপের চিত্রসহকারে উপস্থাপন করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। এখন আদনান জামির আর কোনো সমস্যা রইল না।

ক. প্রোগ্রামিং কী?

খ. প্রোগ্রামারগণ বড় কোনো প্রোগ্রামকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে কী সুবিধা পান? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিক্ষক হিসেবে তুমি সমস্যাটির সমাধান দাও।

ঘ. L = ৪ এবং S = 3 হলে উক্ত ধাপগুলো কীভাবে কাজ করবে পর্যায়ক্রমে দেখাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
Database Management System

সুশৃঙ্খলভাবে ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ বর্তমান বিশ্বের একটি বড় চ্যালেঞ্জ

বর্তমান বিশ্বে আমাদের চারপাশের প্রায় সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হতে শুরু করেছে। আমরা কেনাকাটা কিংবা বাজার করি অনলাইনে, ব্যাংকিং করি অনলাইনে, ইলেক্ট্রিসিটির বিল দেই অনলাইনে, ট্রেনের টিকিট কিনি অনলাইনে। এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য কোথাও না কোথাও অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়। একসময় যে কাজগুলো করতে অসংখ্য লেজার বই কিংবা কাগজের উপর নির্ভর করতে হতো এখন সেগুলো করা হয় ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দিয়ে। সেগুলো আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুললেও সেখানে এখনো চ্যালেঞ্জের অভাব নেই। সেগুলো অনেক সময় প্রয়োজনমতো বড় করা যায় না, দ্রুত প্রক্রিয়া করা যায় না কিংবা সাইবার দুর্বৃত্তরা মাঝে মাঝেই ডেটা হাতিয়ে নেয়। কাজেই কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ক্রমাগতভাবে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট-এর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বর্ণনা করতে পারবে;
- ডেটাবেজ সিকিউরিটির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ডেটাবেজ সিকিউরিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ডেটা এনক্রিপশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ডেটা এনক্রিপশনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ব্যাবহারিক

- ডেটাবেজ তৈরি করতে পারবে।

২০২৪-২০২৫

৬.১ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট (Database Management)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, এমনকি আমাদের নিজেদের ঘর-গেরস্তালির কাজেও আমাদেরকে নানান রকম তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। স্কুল-কলেজের কথাই চিন্তা করা যাক। শিক্ষার্থী ভর্তি, ক্লাস রুটিন তৈরি, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পরীক্ষার রুটিন তৈরি, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও সংরক্ষণ, শিক্ষার্থীদের বেতনের হিসেব রাখা ইত্যাদি নানান কাজেই অনেক তথ্য তৈরি ও সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ খাতা-কলমের মাধ্যমেই এসব হিসাব করে আসছে। কিন্তু কম্পিউটারের আবির্ভাব এসব কাজকে মানুষের জন্য সহজ করে দিয়েছে। কম্পিউটারের তথ্য ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আর এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এমন সফটওয়্যার তৈরি করেছে যা বিপুল পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে, সংরক্ষণ করতে পারে এবং সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে।

ধরা যাক, অসুস্থতা এবং অন্য কোনো কারণে একজন শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছে। তার অভিভাবক জানতে চান শিক্ষার্থীটি গত তিন মাসে ঠিক কতদিন স্কুলে ছিল। এই কাজটি করার জন্য তাঁকে স্কুলে যেতে হবে, তারপর তাঁর সন্তানের যেসব শিক্ষক আছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। শিক্ষকেরা তখন গত তিন মাসের হাজিরা খাতা বের করবেন। সেই খাতা থেকে খুঁজে দেখবেন ওই শিক্ষার্থী কতদিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল, পুরোটাই খুবই সময়সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু ওই স্কুলে যদি সব তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ একটি কম্পিউটারে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হতো, তাহলে এই তথ্য এক সেকেন্ডের মধ্যেই বের করা সম্ভব হতো। তথ্য সংরক্ষণ করার কাজটি করে ডেটাবেজ আর সেই ডেটাবেজকে ঠিকমতো পরিচালনা করার জন্য যে সফটওয়্যার, তাকেই বলা হয় ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

৬.১.১ কম্পিউটারের মেমোরি ও ফাইল

কম্পিউটারের প্রোগ্রাম যখন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করে, সেই ডেটা অস্থায়ী মেমোরিতে লোড করে তারপর কাজ করে। এই অস্থায়ী মেমোরিকে বলা হয় র‍্যাম (RAM)। কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেলে র‍্যাম থেকে ডেটা মুছে যায়। আবার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিলেও প্রোগ্রাম র‍্যাম-এর ডেটার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই যেসব তথ্য সংরক্ষণের দরকার হয়, সেগুলোকে স্থায়ী মেমোরি, যেমন–হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়। হার্ড ডিস্কের যেসব ডেটা আমরা ব্যবহার করি, সেগুলোকে ফাইল (file) নামক একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা অ্যাকসেস করি। যেমন– একটি টেক্সট ফাইলে আমরা বিভিন্ন তথ্য লিখে সেভ করে রাখতে পারি। তারপরে চাইলে কম্পিউটার বন্ধ করে দিতে পারি। আবার যখন কম্পিউটার চালু করব, তখন চাইলে সেই ফাইলটি খুলে আগে লেখা তথ্য দেখতে পারি।

কম্পিউটারকে যখন মানুষ বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা শুরু করল, তখন বিভিন্ন প্রোগ্রাম লেখা হতো, যেগুলো তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পরে ফাইলে সংরক্ষণ করত। সেই ফাইলের তথ্য পরিবর্তন বা তথ্য নিয়ে অন্য কোনো কাজ করতে হলে আবার নতুন প্রোগ্রাম লিখে কাজগুলো করতে হতো। যেমন ধরা যাক, একটি অ্যাড্রেস বুক (address book), যেখানে বিভিন্নজনের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই তথ্য খুঁজে বের করা যাবে। তাহলে নতুন তথ্য যোগ করার

(একে ডেটা এন্ট্রি– data entry বলা হয়) জন্য প্রোগ্রাম লিখতে হবে। তথ্য খুঁজে বের করার জন্যও প্রোগ্রাম লিখতে হবে। এখন কেউ যদি বলে ফোন নম্বরের পর ইমেইল ঠিকানাও সংরক্ষণ করতে হবে, তখন আবার ডেটা এন্ট্রি করার প্রোগ্রামটি এবং বাকি সব প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে হবে। তারপর ধরা যাক, কেউ বলল, নাম দিয়ে কারো তথ্য খুঁজে বের করার পাশাপাশি ইমেইল ঠিকানা দিয়েও খোঁজার ব্যবস্থা রাখতে হবে, তখন আবার নতুন ফাংশন লিখতে হবে। এভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি বেশ জটিল ও প্রোগ্রামারদের জন্য পরিশ্রমসাধ্য হয়ে যায়। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সেই কাজটি খুব সহজ করে দেয়।

৬.১.২ ডেটাবেজ

আক্ষরিক অর্থে, ডেটাবেজ হচ্ছে ডেটার সমাহার, অর্থাৎ যেখানে অনেক ডেটা থাকে। তবে সফটওয়্যারের জগতে ডেটাবেজ হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যেখানে প্রচুর পরিমাণ তথ্য একসঙ্গে সংরক্ষণ করা যায়, দরকারি তথ্য বের করা যায়, নতুন তথ্য যোগ করা যায় এবং প্রয়োজনমতো কোনো তথ্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও মুছে ফেলা যায়। আর সেই ডেটাবেজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কিছু প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার মিলেই গঠিত হয় ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

ডেটাবেজকে মোটাদাগে দুভাগে ভাগ করা যায়: রিলেশনাল ডেটাবেজ (Relational Database) ও নোএসকিউএল (NoSQL)। রিলেশনাল ডেটাবেজের ধারণা প্রায় ৫০ বছর আগের, তবে এখনো এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ ডেটাবেজ। আর নোএসকিউএল ডেটাবেজ অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ওয়েবভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে নোএসকিউএল সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

৬.২ রিলেশনাল ডেটাবেজ (Relational Database)

রিলেশনাল ডেটাবেজ-এ ডেটাকে এক বা একাধিক টেবিলে সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা হয়। কিছু কিছু টেবিলের মধ্যে অনেক সময় সম্পর্ক (relation) থাকতে পারে। যেমন– ধরা যাক, একটি স্কুলের ডেটাবেজে ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নানান ধরনের তথ্য থাকতে পারে। আবার পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাসের রুটিন, এসব তথ্যও ডেটাবেজে থাকতে পারে। একই ধরনের সব তথ্য একটি টেবিলে থাকবে। যেমন শিক্ষকদের তথ্যের জন্য teacher টেবিল, শিক্ষার্থীদের তথ্যের জন্য student টেবিল, পরীক্ষার ফলাফল রাখার জন্য result টেবিল তৈরি করতে হবে। student টেবিল ও result টেবিলের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকবে, যেন দুটো টেবিল থেকে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ও পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য একসঙ্গে পাওয়া যায়। আর এসব টেবিল মিলে তৈরি হবে school ডেটাবেজ।

একটি ডেটাবেজ টেবিলের দুটি অংশ থাকে, টেবিল হেডার (table header) ও টেবিল বডি (table body)। টেবিল হেডারে থাকে বিভিন্ন কলামের নাম এবং সেই কলামে কী ধরনের ডেটা রাখা হবে তার তথ্য। আর টেবিলের বডিতে থাকে মূল তথ্য। প্রতিটি সারি (row)-তে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য থাকে। একটি টেবিলে কী কী ডেটা রাখা হবে এবং সেগুলো কী ধরনের হবে, সেটি আগে ঠিক করতে হয়। যেমন–

২০২৩-২৪

শিক্ষার্থীর টেবিলে থাকতে পারে শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, ক্লাস, বিভাগ/শাখা, অভিভাবকের নাম, অভিভাবকের ফোন নম্বর, বাসার ঠিকানা ইত্যাদি।

ডেটার ধরন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় যেমন নির্দিষ্ট কিছু ডেটা টাইপ রয়েছে, রিলেশনাল ডেটাবেজেও তেমনি কিছু ডেটা টাইপ রয়েছে। বিভিন্ন ডেটাবেজ নির্মাতারা নিজেদের মতো ডেটা টাইপ নির্দিষ্ট করে দেন, তবে বেশ কিছু ডেটা টাইপ সব ডেটাবেজেই পাওয়া যাবে। যেমন– টেক্সট (text), পূর্ণসংখ্যা (integer), দশমিকযুক্ত সংখ্যা (decimal number), তারিখ (date) ইত্যাদি।

এখন আমরা একটি টেবিলের উদাহরণ দেখি :

টেবিলের নাম : শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীর নাম (টেক্সট)	**রোল নম্বর (পূর্ণসংখ্যা)**	**শ্রেণি (পূর্ণসংখ্যা)**	**শাখা (টেক্সট)**	**অভিভাবকের নাম (টেক্সট)**	**ফোন নম্বর (টেক্সট)**
মিজানুর রহমান	১	৪	দিবা	আব্দুর রহমান	০২০৩০২
মোশাররফ হোসেন	২	৪	দিবা	সেলিনা খাতুন	০২০৩০৪
সৌরভ দাস	১	৫	প্রভাতি	অজয় দাস	০৩০৪০২
শাকিল মিয়া	৩	৫	প্রভাতি	মনসুর মিয়া	

এই শিক্ষার্থী টেবিলের প্রথম সারিটি হচ্ছে টেবিলের হেডার। এই সারিতে যেসব ঘর আছে, প্রতিটি হচ্ছে একটি কলাম (column)-এর নাম এবং তার ডেটা টাইপ (মানে ওই কলামে কী ধরনের ডেটা থাকবে)। যেমন– শিক্ষার্থীর নাম হচ্ছে একটি কলামের নাম এবং সেখানে টেক্সট টাইপের ডেটা থাকবে। এর নিচে যত ঘর থাকবে, সব ঘরে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নাম থাকবে, অন্য কোনো তথ্য থাকতে পারবে না। আর দ্বিতীয় সারি থেকে প্রতিটি সারিতে একজন করে শিক্ষার্থীর তথ্য দেওয়া আছে। যেমন– দ্বিতীয় সারির প্রথম ঘরে আছে মিজানুর রহমান, যা একজন শিক্ষার্থীর নাম, তারপরের ঘরে আছে তার রোল নম্বর, তারপরের ঘরে আছে তার শ্রেণি, অর্থাৎ সে কোন শ্রেণিতে পড়ছে, ইত্যাদি। একটি সারিতে কেবল একজন শিক্ষার্থীর তথ্য থাকবে, কখনো একাধিক শিক্ষার্থীর তথ্য থাকবে না।

প্রতিটি সারিকে ইংরেজিতে বলে রো (row)। এগুলোকে রেকর্ড (record)-ও বলা হয়ে থাকে। আর টেবিলের প্রতিটি ঘর হচ্ছে একেকটি ফিল্ড (field)।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত রিলেশনাল ডেটাবেজ হচ্ছে ওরাকল (Oracle), মাইএসকিউএল (MySQL), মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার (Microsoft SQL Server), পোস্টগ্রেস (PostgreSQL), মাইক্রোসফট অ্যাকসেস (Microsoft Access) ও এসকিউলাইট (SQLite)। এগুলোর মধ্যে মাইসিক্যুয়েল, পোস্টগ্রেস ও এসকিউলাইট হচ্ছে ফ্রি এবং ওপেন-সোর্স (free & open source) ডেটাবেজ। অর্থাৎ এগুলো ব্যবহার করার জন্য টাকা দিতে হয় না, এবং এগুলোর সোর্সকোডও উন্মুক্ত।

নোট : উচ্চারণের সুবিধার জন্য এসকিউএল শব্দটি অনেকে সিক্যুয়েল বলে উচ্চারণ করে। SQL শব্দটির পূর্ণরূপ, স্ট্রাকচারড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ (Structured Query Language)

৬.২.১ নাল ভ্যালু (Null Value)

অনেক সময় ডেটাবেজ টেবিলে কিছু কিছু রেকর্ডে কোনো কলামের মান যদি অজানা থাকে, তখন সেখানে Null (বা NULL) ব্যবহার করা হয়। যেমন– student টেবিলে ফোন নম্বর বলে একটি কলাম আছে। এখন সবার যে ফোন নম্বর থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই, যেমন– মানিক মিয়া নামক শিক্ষার্থীর ফোন নম্বর নেই, তাই তার রেকর্ডে ফোন নম্বর ফিল্ডটি ফাঁকা রয়েছে। ডেটাবেজ ধরে নেবে এর মান নাল (NULL)। আবার, ধরা যাক ওই টেবিলে মাসিক পারিবারিক আয় নামে আরেকটি কলাম আছে। মাসিক পারিবারিক আয় একটি সংখ্যা। এখন, কেউ যদি তার মাসিক পারিবারিক আয় প্রকাশ করতে না চায় তো, সেখানে কিন্তু 0 বসবে না, বরং সেটি হবে ফাঁকা বা NULL। কারণ এক্ষেত্রে 0 মানে তার পরিবারের কারো কোনো আয় নেই। আবার অনেক সময় একটি টেবিলে বিভিন্ন মানুষের পেশা যদি রাখার প্রয়োজন হয়, সেখানেও সবার যে পেশা থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। যেমন– ওই টেবিলে যদি তিন বছর বয়সি একটি শিশুর তথ্য থাকে, তাহলে তার পেশা হবে NULL, কারণ তাকে শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী কিংবা বেকার–কোনো পেশাতেই ফেলা যাবে না। এখন পেশা যদি টেক্সট টাইপের হয়, তখন কিন্তু ফাঁকা স্ট্রিং (অর্থাৎ ") বসানো যাবে না, বরং ঘরটি ফাঁকা রাখতে হবে। ফাঁকা ঘরটিকে ডেটাবেজ NULL বলে বিবেচনা করবে।

৬.২.২ প্রাইমারি কি (Primary Key)

প্রাইমারি কি হচ্ছে একটি টেবিলের নির্দিষ্ট কলাম, যেটি দিয়ে প্রতিটি রেকর্ডকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার্থী টেবিলে কোন কলাম দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়? নাম দিয়ে করা যাবে না, কারণ একই শ্রেণিতে কিংবা আলাদা শ্রেণিতে একই নামে একাধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'মিজানুর রহমান' নামটি চতুর্থ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণিতেও একজন মিজানুর রহমান থাকতে পারে। আবার আমরা যদি বলি, চতুর্থ শ্রেণির মিজানুর রহমান, তখন চতুর্থ শ্রেণিতে যদি একাধিক মিজানুর রহমান থাকে, তাহলে তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। তাই নাম প্রাইমারি কি (key) হতে পারবে না। রোল নম্বরও প্রাইমারি কি হতে পারে না, কারণ প্রতিটি শ্রেণিতেই রোল 1, 2, 3 ইত্যাদি রয়েছে। ফোন নম্বরও প্রাইমারি কি হতে পারবে না, কারণ সবার ফোন নম্বর নাও থাকতে পারে। তাহলে উপরে যে শিক্ষার্থী টেবিল তৈরি করা হয়েছে, সেখানে কোনো প্রাইমারি কি নেই। তবে, শ্রেণি, শাখা ও রোল নম্বর– এই তিনটি কলাম মিলে একটি প্রাইমারি কি হতে পারে, কারণ এই তিনটি তথ্য একসঙ্গে করলে আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদা করতে পারি। যখন একাধিক কলাম মিলে প্রাইমারি কি তৈরি হয়, তখন তাকে বলা হয় কম্পোজিট কি (composite key)।

ডেটাবেজে টেবিল তৈরির সময় কোন কলামটি প্রাইমারি কি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারলে সেটি আলাদাভাবে উল্লেখ করে দিতে হয়। আবার কোনো কোনো সময় প্রাইমারি কি চিহ্নিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। তখন শুরুতে একটি কলাম যোগ করা হয়। এটি একটি সংখ্যার কলাম হবে এবং প্রতিটি রেকর্ড বা রো-এর জন্য আলাদা হবে। সাধারণত, টেবিলে id নামের একটি কলাম যোগ করা হয়, যেটি ইন্টিজার টাইপের ডেটা ধারণ করে এবং এর সঙ্গে অটো ইনক্রিমেন্ট (Auto Increment) বৈশিষ্ট্য জুড়ে দেওয়া হয়, যেন প্রতিটি রো ইনসার্ট (insert) করার সময় এর মান এক-এক করে বাড়ে (এই কলামের জন্য তাই কোনো মান নিজে থেকে দিতে হয় না, ডেটাবেজ সিস্টেম নিজেই এটি নিয়ন্ত্রণ করে)।

রিলেশনাল ডেটাবেজে সব টেবিলেই প্রাইমারি কি থাকতে হয়। যদিও প্রাইমারি কি ছাড়াও টেবিল তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে অনেক সময় ডেটাবেজ নিজেই একটি প্রাইমারি কি তৈরি করে নেয়।

শিক্ষার্থী টেবিলে শ্রেণি, শাখা ও রোল— এই তিনটি কলাম মিলে প্রাইমারি কি তৈরি করা যায়। তবে এখানে একটি সমস্যা হতে পারে। এভাবে টেবিল তৈরি করলে আমরা কেবল বর্তমান শিক্ষার্থীদের তথ্যই রাখতে পারব। অতীতের শিক্ষার্থীদের তথ্য রাখা সম্ভব হবে না, যেমন— পাঁচ বছর আগের কোনো শিক্ষার্থী, যে পড়ত সপ্তম শ্রেণির দিবা শাখায় এবং যার রোল নম্বর ছিল দুই, তাকে আলাদাভাবে বের করা যাবে না। তাই আমরা নতুন একটি কলামে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক একটি আইডি দিতে পারি। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে রোল নম্বর এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন রোল নম্বর দেখলেই বোঝা যায় যে, সে কোন বছরের কোন ক্লাসের কোন শাখার কত নম্বর শিক্ষার্থী। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে একে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও বলা হয়, যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য সবসময় একই থাকে। ওপরের ক্লাসে উঠলে রোল নম্বর পরিবর্তন হবে, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন হবে না।

বাংলাদেশে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই একটি করে জাতীয় পরিচয়পত্র আছে (যাকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড– National ID Card-ও বলা হয়)। সেখানে কিন্তু প্রতিটি মানুষকে আলাদা নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, এবং কখনোই দুজন মানুষের নম্বর একরকম হতে পারবে না।

চিত্র 6.1 : বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র

তাই বিভিন্ন টেবিলে যদি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তথ্য রাখা হয়, সেসব জায়গায় জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর প্রাইমারি কি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.২.৩ ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation)

ডেটাবেজ রিলেশন বলতে আসলে ডেটাবেজের টেবিলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়। একটি ডেটাবেজে এক বা একাধিক টেবিল থাকতে পারে। যখন একাধিক টেবিল থাকে, তখন প্রায়শই টেবিলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বা রিলেশন (relation) থাকে। এই রিলেশন আবার তিন ধরনের হতে পারে :

১. ওয়ান টু ওয়ান (one to one)
২. ওয়ান টু মেনি (one to many)
৩. মেনি টু মেনি (many to many)

১. ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন

দুটি টেবিলের মধ্যে যদি ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন থাকে, তবে একটি টেবিলের একটি রো-এর সঙ্গে অন্য টেবিলের একটিমাত্র রো-এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। ধরা যাক, শিক্ষার্থীদের সাধারণ তথ্য রাখার জন্য একটি টেবিল student_info তৈরি হলো। আবার শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের ঠিকানা রাখার জন্য তৈরি করা হলো student_contact টেবিল। টেবিলগুলো নিম্নরূপ :

টেবিলের নাম : student_info

Roll (integer, primary key)	Name (text)	Class (integer)
1	Mizanur Rahman	6
2	Mosharraf Hossain	7
3	Subir Kumar	6

টেবিলের নাম : student_contact

ID (integer, primary key)	Roll (integer)	Phone (text)	Email (text)	Address (text)
1	1	012345678	mizan@email.com	Adabor, Shyamoli, Dhaka
2	2	012345543	mosharraf@email.com	Sector 3, Uttara, Dhaka
3	3	014343678	subir@email.com	College Road, Mymensingh

উপরের টেবিল দুটির মধ্যে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন বিদ্যমান। যেমন— student_info টেবিলের প্রতিটি রো-তে একজন শিক্ষার্থীর তথ্য রয়েছে। এই টেবিলের প্রাইমারি কি হচ্ছে Roll (যদিও প্রাইমারি কি হিসেবে Roll সবসময় ঠিক নয়, তবে এখানে আলোচনার সুবিধার্থে এটি প্রাইমারি কি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে)। এখন, এই টেবিলে প্রতিটি শিক্ষার্থী (রো)-এর জন্য student_contact টেবিলে একটি রো থাকবে, যেখানে ওই শিক্ষার্থীর যোগাযোগের ঠিকানা (ফোন, ইমেইল, বাসার ঠিকানা) থাকবে। student_info টেবিলে Roll হচ্ছে প্রাইমারি কি, কিন্তু student_contact টেবিলে Roll হচ্ছে ফরেন কি (foreign key)। একটি টেবিলের প্রাইমারি কি অন্য টেবিলে যখন ব্যবহার করা হয়, তখন সেই টেবিলে সেই কি-কে ফরেন কি বলা হয়। এই বিশেষ কি দিয়ে টেবিল দুটি সম্পর্কযুক্ত হয়।

২. ওয়ান টু মেনি রিলেশন

ধরা যাক, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল সংরক্ষণ করার জন্য result নামের একটি টেবিল তৈরি করা হলো। টেবিলের প্রতিটি রো-তে একজন শিক্ষার্থীর একটি বিষয়ে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থাকবে।

টেবিলের নাম : result

ID (Integer, Primary Key)	Roll (Integer)	Subject (Text)	Marks (Decimal)
1	1	Bangla	70
2	1	English	76
3	2	Bangla	68
4	2	English	81

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, student_info টেবিলের একটি রো-এর সঙ্গে result টেবিলের একাধিক রো-এর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন–রোল নম্বর 1 যার, তার দুটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর result টেবিলে দুটি রো-তে রাখা আছে। student_info ও result টেবিলের মধ্যকার সম্পর্ককে ওয়ান টু মেনি রিলেশন বলা হয়, কারণ প্রথম টেবিলের একটি রো-এর সঙ্গে দ্বিতীয় টেবিলের একাধিক রো-এর সম্পর্ক রয়েছে। result টেবিলের Roll হচ্ছে ফরেন কি।

৩. ম্যানি টু ম্যানি

যখন দুটি টেবিল এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে, প্রথম টেবিলের একটি রো, দ্বিতীয় টেবিলের একাধিক রো-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আবার দ্বিতীয় টেবিলের একটি রো, প্রথম টেবিলের একাধিক রো-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে বলা হয় মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ।

ধরা যাক, স্কুলে বিভিন্ন ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। যেমন– ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, দাবা ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব ইত্যাদি। একজন শিক্ষার্থী এক বা একাধিক ক্লাবের সদস্য হতে পারে। আবার একটি ক্লাবে একাধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। নিচে club টেবিলটি দেওয়া হলো–

টেবিলের নাম : club

Name (Text)	Moderator (Text)	Established (Date)
Cricket Club	Mr. Ruhul Amin	1-1-2000
Football Club	Mr. Shahidul Islam	5-1-1998
Debating Club	Mr. Sumon Kumar	3-7-2002
Chess Club	Ms. Fatema Akhter	1-1-2001

এই টেবিলের প্রাইমারি কি হচ্ছে Name. অর্থাৎ প্রতিটি ক্লাবের অনন্য (unique) নাম থাকবে, একই নামে একাধিক ক্লাব থাকতে পারবে না।

এখন student_info ও club টেবিল দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমাদেরকে আরেকটি টেবিল তৈরি করতে হবে।

টেবিলের নাম : student_club

Roll (Integer)	club_name (text)
1	Cricket Club
2	Cricket Club
2	Football Club
2	Chess Club
2	Debating Club

মেনি টু মেনি রিলেশনের জন্য এরকম একটি টেবিল তৈরি করতে হয়, যার কাজ হচ্ছে মূল টেবিলদুটি যুক্ত করা।

৬.২.৪ এসকিউএল (SQL)

রিলেশনাল ডেটাবেজে এসকিউএল (SQL : Structured Query Language) নামক প্রোগ্রামিং ভাষার সাহায্যে ডেটাবেজে তথ্য লেখা, পড়া, পরিবর্তন করা ও অন্যান্য কাজ করা হয়। এসকিউএল ভাষার নির্ধারিত নিয়ম-কানুন থাকলেও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ডেটাবেজ তাদের নিজস্ব কুয়েরি ভাষা ব্যবহার করে, যা প্রমিত (standard) এসকিউএল-এর বেশ কাছাকাছি।

এসকিউএল-এর সঙ্গে সাধারণ প্রোগ্রামিং ভাষাগুলোর মূল পার্থক্য কোথায়? একজন প্রোগ্রামার যখন একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম লেখেন, তখন আসলে সেই সমস্যাটি সমাধানের যে অ্যালগরিদম, সেটিকেই প্রোগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এসব প্রোগ্রামে কম্পিউটারের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে যে, কীভাবে ও কোন ধাপে কী কাজ করা হবে। কম্পিউটার শুধু সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে। আর এসকিউএল কুয়েরি লেখার সময় বলে দিতে হয় যে, ডেটাবেজ সিস্টেমের কাছ থেকে কোন তথ্য চাওয়া হচ্ছে বা কোন তথ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কী করতে হবে সেটি বলে দিতে হয়। আর সেই কাজটি কীভাবে করা হবে, সেটি নির্ভর করে ডেটাবেজ সিস্টেমের উপর। এ জন্য এসকিউএল-কে বলা হয় ডিক্লারেটিভ (declarative) প্রোগ্রামিং ভাষা। সি এবং সি-এর মতো অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষাকে বলা হয় প্রসিডিউরাল (procedural) প্রোগ্রামিং ভাষা। এসকিউএল ভাষাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন, কেবল প্রোগ্রামাররাই নন, যারা প্রোগ্রামিং জগতের বাইরের মানুষ, তারাও যেন সহজে এটি শিখে ব্যবহার করতে পারেন।

এসকিউএলকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হচ্ছে : ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Definition Language বা সংক্ষেপে DDL) ও ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Manipulation Language বা সংক্ষেপে DML)।

ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ

ডেটাবেজের টেবিল তৈরি করা, টেবিল মুছে ফেলা, ইনডেক্স তৈরি করা ইত্যাদি কাজ করার জন্য ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়। যেমন— একটি টেবিল তৈরি করতে গেলে টেবিলের নাম, টেবিলের বিভিন্ন কলামের নাম ও সেখানে কী ধরনের ডেটা থাকবে, ইনডেক্স ইত্যাদি বলে দিতে হয়।

ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ

ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে একটি টেবিলের ডেটার উপর বিভিন্ন ধরনের কুয়েরি চালানো হয়, যেমন— ডেটা পড়া, ডেটা পরিবর্তন করা, ডেটা মুছে ফেলা ইত্যাদি।

৬.৩ ডেটাবেজ তৈরি (Creating Database)

ডেটাবেজ তৈরি সংক্রান্ত ৬.৩ সেকশনটি পুরোপুরি ব্যাবহারিক। প্রোগ্রামিং করার ব্যবস্থা আছে (কম্পিউটারে কিংবা স্মার্টফোনে) শুধু সেরকম পরিবেশে পরের অংশটুকু শিক্ষার্থীর জন্য অর্থপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

SQLite

এসকিউলাইট একটি ফ্রি ও ওপেন সোর্স ডেটাবেজ। ওয়েব, ডেস্কটপ ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে এই ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত অনেক ডেটাবেজের তুলনায় এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ বলে ডেটাবেজ শেখার জন্যও এটি বেশ জনপ্রিয়।

ইনস্টল করার প্রক্রিয়া

এসকিউলাইট-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://www.sqlite.org/download.html) থেকে এটি ডাউনলোড করা যাবে। ডাউনলোড করার পরে ইনস্টল করতে হবে। তাহলে কমান্ড লাইন অথবা টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন কমান্ড দিয়ে এসকিউলাইট ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া বেশ কিছু গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসসমৃদ্ধ সফটওয়্যার রয়েছে যার মাধ্যমে এসকিউলাইট সহজে ব্যবহার করা যায়। যেমন— *DB Browser for SQLite, SQLiteStudio* ইত্যাদি। ইন্টারনেট থেকে সফটওয়্যারগুলো বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমচালিত মোবাইল ফোনেও এসকিউলাইট ইনস্টল করা থাকে। বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করা যায়।

এসকিউলাইটে নতুন ডেটাবেজ তৈরি করতে হলে, টার্মিনাল চালু করে সেখানে কমান্ড লিখতে হবে sqlite 3 তারপর একটি স্পেস দিয়ে ডেটাবেজের নাম।

```
$ sqlite3 school.db
```

আবার school.db ডেটাবেজ ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়ে থাকলেও একই কমান্ড ব্যবহার করে এসকিউলাইট সফটওয়্যার চালু করতে হবে। সফটওয়্যার চালু হওয়ার পরে সেখানে বিভিন্ন কমান্ড দেওয়া যাবে। যেমন এসকিউলাইট বন্ধ করতে হলে লিখতে হবে .quit।

```
sqlite> .quit
```

৬.৩.১ কুয়েরি ব্যবহার

টেবিল তৈরি

স্কুলের ডেটাবেজে আমরা বিভিন্ন টেবিল তৈরি করব। প্রথমেই ধরা যাক শিক্ষার্থীর টেবিল। শিক্ষার্থীর টেবিলে কী কী তথ্য থাকতে পারে? (আমরা তথ্যগুলোর পাশে ব্র্যাকেটে ইংরেজি শব্দটিও লিখব যেন এসকিউলাইটে টেবিল তৈরির সময় আমরা সেটি ব্যবহার করতে পারি)।

- শিক্ষার্থীর নাম (name)
- কোন শ্রেণিতে পড়ে (class)
- শিক্ষার্থীর রোল নম্বর (roll)
- কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত (দিবা, বা প্রভাতি, কিংবা ক, খ, গ ইত্যাদি) (section)

টেবিল তৈরি করার জন্য CREATE TABLE কুয়েরি ব্যবহার করতে হবে। এই কুয়েরি লেখার নিয়ম (সিনট্যাক্স / syntax) হচ্ছে এরকম–

```
CREATE TABLE table_name (column_name column_type, ...);
```

এখানে table_name-এর জায়গায় যেই টেবিল তৈরি করা হবে, তার নাম লিখতে হবে। আর প্রথম বন্ধনীর ভেতরে প্রতিটি কলামের নাম ও একটি স্পেস দিয়ে সেই কলামের ডেটা টাইপ লিখতে হবে। আর একাধিক কলামের তথ্য কমা দিয়ে পৃথক করা থাকবে।

উপরে পরিকল্পিত student টেবিল তৈরি করতে হলে লিখতে হবে–

```
CREATE TABLE student (name TEXT, class INTEGER, roll
INTEGER, section TEXT);
```

কোনো টেবিল মুছে ফেলতে হলে DROP TABLE কুয়েরি ব্যবহার করতে হবে–

```
DROP TABLE [টেবিলের নাম];
```

যেমন– student টেবিলটি মুছে ফেলতে হলে লিখতে হবে,

২০২৪-২০২৫

```
DROP TABLE student;
```

এখন আবার CREATE TABLE কুয়েরি ব্যবহার করে টেবিলটি আবার তৈরি করা যাবে।

নোট : এসকিউএল ভাষার কমান্ডগুলো ইংরেজি বড়হাতের অক্ষরে বা ছোট হাতের অক্ষরে উভয়ভাবেই লেখা যায়। অর্থাৎ, CREATE বা create দুটিই একই কমান্ড বোঝায়। তবে, প্রচলিত রীতি হচ্ছে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করে লেখা।

টেবিলে ডেটা রাখা ও টেবিল থেকে ডেটা পড়া

কোনো টেবিলে ডেটা রাখতে চাইলে, INSERT কুয়েরি ব্যবহার করতে হবে। এই কুয়েরি লেখার নিয়ম হচ্ছে,

```
INSERT INTO টেবিলের নাম (প্রথম কলামের নাম, দ্বিতীয় কলামের নাম, তৃতীয় কলামের নাম
...) VALUES (প্রথম কলামের ডেটা, দ্বিতীয় কলামের ডেটা, তৃতীয় কলামের ডেটা ...);
```

যেমন– student টেবিলে Mizanur Rahman নামের একজন শিক্ষার্থী, যে কি না নবম শ্রেণির morning শাখায় পড়ে এবং রোল নম্বর 3, তার তথ্য রাখতে হলে নিচের মতো করে কুয়েরি লিখতে হবে–

```
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Mizanur Rahman', 9, 3, 'morning');
```

টেবিলে ডেটা ঠিকমতো রাখা হলো কি না, সেটি দেখার জন্য এখন টেবিলের ডেটা পড়া হবে। সেজন্য SELECT কুয়েরি লিখতে হবে। এই কুয়েরি লেখার নিয়ম হচ্ছে–

```
SELECT [কলামের নাম] কিংবা * FROM [টেবিলের নাম]; (একাধিক কলামের জন্য প্রতিটি
কলামের নাম কমা দিয়ে পৃথক করে দিতে হবে)
SELECT * FROM student;
```

নোট : এসকিউলাইট কমান্ড লাইনে SELECT কুয়েরি-এর আউটপুট সুন্দর করে দেখতে চাইলে নিচের কমান্ড দুটি আগে দিতে হবে,

```
sqlite> .mode column
sqlite> .headers on
sqlite> select * from student;
```

আবার যদি শুধু নাম আর শ্রেণি দেখতে চাই, তাহলে লিখতে হবে—

```
sqlite> SELECT name, class FROM student;
```

পরবর্তী কিছু কাজের সুবিধার জন্য student টেবিলে আরো কিছু ডেটা রাখতে হবে।

```
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Mosharraf Hossain', 9, 4, 'morning');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('David Pandey', 9, 2, 'morning');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Promila Gosh', 8, 2, 'day');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Bazlur Rahman', 8, 1, 'day');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Sourav Das', 9, 1, 'day');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Tamanna Nishat', 10, 1, 'morning');
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Maysha', 10, 1, 'day');
```

এরকম কিছু ডেটা টেবিলে রাখার পরে আবার SELECT কুয়েরি ব্যবহার করে দেখতে হবে যে টেবিলে ডেটা আছে কি না। টার্মিনালে অনেক সময় কোনো ফিল্ডের নাম বেশি বড় হলে পুরোটা নাও দেখাতে পারে।

টেবিল থেকে ডেটা পড়া বা দেখার জন্য SELECT কুয়েরিতে বিভিন্ন শর্তও জুড়ে দেওয়া যায়। সেজন্য WHERE লিখে তারপরে শর্ত লিখতে হবে। নিচে বিভিন্ন উদাহরণ দেখানো হলো।
কেবল নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্য দেখতে হলে লিখতে হবে—

```
SELECT * FROM student WHERE class = 9;
```

এখানে শর্ত লেখা হয়েছে class = 9, অর্থাৎ class কলামের মান হতে হবে 9। SQL-এ দুটি মান তুলনা করার জন্য নিচের অপারেটরগুলো ব্যবহার করা হয়—

অপারেটর	বর্ণনা
=	সমান
<>	সমান নয়
>	বড় (বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে বড়)
>=	বড় কিংবা সমান (বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে বড় বা সমান)
<	ছোট (বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে ছোট)
<=	ছোট কিংবা সমান (বামপক্ষ ডানপক্ষের চেয়ে ছোট বা সমান)

২০২৪-২০২৫

আবার যেসব শিক্ষার্থী morning শাখার, তাদের তথ্য দেখতে হলে লিখতে হবে।

```
SELECT * FROM student WHERE section = 'morning';
```

নোট : টেক্সট টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় শুরুতে ও শেষে কোটেশন চিহ্ন (' চিহ্ন) ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ নিচের মতো কুয়েরি লিখলে হবে না।

```
sqlite> SELECT * FROM student WHERE section = morning;
Error: no such column: morning
```

একাধিক শর্ত একসঙ্গে জুড়ে দিতে চাইলে AND অথবা OR ব্যবহার করে কাজটি করা যায়।
নবম শ্রেণি এবং morning শাখার শিক্ষার্থীদের তথ্য পেতে চাইলে লিখতে হবে—

```
SELECT * FROM student WHERE class = 9 AND section =
'morning';
```

নবম শ্রেণি অথবা morning শাখার শিক্ষার্থীদের তথ্য পেতে চাইলে লিখতে হবে—

```
SELECT * FROM student WHERE class = 9 OR section ='morning';
```

নবম শ্রেণিতে পড়ে না এবং morning শাখার শিক্ষার্থীদের তথ্য দেখার জন্য নিচের কুয়েরি লিখতে হবে—

```
SELECT * FROM student WHERE class <> 9 AND section =
'morning';
```

অষ্টম, নবম কিংবা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্য পাওয়ার জন্য কুয়েরি লিখতে হবে—

```
SELECT * FROM student WHERE class = 8 OR class = 9 OR class
= 10;
```

উপরের কুয়েরিটি অন্যভাবেও লেখা যায়—

```
SELECT * FROM student WHERE class IN (8, 9, 10);
```

ডেটা মুছে ফেলা ও পরিবর্তন করা

ধরা যাক, student টেবিলে একটি নতুন রেকর্ড যোগ করা হলো—

```
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Fardeem Munir', 10, 1, 'day');
```

এখন টেবিলে day শাখার দশম শ্রেণির রোল নম্বর এক, এরকম দুইজন শিক্ষার্থী দেখা যাচ্ছে।

```
sqlite> SELECT name FROM student WHERE class = 10 AND roll =
1 AND section = 'day';
Maysha
Fardeem Munir
```

তাহলে নতুন যোগ করা রেকর্ডটি সঠিক নয়, কিংবা আগের রেকর্ডটি সঠিক নয়। নতুন রেকর্ডটি অর্থাৎ Fardeem Munir নামের শিক্ষার্থীর রেকর্ডটি মুছে ফেলতে হলে, DELETE কুয়েরি ব্যবহার করতে হবে। এটি লেখার নিয়ম হচ্ছে—

```
DELETE FROM [টেবিলের নাম] WHERE [শর্ত]
```

নিচের কুয়েরি চালালে Fardeem Munir-এর রেকর্ড মুছে যাবে—

```
DELETE FROM student WHERE name = 'Fardeem Munir';
```

তবে উপরের কুয়েরিটি চালালে student টেবিলে name কলামের যতগুলো রেকর্ড Fardeem Munir হবে, সব রেকর্ড মুছে যাবে। তাই কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড মুছে ফেলার জন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন, এই কুয়েরিতে নামের সঙ্গে আরো শর্ত জুড়ে দেওয়া যায়—

```
DELETE FROM student WHERE name = 'Fardeem Munir' AND class =
10 AND roll = 1 AND section = 'day';
```

অনেক সময় কোনো রেকর্ড পরিবর্তন বা হালনাগাদ করার প্রয়োজন হয়। এই কাজটি করা যায় UPDATE কুয়েরি ব্যবহার করে। এই কুয়েরি লেখার নিয়ম হচ্ছে—

```
UPDATE [টেবিলের নাম] SET [কলামের নাম] = নতুন ডেটা (একাধিক কলাম হলে কমা দিয়ে
তারপরে আবার [কলামের নাম] = নতুন ডেটা) WHERE [শর্ত]
```

ধরা যাক, ডেটাবেজে নিচের তথ্য রাখা হলো—

```
INSERT INTO student (name, class, roll, section) VALUES
('Fardeem Munir', 1, 1, 'day');
```

তারপর দেখা গেল, Fardeem Munir আসলে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং তার রোল নম্বর 3। তখন রেকর্ডটি মুছে না ফেলে আপডেট করা যায়।

```
UPDATE student SET class = 10, roll = 3 WHERE name =
'Fardeem Munir';
```

একাধিক টেবিল জয়েন করা

রিলেশনাল ডেটাবেজে ডেটা বিভিন্ন টেবিলে রাখা হয় এবং প্রয়োজন হলে একটি কুয়েরিতে একাধিক টেবিল থেকে ডেটা পড়া যায়। এই বিষয়টিকে বলে জয়েন (join) করা, যা রিলেশনাল ডেটাবেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ধরা যাক, student_info ও result নামে দুটি টেবিল তৈরি করা হলো।

```
CREATE TABLE student_info (roll INTEGER, name TEXT;
CREATE TABLE result (roll INTEGER, subject TEXT, marks REAL;
```

এই টেবিল দুটির মধ্যে roll কলাম দিয়ে একটি রিলেশন দেখা যাচ্ছে। student_info টেবিলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর roll ও name রয়েছে। আবার result টেবিলে, শিক্ষার্থীর রোল নম্বর ও বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (marks) রয়েছে। student_info টেবিলের সঙ্গে result টেবিলের রিলেশন হচ্ছে ওয়ান টু মেনি রিলেশন।

এখন টেবিলে কিছু ডেটা ইনসার্ট করা হবে–

```
INSERT INTO student_info (roll, name) VALUES (1, 'Mizanur
Rahman');
INSERT INTO student_info (roll, name) VALUES (10, 'Mosharraf
Hossain');
INSERT INTO student_info (roll, name) VALUES (2, 'Maysha');
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (1,
'Bangla', 79.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (1,
'English', 76.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (1,
'Mathematics', 74.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (10,
'Bangla', 82.0);
```

২০২৪-২০২৫

```
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (10,
'English', 70.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (10,
'Mathematics', 98.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (2,
'Bangla', 75.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (2,
'English', 80.0);
INSERT INTO result (roll, subject, marks) VALUES (2,
'Mathematics', 100.0);
```

রোল নম্বর 1 যে শিক্ষার্থীর, তার পরীক্ষার ফল জানতে নিচের কুয়েরিটি চালাতে হবে—

```
SELECT roll, subject, marks FROM result WHERE roll = 1;
sqlite> SELECT roll, subject, marks FROM result WHERE roll =
1;
roll          subject            marks
----------    ----------         ----------
1              Bangla            79.0
1              English           76.0
1              Mathematics       74.0
```

এখন, রোল নম্বরের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নামও যদি দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন student_info টেবিলেও কুয়েরি করতে হবে, কারণ result টেবিলে তো শিক্ষার্থীর নাম নেই। কুয়েরিটি হবে এমন—

```
sqlite> SELECT name, result.roll, subject, marks FROM
result, student_info WHERE result.roll = 1 AND result.roll =
student_info.roll;
name             roll          subject       marks
-----------      ----------    ----------    ----------
Mizanur Rahman   1             Bangla         79.0
Mizanur Rahman   1             English        76.0
Mizanur Rahman   1             Mathematics    74.0
```

লক্ষ করতে হবে, কুয়েরিতে roll না লিখে result.roll লেখা হয়েছে, কারণ roll নামের কলাম দুটি টেবিলেই আছে। আর কুয়েরির result.roll = student_info.roll অংশ দিয়ে টেবিল দুটি যুক্ত (join) করা হয়েছে। সব শিক্ষার্থীর তথ্য চাইলে result.roll = 1 শর্তটি বাদ দিতে হবে। তখন কুয়েরিটি হবে এমন—

```
SELECT name, result.roll, subject, marks FROM result,
student_info WHERE result.roll = student_info.roll;
```

৬.৪ ডেটা সিকিউরিটি (Data Security)

ডেটাবেজের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ডেটাবেজে ব্যক্তিগত কিংবা গোপনীয় তথ্য থাকতে পারে, ব্যবসায়িক তথ্য থাকতে পারে কিংবা সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও থাকতে পারে। ডেটাবেজের নিরাপত্তার বিষয়টি একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

প্রথমত, ডেটার নিরাপত্তা দিতে হবে যেন ডেটা হারিয়ে না যায়, বা ডেটা লস (data loss) না ঘটে। এ জন্য নিয়মিত ডেটার ব্যাকআপ নিতে হয়, অর্থাৎ ডেটার কপি তৈরি করা হয়। ডেটার কপি তৈরি করে একই হার্ড ডিস্কে রাখলে কোনো কারণে আসল ডেটাতে কোনো সমস্যা হলে (যাকে ডেটা করাপশন– data corruption বলা হয়) ব্যাকআপ থেকে সেই ডেটা পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ করতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে পৃথক হার্ড ডিস্কে ডেটা ব্যাকআপ রাখা হয়। আবার ডেটার গুরুত্ব বিবেচনা করে, আলাদা ডেটা সেন্টারেও ডেটার ব্যাকআপ রাখা হয়, যেন কোনোরকম দুর্যোগ, যেমন– অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটলেও ডেটা পুনরুদ্ধার করা যায়। তাই ডেটা সেন্টারগুলো আলাদা শহরে হয়।

আবার অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা সিস্টেম যেন ডেটা দেখতে কিংবা ডেটা পরিবর্তন করতে না পারে, ডেটাবেজে সেই ব্যবস্থাও থাকে। এটিও ডেটার নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেমন–পাসওয়ার্ড ছাড়া কেউ ডেটাবেজ সিস্টেমে ঢুকতে পারবে না। আবার কোনো কোনো ব্যবহারকারী কেবল ডেটাবেজের নির্দিষ্ট কিছু টেবিল নিয়ে কাজ করতে পারবে। আবার কোনো কোনো ব্যবহারকারী কেবল ডেটা দেখতে পারবে (SELECT), কিন্তু পরিবর্তন (INSERT, UPDATE, DELETE) করতে পারবে না। এজন্য বিভিন্ন রকমের পারমিশন (permission) ঠিক করে দেওয়া যায়। এসকিউলাইট ডেটাবেজে এই বৈশিষ্ট্য না থাকলেও ওরাকল, পোস্টগ্রেস, মাইসিক্যুয়েল, এসকিউএল সার্ভার ইত্যাদি ডেটাবেজে এ ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে।

৬.৪.১ ডেটা এনক্রিপশন (Data encryption)

হার্ড ডিস্কে যখন ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, কিংবা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়, তখন সেই ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হলে ডেটা এনক্রিপ্ট (encrypt) করতে হয়। তা না হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি কিংবা সিস্টেম সেই ডেটা পড়ে ফেলতে পারে। ডেটা এনক্রিপ্ট করার ধারণা কিন্তু নতুন নয়, বা এটা যে কেবল কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমনটি নয়। হাজার বছর আগেও মানুষ ডেটা এনক্রিপ্ট করত, যেন যাকে ডেটা পাঠানো হচ্ছে সে ছাড়া অন্য কেউ সেই ডেটার মর্মোদ্ধার করতে না পারে। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার একটি পদ্ধতিতে তার চিঠিপত্র লিখতেন, যেটি এনক্রিপ্ট করা থাকত এবং যার কাছে চিঠি যাবে, সেই কেবল ডিক্রিপ্ট (decrypt) করতে পারত বা চিঠির অর্থ উদ্ধার করতে পারত। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তো অনেক গণিতবিদ এই এনক্রিপশন পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছেন, যেন তারা শত্রুপক্ষের নিজেদের মধ্যে পাঠানো বার্তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন, সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের মধ্যে নিরাপদে ডেটা এনক্রিপ্ট করে পাঠাতে পারেন। কম্পিউটার বিজ্ঞানের যেই শাখায় ডেটা এনক্রিপশন নিয়ে গবেষণা ও কাজ করা হয়, তাকে বলা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফি (cryptography)।

এনক্রিপশন পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে মূল ডেটাকে প্রথমে এনক্রিপ্ট করা। যে ডেটা পাঠাবে, এটি তার কাজ। মূল ডেটাকে বলা হয় প্লেইন টেক্সট (plane text) আর এনক্রিপ্ট করার পরে সেই ডেটাকে বলে সাইফার টেক্সট (cipher text)। তারপর আরেকটি সিস্টেমের কাজ হচ্ছে সাইফার টেক্সট থেকে মূল ডেটা উদ্ধার করা। ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি মূলত দুই ধরনের হয়–

১. সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি (symmetric key cryptography)
২. অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি (asymmetric key cryptography)

চিত্র 6.2 : সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি

সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি

এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ কি (key) ব্যবহার করে ডেটা এনক্রিপ্ট করা হয় এবং প্রেরক ও গ্রাহক উভয়পক্ষের কাছেই এই কি (key) থাকতে হয়। প্রেরক এই কি (key) ব্যবহার করে ডেটা এনক্রিপ্ট করে এবং গ্রাহক এই কি (key) ব্যবহার করে ডেটা ডিক্রিপ্ট করে।

এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর হলেও যখন দুটি আলাদা পক্ষের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়, তখন দুটি বিশেষ কারণে অসুবিধা হয়। প্রথমত, যেই কি (key) ব্যবহার করা হয়, সেই কি যেন অন্য কেউ জানতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হয়। এটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও, আসলে অত্যন্ত কঠিন কাজ। দ্বিতীয়ত, একপক্ষ যদি অনেকের সঙ্গে ডেটা আদান-প্রদান করে, সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষের জন্যই আলাদা কি (key) ব্যবহার করতে হয়। এখন, ধরা যাক, একটি ই-কমার্স সাইটে দশ লক্ষ গ্রাহক, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য পৃথক কি ব্যবহার করা বাস্তবসম্মত নয়।

অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি

প্রত্যেক সিস্টেম একটি বিশেষ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একজোড়া কি তৈরি করে, যাদের একটি হচ্ছে পাবলিক কি ও অপরটি হচ্ছে প্রাইভেট কি। এখন প্রত্যেক সিস্টেম তার পাবলিক কি সবাইকে জানিয়ে দেয়।

চিত্র 6.3 : অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি

ধরা যাক, A-এর কাছে B ও C-এর পাবলিক কি আছে। এখন A যদি B-কে কোনো ডেটা পাঠাতে চায়, তাহলে B-এর পাবলিক কি দিয়ে সেই ডেটা এনক্রিপ্ট করে পাঠায়। এই ডেটা ডিক্রিপ্ট করতে হলে B-এর প্রাইভেট কি ব্যবহার করতে হবে, তাই অন্য কেউ এই ডেটা ডিক্রিপ্ট করতে পারবে না। তেমনি C-এর কাছে ডেটা পাঠাতে হলে C-এর পাবলিক কি ব্যবহার করে ডেটা পাঠাতে হবে যা কেবল C-এর পক্ষেই ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব। C-এর পাবলিক কি ব্যবহার না করে এনক্রিপ্ট করা হলে সেই ডেটা C-এর পক্ষে ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে, A-এর কাছে ডেটা পাঠাতে হলে A-এর পাবলিক কি ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করে ডেটা পাঠাতে হবে, যা A তার প্রাইভেট কি ব্যবহার করে ডিক্রিপ্ট করতে পারবে।

৬.৪.২ RDBMS -এর বৈশিষ্ট্য

রিলেশনাল ডেটাবেজের ধারণা প্রবর্তন করেন এডগার ফ্র্যাঙ্ক কড (Edgar Frank Codd)। রিলেশনাল ডেটাবেজের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

- একটি রিলেশনাল ডেটাবেজ সিস্টেম কেবল বিভিন্ন টেবিল ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করেই সব ধরনের কাজ করতে পারবে। ডেটাবেজের সমস্ত ডেটা টেবিলে সংরক্ষিত হবে। যে কোনো ডেটাই কোনো একটি টেবিলের একটি ঘরের (নির্দিষ্ট রো ও কলামে) মান হিসেবে প্রকাশিত হবে।
- ডেটাবেজের যে কোনো ডেটা সুনির্দিষ্টভাবে টেবিলের নাম, প্রাইমারি কি (কিংবা রো-এর মান) এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য কলামের মান ব্যবহার করে পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, দশম শ্রেণির রোল নম্বর 1 যে শিক্ষার্থীর, তার নাম পেতে হলে কুয়েরি লিখতে হয়,

```
SELECT name FROM student WHERE roll = 1 AND class = 10;
```

- ডেটাবেজে এক বা একাধিক রো ইনসার্ট, আপডেট ও ডিলিট করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন– নবম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে দশম শ্রেণিতে নিতে চাইলে, এরকম কুয়েরি লেখা যায়–

```
UPDATE student SET class = 10 WHERE class = 9;
```

এতে student টেবিলের সব শিক্ষার্থী যাদের class এর মান 9, তাদের ক্ষেত্রে সেই মানটি 10 হয়ে যাবে।

- ডেটাবেজের অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন হলে সেটি ডেটাবেজ যারা ব্যবহার করে, তাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। যেমন ডেটা ডিস্কে যেই ফরম্যাটে সংরক্ষিত হয়, সেই ফরম্যাট হয়তো পরিবর্তন করা হতে পারে, কিন্তু যেসব ব্যবহারকারী ওই ডেটাবেজ ব্যবহার করবে, এটি তাদের জানতে হবে না, কিংবা এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তারা আগের মতোই ডেটা অ্যাকসেস করতে পারবে।

- ডেটাবেজ প্রদত্ত ইন্টারফেস ব্যবহার করে বিভিন্ন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ডেটাবেজ ব্যবহার করতে পারবে। ইন্টারফেস পরিবর্তন না করে ডেটাবেজে প্রয়োজন হলে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করা যাবে।

- ডেটাবেজের ডেটা যদি একাধিক ডিস্কে কিংবা একাধিক কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়, সেটি নিয়ে ব্যবহারকারীর মাথা ঘামাতে হবে না। ব্যবহারকারীর কাছে মনে হবে ডেটাবেজ একটি জায়গাতেই ডেটা সংরক্ষণ করছে।

৬.৪.৩ RDBMS -এর ব্যবহার

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়। যেমন—জাতীয় পরিচয়পত্রে নাগরিকদের যে তথ্য থাকে, সেগুলো ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। তারপরে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চিকিৎসা, কৃষি, জমিজমার হিসেব ইত্যাদি নানান তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়।

ই-কমার্স ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় করার ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে পণ্যের তথ্য রাখা, গ্রাহকদের তথ্য রাখা, গ্রাহকদের পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা—এই পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তার মূলে রয়েছে ডেটাবেজ। ব্যাংক, বিমা ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও রিলেশনাল ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য ডেটাবেজের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের তথ্য, শিক্ষকদের তথ্য, শিক্ষার্থী ভর্তি, তাদের হাজিরার তথ্য, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা করার জন্য ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়।

৬.৪.৪ কর্পোরেট ডেটাবেজ (Corporate Database)

বড় বড় প্রতিষ্ঠান তথা কর্পোরেশন (corporation)-এ অনেক ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয়। এর মধ্যে অনেক কাজই আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—একটি না ঘটলে অন্যটি ঘটানো যায় না। যেমন—কোনো পণ্য যদি স্টকে না থাকে, তাহলে সেটি বিক্রি করা যায় না। এখন এই কর্পোরেশন পরিচালনা করার জন্য এক ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় ইআরপি (ERP : Enterprise Resource Planner)। ইআরপি সফটওয়্যারের বিভিন্ন মডিউল থাকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনমতো বিভিন্ন মডিউল ব্যবহার করে। কিছু সাধারণ মডিউল হচ্ছে, অ্যাকাউন্টস (accounts —সব ধরনের হিসাব-নিকাশের জন্য), ইনভেন্টরি (inventory—পণ্যের মজুদ ব্যবস্থাপনা), পে-রোল (payroll—কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ), কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট (customer relationship management) ইত্যাদি। এই সবকিছুর মূলেই রয়েছে ডেটা আর তাই ডেটার সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অফিস একাধিক শহরে, এমনকি একাধিক দেশেও থাকতে পারে। সব অফিসের সব তথ্য একই সিস্টেমের আওতায় আনা কর্পোরেট ডেটাবেজের প্রধান চ্যালেঞ্জ। সেই সঙ্গে সেসব ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২০২৪-২০২৫

৬.৪.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ (Database in Government Organization)

সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ডেটাবেজ ব্যবহার না করলে কিংবা সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সমন্বয় থাকে না। এ কারণে নাগরিকদের যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও লাখ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সব নাগরিকের তথ্য ও আঙুলের ছাপ জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সময় সংগ্রহ করা হয়। সরকারি কোনো একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান সেই তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে। এখন পাসপোর্ট তৈরির সময়, সবাইকে আবার সব তথ্য পূরণ করতে হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় করে ডেটাবেজের সঠিক ব্যবহার করলে এই কাজটি সহজেই এড়ানো যায়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এইচএসসি পরীক্ষা পাস করার পরে অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যায়। সেখানে তাকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করা-সহ নানা ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শিক্ষাবোর্ডের কাছে কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর তথ্য ও তার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা আছে। এই ডেটাবেজের সঠিক ব্যবহার করলে আর আলাদা রেজিস্ট্রেশন ফর্মে একই তথ্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজটি করে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ করেছে। এরকম শত শত সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেক কাজ হয়, যেখানে ডেটাবেজ ব্যবহার ও সঠিকভাবে সমন্বয় করলে অনেক কাজ অনেক কম সময়ে ও কম ঝামেলা করে সম্পন্ন করা যায়।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজের আরেকটি ভালো ব্যবহার হতে পারে ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া চালুর মাধ্যমে। ঠিকভাবে বিভিন্ন রকম ডেটা সংরক্ষণ করলে, সেই ডেটা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কোন কাজটি কখন করতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি—এসব ক্ষেত্রে বিগত বছরের ডেটা ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করে অনেক তথ্য বের করা সম্ভব, যা পরবর্তী বছরের করণীয় নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। যেমন— বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের রোগীদের তথ্য যদি একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে থাকে, তাহলে কোন সময়ে, কোন অঞ্চলে কোন রোগের প্রকোপ বেশি হয়, তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আগে থেকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে ফেলা সম্ভব।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ ব্যবহারের মূল চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিপুল পরিমাণ ডেটার ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ লোকের সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেন একই ডেটা আলাদাভাবে ব্যবহার না করে (বরং নিজেদের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে), সেটির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মূল ডেটাকে অন্য ফরমেটে পরিবর্তনের পদ্ধতি কোনটি?

ক. ম্যানিপুলেশন খ. ভ্যালিডেশন
গ. এনক্রিপশন ঘ. ডিক্রিপশন

২. সর্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ফিল্ডের ডেটা টাইপ–

i. Text
ii. Currency
iii. OLE Objects

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

একটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের তথ্য ডেটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের পর ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিলেন।

৩. তালিকা প্রদর্শনের পদ্ধতি কোনটি?

ক. সর্টিং খ. ইনডেক্সিং
গ. কুয়েরি ঘ. এনক্রিপশন

৪. অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে–

i. তথ্যের সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়া যাবে
ii. তথ্যের যেকোনো ধরনের বিন্যাস সম্ভব হবে
iii. অতিদ্রুত শিক্ষার্থীদের ডেটা উপস্থাপন করা যাবে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫.

Roll	Name	GPA
01	X	5.00
02	Y	4.50
03	Z	5.00

উদ্দীপকের টেবিল হতে যাদের GPA = 5.00 তাদের নাম দেখতে SQL কমান্ড "SELECT NAME FROM Student" এর পরের অংশ কোনটি?

ক. WHERE "GPA", = "5.00"; খ. WHERE "GPA", "5.00";
গ. WHERE GPA = "5.00"; ঘ. WHERE "GPA", = "5.00"

৬. Primary Key এর সাথে Foreign Key এর রিলেশন কীরূপ?

i. one to one ii. one to many
iii. many to many

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর প্রধান কাজ হচ্ছে-

i. ডেটাবেজ তৈরি করা

ii. ডেটা এন্ট্রি ও সংরক্ষণ করা

iii. রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

TID	T NAME	Subject
101	Mr. Rayhan	English
102	Mr. Kaiser	ICT
10.	Mr. Yaqub	Biology

Teacher's table

TID	Group	Time
101	Science	10:00
101	Humanities	10:45
102	Science	10:45
102	B. Studies	10:00
103	Science	11:30

Routine table

ক. ডেটাবেজ কী?

খ. কুয়েরি কমান্ডের অন্যতম কাজটি ব্যাখ্যা কর।

গ. Teacher's table এর ফিল্ডগুলোর ডেটা টাইপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের টেবিল দুটির মধ্যে রিলেশন তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই কর।

২. একটি কলেজের ফলাফলের ডেটাবেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীর তথ্য খোঁজার জন্য তিনজন শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেয়া হলো। 1 শিক্ষার্থী শর্ত সাপেক্ষে কমান্ড দিয়ে, 2 শিক্ষার্থী ডেটাবেজের টেবিলে তথ্য সাজিয়ে এবং 3 শিক্ষার্থী 2 শিক্ষার্থীর চেয়ে দ্রুততর কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য খুঁজে বের করে।

ক. ডেটা এনক্রিপশন কী?

খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সম্বলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে 2 শিক্ষার্থীর কৌশল বর্ণনা কর।

ঘ. 1 ও 3 শিক্ষার্থীর কৌশল দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

৩. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য 'ক' এলাকার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পরিকল্পনা করেছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীকে একজন ভোটারের নাম, পিতার নাম, বয়স, ধর্ম, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান সংগ্রহ করার জন্য বললেন। উক্ত তথ্য দিয়ে একটি ডেটাবেজ ফাইল তৈরি করা হলো। অন্যদিকে, নাম, বয়স ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করে পরিসংখ্যান করার জন্য অপর একটি ফাইল তৈরি করা হলো।

ক. SQL কী?

খ. 'প্রাইমারি কি ও ফরেন কি এক নয়'-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ডেটাবেজ ফাইলের ফিল্ডের ডেটা টাইপের বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি ফাইলের মধ্যে কীভাবে রিলেশন তৈরি করা যায়?– তোমার মতামত দাও।

২০২৪-২০২৫

৪.

টেবিল ১

ID	Name	Address
1001	Ariful Haque	Khulna
1002	Shajeda Jannat	Dhaka
1003	Tahmid Salehin	Jamalpur

টেবিল ২

Sl.No.	Designations	Salary
1	Manager	45,000
2	Officer	30,000
3	Accountant	25,000

টেবিল দুটি থেকে যাদের বেতন 30,000 বা তার চেয়ে বেশি তাদের নাম ও পদবি দেখাতে বলা হলো। 'খ' নামক ব্যক্তি শর্তসাপেক্ষে কমান্ড দিয়েই উক্ত কাজটি করে দিলেন কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় একটু বেশি সময় নিচ্ছিল। 'গ' নামক ব্যক্তি বললেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল তৈরি করলে উক্ত কাজটি অনেকটা দ্রুত হবে তবে ডেটা এন্ট্রিতে একটু বেশি সময় নিবে।

ক. RDBMS কী?

খ. SQL-কে ডেটাবেজের হাতিয়ার বলার অন্যতম কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের টেবিল দুটিতে প্রয়োজনীয় কলাম যুক্ত করে ডেটা রিলেশন তৈরি কর।

ঘ. 'গ' ব্যক্তি যা বললেন, তার সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৫.

Name	Roll	DOB	Tution Fee
A	1011	02-2-2002	3500/-
B	1012	15-5-2003	4000/-
X	1013	22-8-2002	4200/-
Y	1014	27-3-2001	4100/-

চিত্র-1

Roll	Subject	Number	GPA
1011	ICT	70	A
1012	ICT	85	A+
1013	ICT	90	A+
1014	ICT	75	A

চিত্র-2

ক. কুয়েরি কী?

খ. গোপনীয়তাই ডেটার নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার– ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত চিত্র-1 টেবিলে Roll ও DOB ফিল্ডের মাঝে Address ফিল্ড সংযোজন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে দুটি টেবিলের মধ্যে কী ধরনের Relation সম্ভব তা তোমার মতামতসহ ব্যাখ্যা কর।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে দেশের যাবতীয় কৃষকের একটি তালিকা তৈরি করেছে। এখানে তারা কৃষকদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, জন্ম তারিখ, কৃষি খাতের নাম (যেমন, পোল্ট্রি, গবাদি পশুর খামার, চাষাবাদ ইত্যাদি), পরিবারের সদস্য সংখ্যাসহ আরো বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ক. সাইফার টেক্সট কী?

খ. ডেটা সিকিউরিটির অন্যতম একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ তৈরির সময় বিবেচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ইনডেক্স তৈরি করার পর INSERT, UPDATE, DELETE কুয়েরি করতে বেশি সময় লাগার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

সমাপ্ত

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।